মহাত্মা গান্ধী

(জীবনী ও উপদেশ)

"প্রেমে বিদ্বেষকে জয় কর।"—গান্ধী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৪র্থ সংস্করণ

ফাল্গুন, ১৩২৮

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

হাওড়া—পানিত্রাস হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,-

(১) শ্রীবঙ্কিমবিহারী মুখোপাধ্যায়,
১২৫, ডাক্তার লেন ; কলিকাতা

(২) ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী,
২৪-এ, কলেজ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

(৩) মোস্লেম পাব্লিশিং হাউস,
৩, কলেজ স্কয়ার ; কলিকাতা

(৪) সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট; কলিকাতা

(৫) বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪, কলেজ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

(৬) ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ; কলিকাতা

(৭) সারস্বত লাইব্রেরী,
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা

(৮) অন্নদা বুক্ ষ্টল,
২২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

(৯) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স,
৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

(১০) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

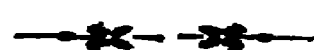
প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা



মহাত্মা গান্ধী

জন্ম ১৮৬৯, ২রা অক্টোবর

উৎসর্গ



যাঁহার

আদর্শ চরিত্র

এই পুস্তকের মেরুদণ্ড

সেই

কর্ম্মবীর সত্যসন্ধ

মহাত্মা গান্ধীর

পবিত্র নামে

শ্রদ্ধার অঞ্জলিরূপে

ইহা

অর্পণ করিলাম।

গুণমুগ্ধ

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা,—

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

(লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক লিখিত)

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের কর্ম্ম-প্রবাহ এখনও চলিতেছে; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি বৎসর নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করা, কোন লেখকের পক্ষেই অসম্ভব নহে। তাঁহার জীবন-কথা কেন এত শিক্ষাপ্রদ এবং কেন অনুকরণীয়, ইহার কারণ আবিষ্কার করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি যে ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা তাঁহার পিতা যে কোন সামন্ত-রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষত্ব নহে; কারণ তাঁহার ন্যায় অনেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছেন—আরও অনেকের পিতা তাঁহার পিতার ন্যায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিভাবান মনীষী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-পত্র পাইয়াছেন। ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ, বিচার-বুদ্ধির স্ফুরণ সাপেক্ষ। গত দেড়শত বৎসর যাবৎ অসংখ্য ভারতবাসী বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য চিন্তা, আদর্শ, সমাজগঠন ও সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুদ্ধিমানের মত যুক্তিযুক্ত পন্থাবলম্বন করিয়া প্রভূত বিচার-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এইরূপ লোকের যথার্থ অভাব, যিনি নিজের চরিত্র ও সাধনাবলে এদেশে

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম। একমাত্র ঐরূপ ক্ষমতা দ্বারাই আমাদের বহুমুখী চেষ্টার সিদ্ধি সম্ভব। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের বিশেষত্ব এইখানে। তাঁহার সহিত সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে—অনেকে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধীর এই চরিত্র বা সাধনা সকলেরই অনুকরণীয়।

ভারতবাসী অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ; কি ভারতে, কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র, সকল স্থানেই তাহাদের দুরবস্থার সীমা নাই। কিরূপে কোথা হইতে এই দুর্গতি আসিল ? অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার পার্থক্য কি ? কেন এই পার্থক্য ঘটিল ? এই সকল প্রশ্ন বহুবার আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতিগত জীবনে, সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের নিজকৃত অথবা পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতকর্ম্মের ফল। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করা যায় না। তবে যদি কোন ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন নেতা এই দুর্দ্দশার হেতু ও তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণে ব্রতী না হন এবং সেই প্রতীকার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলা চলে না। আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার হেতু আমরা নহি বটে, কিন্তু আমাদের নিজের ও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ এই অবস্থার উন্নতি চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের বিধানও তাই। যাহা দ্বারা জগৎ রক্ষিত ও চালিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনে জগত যাহাতে উন্নত হইতে উন্নততর পথে পরিচালিত হইয়া শেষে পূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ কার্য্য নিজে করা এবং অপরকে করান—ইহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,জন্মভূমি আমাদিগকে

ও আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে আহার যোগাইবেন বা শুধু ভোগবিলাসে রাখিবেন,ইহাই চরম সার্থকতা নহে—ইহাপেক্ষা উচ্চতর আদর্শও আছে। সেই আদর্শ এত মহৎ ও এত বৃহৎ যে, তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মানুষ এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ঈশ্বরকেও লাভ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের আদেশ উল্লিখিতরূপ হইলেও, এদেশে জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও ঐ বিষয়ে যথোপযুক্তরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। দেশের লোকের দৃষ্টি যদি ঐ দিকে থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আজ এরূপ হইত না। জাতীয় উন্নতি প্রয়াসের কালাকাল নাই। যখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগে তখনই আত্মত্যাগ করিয়া, নিজের বা পরিজনবর্গের সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত আলস্য ও সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মানুষ তাহার বিবেকবাণী অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তখন ভগবানে সে অটল বিশ্বাসী, তাহার মনে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে না—যে কোন স্বার্থত্যাগে সে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনী হইতে এই মহাশিক্ষা আমরা লাভ করিতে পারি।

সম্প্রতি লোকের মনে আর একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারতে সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন অগ্রে করিয়া পরে রাজনৈতিক সংস্কারে মন দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনই উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতেছে। কোন বিষয়ে সংস্কার চেষ্টা করিতে গেলেই প্রথমতঃ ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সে ক্ষমতা—সম্পূর্ণরূপেই যদি না হয়, ত বেশীর ভাগ—দেশের চিন্তাশীল নেতৃগণের হাতে থাকা প্রয়োজন। অতএব এমন সংস্কারের জন্য সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহার ফলে অন্যান্য সংস্কার সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধীর মত ; নতুবা তিনি কখনই রাজনৈতিক সংস্কার চেষ্টা করিতেন না। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের

মঙ্গলোদ্দেশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা শুধু সামাজিক নহে। তত্রত্য গভরমেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সহিত সে কাজগুলি প্রত্যক্ষভাবে সংস্পৃষ্ট। আমরা বলিতে পারি যে, সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়াই,সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকগণ বিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধন না করিলে প্রবাসী ভারতীয়গণের সামাজিক জীবনেও কোন উন্নতির আশা নাই, ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। আমরা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরিক হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রজাদের ন্যায়তঃ কোন পার্থক্য রাখা অসঙ্গত। কিন্তু স্বার্থান্ধ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণ মনে করে যে, উপনিবেশগুলি কেবল তাহাদেরই লাভের জন্য সৃষ্ট। ফলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপরাংশ হইতে যে সকল লোক তথায় গমন করে, তাহাদিগকে নিজেদের সমান বলিয়া গ্রাহ্য করিতে তাহারা চাহে না। তাহাদের দেশে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও খনিসমূহে কাজ করিবার উপযুক্ত শ্রমিকদলের একান্ত অভাব। সেই জন্য স্বার্থের তাড়নায় তাহারা ভারতবর্ষ হইতে শ্রমিকদল সংগ্রহ করে এবং তাহাদিগকে ভারবাহী পশুর মত খাটাইয়া প্রভূত লাভবান হয়। ভারতের শাসক-সম্প্রদায়, উক্ত শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণের সহিত জাতিধর্ম্মে সম্পর্কযুক্ত; তন্নিমিত্ত উপনিবেশ-প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি ভারত গভরমেণ্টের দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ আকৃষ্ট হয় নাই। এমন কি ভারতীয় জননায়কগণের দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ ঐদিকে পড়ে নাই। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত গান্ধীই সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় শ্রমিকদলের দুর্দ্দশা মোচনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সংস্কারের নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন।

শাসন-পদ্ধতির কোন অংশে যদি দোষ থাকে, তবে তাহার সংস্কার

চেষ্টাকে ন্যায়ের চক্ষে বিদ্রোহ বলা চলে না। যদি ইহাকে বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গভরমেণ্ট ন্যায় চান না, নীতি চান না, সকল প্রজাকে সমান অধিকার দিতে চান না—গভরমেণ্ট চান অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে। আমাদের বিশ্বাস, প্রজার কল্যাণ বিধান করা গভরমেণ্টের আদর্শ এবং তাহাতেই শাসনশক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সিদ্ধান্ত যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে গভরমেণ্টকেই তাহার আদর্শ রক্ষায় সহায়তা করা হয়। কিন্তু প্রজাসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ বা কোন কোন সম্প্রদায় স্বার্থবশে অথবা অতীত জীবনের অভ্যাসলব্ধ একগুঁয়েমী বশে এতই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহারা এই ন্যায়সঙ্গত নীতি উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলে তাহাদের হাতে অপরে নির্যাতিত হয়। গভরমেণ্ট স্বেচ্ছায় যদি কখনও অন্যায়কে দমন করেন তাহা হইলে এই শ্রেণীর স্বার্থপর, একগুঁয়ে, আত্মাভিমানী লোকেরা গভরমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফলে শান্তিভঙ্গ ঘটে। সেই জন্য যে পর্য্যন্ত না অত্যাচারপীড়িত লোকেরা স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ করে, সে পর্য্যন্ত গভরমেণ্ট ঐরূপ বিষয়ে কখনই মনোনিবেশ করেন না। নির্ব্বিবাদে যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তবিকই কোন অপকার বা অন্যায় না ঘটে, ততক্ষণ প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা, কোন রাজনীতিকের কাজ নহে। অন্যায়-অত্যাচার ও দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা এরূপ ভাবে জানাইতে হইবে, যাহাতে গভরমেণ্ট বিধি-ব্যবস্থা সংশোধন করিতে বাধ্য হন—ইহাই প্রত্যেক দেশ-ভক্তের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিয়াছেন; সেইজন্যই তিনি দেশবাসীর যথার্থ সম্মান ও প্রশংসার পাত্র।

দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য আইনের সৃষ্টি। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্যে—

সম্পূর্ণ সদভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়াও—কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বা তাঁহাদের আদেশ অমান্য করা ঐ আইনের চক্ষেই হয়ত বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সেই সময়ে সংস্কারপ্রার্থী দেশভক্তের অন্তরে একটা বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদিকে সংস্কার সাধনের জন্য প্রবল বাসনা, অন্যদিকে আইন লঙ্ঘনের অনৌচিত্য বোধ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। শ্রীযুক্ত গান্ধীও এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। তৎকালে এই কঠিন সমস্যার ভিতর হইতে মুক্ত হইবার যে পন্থা তিনি নির্দ্ধারণ করেন, তাহার নাম—'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' বা 'সত্যগ্রহ'। তিনি অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই 'সত্যগ্রহ' ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। উহা এখন যেন শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যদিও সকল সময়ে এই প্রতিকার পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তথাপি ঠিক কোন ক্ষেত্রে উহা অবলম্বনীয় এবং কোন ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধীর ন্যায় কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিকার পন্থা অতীব উচ্চ।

রাজার আইন যাহাতে সকলে মানিয়া চলে, সেইজন্য আইন ভঙ্গকারিগণের প্রতি দণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে। স্বভাবতঃ আইন মানুষকে ন্যায়পথে চলিতে উৎসাহিত করে এবং ন্যায়ের পথেই সুখ, শান্তি ও সন্তোষ বিরাজিত। যদি কখনও স্বার্থের মোহে কাহারও মনে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা হইলে আইনে উল্লিখিত দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যেখানে অবস্থাটা ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যেখানে এমন কোন আইন প্রচলিত থাকে, যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু লোকে কেবল দণ্ডিত হইবার ভয়ে তাহা মানিয়া চলে, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে এই সমস্যা উদিত হয়, আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ড গ্রহণ করিয়া ন্যায়

ও ধর্ম্মের নীতি পরীক্ষা করিব, না মানুষের কৃতআইনের ভয়ে ভগবানের ন্যায়-বিধান বর্জ্জন করিব? যাহারা সত্য ও ন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়ায়, তাহারা মানুষের কৃত আইনের অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে ভীত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ ধর্ম্মে ব্রতী হইবে, তাহাকে কেবল সত্য ও ন্যায়ের উপরই অটল অচল বিশ্বাস রাখিয়া দাঁড়াইতে হইবে—নিজের শক্তি-সামর্থ্য বা দুর্ব্বলতার কথা ভাবিলে চলিবে না। তখন তাহার নিজের ও স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখের ভাবনাও তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মানসিক দৃঢ়তা, সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, নিষ্পাপ চরিত্র এবং অন্তরের মহত্ব না থাকিলে এই সকল কার্য্য সম্ভব হয় না। কেবল বিদ্যা দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না—কেবল উচ্চবংশে জন্মিলেও ইহা সুলভ হয় না—কেবল বুদ্ধি দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার শক্তি (Soul Force)। উপনিষদের সেই মন্ত্র আমাদের সযত্নে স্মরণ রাখা উচিত যে, বিদ্যা দ্বারা—মেধা দ্বারা—বা শিক্ষা দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। একথা সত্য বটে যে, আত্মার শক্তি মানবের স্বাভাবিক সম্পদ—বিদ্যা বা বুদ্ধি দ্বারা ইহা আয়ত্ত করা যায় না—তথাপি ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অনাসক্তি ও অধ্যবসায় দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ উহা লাভ করিতে পারে। এই জন্যই মহৎ ব্যক্তির জীবনেতিহাস পাঠে আমরা আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে পারি।*

* শ্রীমতী অবন্তিকাবাঈ গোখলে মারাঠী ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই মর্ম্মানুবাদ।

মহাত্মা গান্ধী



"প্রতিজ্ঞা কর, মদ্য মাংস ও রমণী স্পর্শ করিবে না।"

"মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম।"

সম্মুখে জৈন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে যুবক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জননীর নিকট তিনবার সত্যবদ্ধ হইলেন যে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে গিয়া মদ্য, মাংস ও রমণী স্পর্শ করিবেন না। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রায় উৎসুক। এ প্রস্তাবে অপর সকলের সম্মতি ছিল; কিন্তু স্নেহময়ী জননী পুত্রকে 'কালাপানি' পারে পাঠাইবার কথা উঠিলে উৎকণ্ঠায় আকুল হইতেন। তাঁহার আশঙ্কা, পাছে পুত্র বিদেশে গিয়া বিলাসী হয়, পাছে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, পাছে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়; কারণ, সেখানে তাহাকে দেখিবার—উপদেশ দিবার ত কেহই নাই। তা'ছাড়া, ভগবান না করুন, সে যদি পীড়িত

ত্রি-সত্য।

হয়, তাহা হইলে কে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে ? কে তাহাকে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিবে ? এই সকল দুশ্চিন্তা জননীকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিত। শেষে পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতার মত পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে সম্মতা হইলেন ; তবে, তৎপূর্ব্বে পুত্রকে তিনটী প্রলোভন বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইতে হইল। সে তিনটী প্রলোভন কি, পাঠক পূর্ব্বেই জানিয়াছেন।

বংশ-পরিচয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর শনিবার শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ের মধ্যবর্ত্তী পোরবন্দর সহরে এক সম্ভ্রান্ত বণিক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পোরবন্দর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের শেষ লীলাক্ষেত্র দ্বারকার ষাট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরব্যোপসাগর তীরে একটী সমৃদ্ধ বন্দর। উহা বৃটিশ রাজ্যের অধীনস্থ পোরবন্দর করদ রাজ্যের রাজধানী। পোরবন্দরের রাণা ঐ রাজ্যের অধীশ্বর। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতামহ, উত্তমচাঁদ গান্ধী রাণার দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাণার পক্ষে তাঁহার জননী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। একবার রাণা-জননীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মনস্বী উত্তমচাঁদ পোরবন্দর পরিত্যাগ করিয়া জুনাগড় রাজ্যের নবাব সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তাঁহাকে সমাদরে সভায় স্থান দেন। নবাবের পারিষদ্‌গণ আগন্তুককে বাম হস্তে অভিবাদন করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন,—

'পোরবন্দরে অনেক দুঃখ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমার দক্ষিণ হস্ত ঐ রাজ্যের জন্যই রাখিয়াছি।' আশ্রয়-প্রার্থীর পক্ষে এ তেজস্বিতা—এ অনন্যসাধারণ স্বদেশ-প্রেম নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। কিছুদিন পরে রাণার আহ্বানে উত্তমচাঁদ পুনরায় পোরবন্দরের দেওয়ানী গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতা, করমচাঁদ গান্ধীও কম তেজস্বী ছিলেন না। উত্তমচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি পোরবন্দরের দেওয়ানী পদে পঁচিশ বৎসর কাল কার্য্য করেন; শেষে কিন্তু রাণার সহিত তাঁহার মনের মিল হয় নাই। কাজেই তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী রাজকোট রাজ্যের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। রাজকোটের 'ঠাকুর সাহেব' তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপন রাজ্যের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। নির্লোভ করমচাঁদ প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করেন; পরে অনেক উপরোধ অনুরোধে পড়িয়া উহার সামান্য অংশ মাত্র গ্রহণ করেন।

আর একটী ঘটনায় তাঁহার তেজস্বিতা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। একদিন রাজকোটের এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেবকে 'ঠাকুর সাহেবে'র সম্বন্ধে কটূক্তি করিতে শুনিয়া তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এজেণ্ট সাহেব রোষকষায়িত-লোচনে বলেন,—'তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।' নির্ভীক করমচাঁদ কিন্তু সে উপাদানে গঠিত নহেন। তিনি

সাহেবের রক্ত-আঁখি দেখিয়া আদৌ ভয় পাইলেন না—কিছুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না। এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাল কোন বৃক্ষতলে আটক রাখিলেন। ইহাতেও সে পুরুষসিংহ বিচলিত হইলেন না; কিন্তু নাগরিকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন ব্যাপারটী আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া, এজেণ্ট সাহেব নিরস্ত হইলেন—ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ চাপা পড়িল।

এই ঘটনায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুসৃত 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' (Passive Resistance) নীতির বীজ আমরা তাঁহার পিতার অন্তরে নিহিত দেখিতে পাই। তাঁহার পিতা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, নির্ভীক, সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 'ত্যক্ত্বা কর্ম্ম-ফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া কিরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জননীও ভগবদ্‌পরায়ণতায় আদর্শস্থানীয়া। পূজা, দান, অর্চ্চনা ও অতিথি-সৎকার, তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটাইতেন। যম-নিয়ম-উপবাসে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইলেও মনের তেজ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রোগীর পরিচর্য্যায় তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা, অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। রাজপথে কোন অন্ধ

আতুর অনশন-পীড়িতকে দেখিলে তাঁহার প্রাণ করুণায় গলিয়া যাইত। মাতার সুকোমল মনোবৃত্তি ও পিতার প্রদীপ্ত জ্ঞান শ্রীযুক্ত গান্ধীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

শৈশবে শ্রীযুক্ত গান্ধী পোরবন্দর বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা পরিজনবর্গসহ রাজকোটে গমন করিলে, তিনি প্রথমে তত্রত্য গুজরাটী স্কুলে ও পরে কাথিয়াবাড় হাই-স্কুলে প্রবেশ করেন। শেষোক্ত বিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধী সতর বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তাঁহার বিলাত যাত্রার কথা উঠে। ইতিপূর্ব্বে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীযুক্ত গান্ধী এক সুলক্ষণা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। সেই বালিকাই উত্তরকালে তাঁহার উৎসাহদাত্রী জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন।

শিক্ষা।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আলোকে অনেক বালক পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা প্রায়ই পুরুষ-পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারে, প্রাচীন বেশভূষায় ও সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ভশ্রদ্ধ হইয়া উন্মার্গগামী হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নহে। শ্রীযুক্ত গান্ধীর বাল্য-জীবনেও এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন একবার ঘটিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী—'অহিংসা' তাঁহাদের জীবনের ব্রত। বালক গান্ধী ও তাঁহার সহপাঠিগণ একদিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নিরামিষ ভোজন একটা 'কুসংস্কার' মাত্র; 'সভ্য' হইতে হইলে

সত্যনিষ্ঠা।

মাংস ভোজন করিতেই হইবে ; বিশেষতঃ মাংস না খাইলে সাহেবদের মত বলশালী হওয়ার আশা বৃথা। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালকেরা চুপে চুপে মাংস কিনিয়া আনিয়া নদী-তীরে তাহা রন্ধন ও ভোজন করিত। বালক গান্ধীও ঐ দলে জুটিলেন। প্রায় প্রত্যহই মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় মাংস ভোজন করিলে, রাত্রে আর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না ; কাজেই বাড়ীতে আহারের সময় একটা না একটা মিথ্যা ওজর তুলিতে হইত। এইরূপ মিথ্যা বলিতে বালক গান্ধী একান্ত অনভ্যস্ত। দুই চারি দিন মিথ্যা কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণে অসহ্য অনুশোচনা হইতে লাগিল ; তিনি বিবেকের তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ফলে, মাংস ভোজনের প্রলোভন তিনি তদবধি চিরজীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন। সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনে পদে পদে পরিস্ফুট।

বিলাত-বাস।

সৌন্দর্য্য-সম্পদে অমরাবতী তুল্য মনোরম, আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি বিলাতের চাকচিক্যময় ব্যসন-বিলাসের মধ্যে অকস্মাৎ উপনীত হইয়া কোন্ ভারতীয় যুবকের নয়ন না ধাঁধিয়া যায় ? বদ্ধজলের ক্ষুদ্র মৎস্য সহসা অপার সাগরে গিয়া পড়িলে যেরূপ দিশাহারা হইয়া পড়ে, তরলমতি ভারতীয় যুবকেরাও সেইরূপ বিলাতের স্বাধীন আবহাওয়ার সংস্পর্শে হঠাৎ আসিয়া প্রায় মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। মানুষ বাহির হইতে যাহা সুন্দর দেখে,

তাহারই অনুকরণ করিবার জন্য বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়া যায়—ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তখন তাহার থাকে না।

তরুণ যুবক গান্ধী বিলাতে পৌঁছিয়া ষোল আনা সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। সাহেবী বেশভূষা, সাহেবী নাচগান, সাহেবী হাবভাব, সাহেবী আদব-কায়দা তাঁহার চক্ষে অতি মনোরম হইয়া উঠিল। তিনি পূরাদস্তুর 'ইংলিস জেণ্ট্‌লম্যান' সাজিবার আশায় সাহেবিয়ানায় সুপক্ক জনৈক বন্ধুর নিকট শিক্ষানবিশী জুড়িয়া দিলেন। বন্ধুটী ভারতবাসী; তিনি বহু পূর্ব্বে বিলাতে গিয়া এমনই নিখুঁত সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যে তাঁহার চাল-চলনে অনুমাত্রও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাইত না। উৎসাহী গান্ধী সেই বন্ধুর নিকট ইংরাজী নাচ-গান ও ফরাসী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। এত বিলাসিতার মধ্যেও কিন্তু তাঁহার প্রাণ মাঝে মাঝে হা-হা করিয়া উঠিত; বিবেক যেন, কাণে কাণে বলিয়া দিত—'মাতার নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, স্মরণ কর।' এক এক দিন নাচ-গানে মন কিছুতেই বসিত না—নাচের সময় পা বেতালে পড়িত, গানের সুর সহসা কাটিয়া যাইত; মনে হইত, হায় হায়, আমি কোন্ পথে ছুটিয়াছি! তখনও কিন্তু মনের নিকট এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলিত,—মা মদ, মাংস ও রমণী স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, নাচ-গান্ ত বারণ করেন নাই—

প্রলোভনের পথে।

নাচ-গান হিন্দু শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ নহে, ইহা ত নির্ম্মল আমোদ উপভোগ মাত্র; সুতরাং নাচ-গানে দোষ কি? বেশী দিন কিন্তু এভাবে চলিল না। একদিন এক প্রমোদোৎসবে শ্রীযুক্ত গান্ধী নিমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে নাচ-গান ও ভূরিভোজনের সমারোহ ত আছেই, তা ছাড়া কত কুন্দেন্দুসুন্দর যুবক-যুবতীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের সম্ভাবনা। হয়ত কোন অনুরাগ-বিহ্বলা বিলাস-লাস্যকুশলা সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গবালার সহিত নানাঢঙে নাচিবার সুবিধাও ঘটিতে পারে। অজানা নূতন দেশে এমন মনোমদ প্রলোভন কয়জন নবীন আগন্তুক ত্যাগ করিতে সক্ষম? যুবক গান্ধী নিমন্ত্রণস্থলে যথা সময়ে উপনীত হইলেন। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, শেষে ভোজের আয়োজন হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী আহারে বসিলেন; কিন্তু একি: সম্মুখেই যে মাংসের ঝোল! পদতলে দংশনোন্মুখ কালফণী সন্দর্শন করিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, শ্রীযুক্ত গান্ধীও সেইরূপ ত্রস্ত হইলেন—তাঁহার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যেন তড়িৎ-শিখা খেলিয়া গেল। স্নেহময়ী জননীর আদেশ তাঁহার স্মরণপথে জাগিল, গভীর অনুশোচনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই যুবক গান্ধী টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন! চারিদিক হইতে বন্ধুবান্ধবেরা ও নিমন্ত্রিতগণ তাঁহার এই অসামাজিক আচরণে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহাদের

মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। তদবধি তাঁহার 'ইংলিশ জেণ্ট্‌লম্যান' সাজিবার বাসনা চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইল।

আঘাতের পর প্রতিঘাত আসাই স্বাভাবিক। উল্লিখিত ঘটনায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া এবার আরম্ভ হইল।

প্রতিক্রিয়া।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ কি শুধু দশেন্দ্রিয়ের পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, না মানব-জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? মানুষ কি?—তাহার আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়? পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সহিত তাহার সম্পর্ক কত দিনের? মানুষ মরিলে কোথায় যায়? দেহীর সহিত দেহের অবসান হয় কি না? এই সকল গভীর সমস্যা তাঁহাকে দিন দিন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রাণের ভিতর কি একটা অনির্ব্বচনীয় অপূর্ণতা তিনি অবিরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। কোন কোন বিলাতী বন্ধু তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তিনি নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল তথ্য না জানিয়া সহসা পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সময়ে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সংসর্গেও তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রাণের পিপাসা মিটিল না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি নিবিষ্টচিত্তে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং

ব্রজ' এই আশ্বাস-বাণী তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। শ্রীগীতা তাঁহার উত্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিল, সকল সন্দেহ মিটিল, তিনি গীতার ভিতর সত্য-সুন্দরের সন্ধান পাইলেন। বিলাতে পঠদ্দশায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তিনি লণ্ডনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য ইনার্ টেম্পল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ব্যারিষ্টারি সনন্দ লাভ করেন।

দেশাগমন।

ব্যারিষ্টার হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী দেশে ফিরিলেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া তিনি যে হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিলেন, তাহার কল্পনাও ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহার মনে জাগে নাই। তিনি শুনিলেন, প্রত্যক্ষ ভগবতীতুল্য স্নেহশীলা আনন্দরূপিণী জননী আর ইহ জগতে নাই! এ সর্ব্বনাশের সংবাদ তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। মাতার কনিষ্ঠ পুত্র, স্নেহের দুলাল শ্রীযুক্ত গান্ধীর সরল হৃদয়ে এ সংবাদ শেলের মত বিঁধিল। তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কেবল মনে হইতে লাগিল, সেই স্নেহময়ী পুণ্যবতী জননীই যে তাঁহাকে অধঃপতনের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন! আজ তিনি কোথায়? তাঁহার পুত্র যে প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যশের মুকুট শিরে ধরিয়া, অকলঙ্ক চরিত্রে গৃহে ফিরিয়াছে, কে তাহাকে বরণ করিয়া লইবে?

যথারীতি অশৌচান্তে শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাই হাইকোর্টে

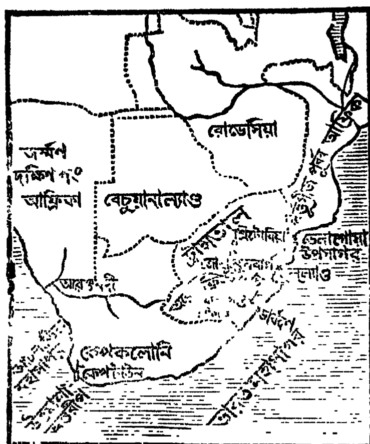
ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি কখনও বোম্বায়ে কখনও বা রাজকোটে অবস্থান করিতেন। দেড় বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধীর অদৃষ্ট ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল।

আফ্রিকা-যাত্রা।

পোরবন্দরের জনৈক প্রসিদ্ধ সওদাগরের একটী বাণিজ্য-শাখা, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটোরিয়া সহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রিটোরিয়া ট্রান্সভাল রাজ্যের রাজধানী। তথায় ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন জটিল মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত উল্লিখিত সওদাগর শ্রীযুক্ত গান্ধীকে নিয়োগ করিতে চান। ঐ মামলায় তাঁহার ন্যায় আরও অনেক ভারতীয় সওদাগরের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। বৎসরাধিকাল মামলা চলিবে, এইরূপ অনুমান। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই সওদাগরের পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক অল্প দিনের নহে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো ডা-গামা প্রমুখ পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের সন্ধানে বাহির হইয়া পথে দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার করেন। তদবধি ইউরোপীয় নাবিকেরা এদেশে যাতায়াত কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট একবার বিশ্রাম লইতেন। এই উপলক্ষে কেপটাউন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত গান্ধী যে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন, তৎকালে ঐ অঞ্চলে এই কয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল :—



দক্ষিণ আফ্রিকার মানচিত্র

(১) কেপ কলোনি,
(২) নেটাল,
(৩) জুলুল্যাণ্ড,
(৪) অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট,
(৫) ট্রান্সভাল,
(৬) বাসুতোল্যাণ্ড,
(৭) বেচুয়ানাল্যাণ্ড,
(৮) রোডেসিয়া।

ইহাদের মধ্যে কেপ-কলোনি ও নেটাল, এই দুইটী বৃটিশ উপনিবেশ ; এখানকার অধিবাসিগণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ভোগ করিতেন। জুলুল্যাণ্ড ইংলণ্ডের ক্রাউন-কলোনি। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী 'জুলু' অর্থাৎ কাফ্রিগণ এই রাজ্যের অধিবাসী।* অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ও ট্রান্সভাল, এই দুই রাজ্যে বুয়রগণের বাস। বুয়রেরা ওলন্দাজ বংশসম্ভূত। তাঁহাদের সরহদ্দে প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; তবে ট্রান্সভাল

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিকথা।

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জুলুল্যাণ্ড নেটালের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বৃটিশ কর্তৃত্ব স্বীকার করিত; অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। বাসুতোল্যাণ্ড, ও বেচুয়ানাল্যাণ্ড, এই দুইটি কাফ্রি-রাজ্য ইংরাজের প্রভুত্বাধীনে পরিচালিত হইত। রোডেসিয়ার শাসন ভার ইংরাজের সনন্দপ্রাপ্ত এক বৃটিশ কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পশ্চিম প্রান্তে জর্ম্মণ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সুবিস্তৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেটালের অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল যে, সেখানে বৃটিশ উপনিবেশ সফল হইবে কিনা সন্দেহ হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেটাল গভরমেণ্ট স্বদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনার্থ সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ফলে, ভারতের প্রতি তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। তাঁহারা বিলাতী গভরমেণ্টের মারফতে ভারতের দরবারে প্রস্তাব করেন যে, এদেশ হইতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (Indentured labourers) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হউক। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তৎকালে ভারত গভর-মেণ্টকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, নেটালে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা হইবে এবং চুক্তির কাল অতীত হইলে, তাহারা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সে সুবিধাও পাইবে। তদবধি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণ কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দর হইতে দলে দলে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে ধাবিত

হয়। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই নেটালের জঙ্গলাকীর্ণ উষর ক্ষেত্রে স্থবর্ণ ফলিতে থাকে। চারিদিকে চা-বাগান ও ইক্ষুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ধন-জন-সম্পদে নেটাল হাস্যময় হইয়া উঠে। নেটালের ন্যায় ট্রান্স-ভাল ও কেপরাজ্যেও ভারতীয় শ্রমিকগণের ডাক পড়িয়া-ছিল। তবে নেটালের তুলনায় ঐ দুই রাজ্যে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কেপ-রাজ্যে প্রায় দশ হাজার ও ট্রান্সভালে প্রায় পাঁচ হাজার ভারতীয় অবস্থান করিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনজীবী ভারতীয় ব্যবসাদারেরা ক্রমশঃ তথায় বিপণি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় ক্রেতৃগণের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র সরবরাহ করিতেন। ক্রমশঃ কাফ্রিগণ ভারতীয় ব্যবসাদারদের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। এই ব্যবসাদারগণের অধিকাংশই বোম্বায়ের মুসলমান। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণের মধ্যে অনেকে চুক্তির কাল (পাঁচ বৎসর) অতীত হইলে, বহুবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হইয়া, তথায় নানা উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিত। জিনিসপত্র ফেরি করা, অল্প মূলধনে ছোট ছোট দোকান চালান, ভদ্র লোকের বাড়ী চাকর থাকা, মালীগিরি করা প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইত। ফলে, দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন ভারতীয়গণকে এই ত্রিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, (২) চুক্তিমুক্ত শ্রমিক, (৩) স্বাধীনজীবী ব্যবসাদার, ডাক্তার, স্কুল মাষ্টার, পুরোহিত, ইণ্টারপ্রেটার, কেরাণী প্রভৃতি।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেটালের অধিবাসী সংখ্যা কিরূপ দ্রুতহারে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, পাঠক নিম্নলিখিত তালিকায় দেখুন,—

বর্ষ	শ্বেতাঙ্গ	ভারতীয়	কাফ্রি	মোট।
১৮৭৪—	১৮,৬৪৬	৬,৭৮৭	২,৮১,৭৯৭	৩,০৭,২৩০
১৮৭৯—	২৪,৬৫৪	১৬,৯৯৯	৩,১৯,৯৩৪	৩,৬১,৫৮৭
১৮৮৪—	৩৫,৪৫৩	২৭,২৭৬	৩,৬১,৭৬৬	৪,২৪,৪৯৫
১৮৮৯—	৩৬,৩৯০	৩৩,৪৮০	৪,৫৯,২৮৮	৫,৩০,১৫৮
১৮৯৪—	৪৫,৭০৭	৩৫,৪১১	৫,০৩,২০৮	৫,৮৪,৩২৬
১৮৯৮—	৫২,৩৮৩	৬১,১০৩	৫,৮৭,২৪৪	৭,০০,৭৩০

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে নেটালে শ্বেতাঙ্গগণ সংখ্যায় আড়াইগুণ, ভারতীয়গণ সাড়ে পাঁচগুণ এবং কাফ্রিগণ প্রায় দুইগুণ বাড়িয়াছিল। সুতরাং ঐ হারে ভারতীয় আগন্তুকগণের দলপুষ্টি হইলে হয়ত নেটাল গভরমেণ্টের উপর ভারতীয়গণের প্রভাব একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, হয়ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি কিছু খর্ব্ব হইবে, হয়ত তাঁহাদের মুখের অন্ন ভারতের 'কালা আদমি'রা কাড়িয়া খাইবে, এই আশঙ্কা উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের হৃদয়ে জাগিয়াছিল।

উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ সে সময়ে ভারতীয়গণকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, শ্রীযুক্ত গান্ধীর মুখে পাঠকগণ শুনুন।

ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা।

১৮৯৬ খৃঃ ২৬শে অক্টোবর মাদ্রাজে এক সার্ব্বজনিক সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা বর্ণনকালে তিনি এই মর্ম্মে বলেন,—

"দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ একান্ত ঘৃণ্য জীব। কি ইতর কি ভদ্র, ভারতীয় মাত্রেই সেখানে 'কুলি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে 'কুলি-মাষ্টার'—ভারতীয় দোকানদার-গণকে 'কুলি দোকানদার' বলা হয়। দাদা আবদুল্লা ও মুস হাজি কাসিম নামে দুইজন বোম্বাইবাসী ভদ্রলোক সেখানে জাহাজের মালিক; তাঁহাদের জাহাজ 'কুলি জাহাজ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এ কোলাণ্ডা-ভেলু পিলে এণ্ড কোং নামে এক সম্রান্ত মাদ্রাজী কোম্পানি ডার্ব্বাণ বন্দরে বৃহৎ অট্টালিকা-শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ অট্টালিকা-শ্রেণীকে 'কুলি ষ্টোর্স' এবং উহার মালিকগণকে 'কুলি মালিক' বলা হয়। সেখানে রেলের ও ট্রামের কর্ম্মচারিগণ, কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, আমাদের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিয়া থাকে। তথায় ফুটপাথের উপর চলা-ফেরা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে; তাহা হইলে হয়ত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে, অথবা অপমান করিবে। †

* * * *

ট্রান্সভালে কোথাও কোথাও একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে ভাড়াটিয়া কোচ্ (বড় গাড়ী) পাওয়া যায়। কোচের ভিতরে

† প্রিটোরিয়ার রাজপথে একদিন এক প্রহরী শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পদাঘাত করিয়া ফুটপাথ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

বসিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রচণ্ড শীতে ও প্রখর রৌদ্রে আমাদিগকে গাড়ীর বাহিরে বসিয়া যাতনা সহিতে হয়। হোটেলে আমরা স্থান পাই না; এমন কি শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত স্থানে কোন সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীর পক্ষে সামান্ত জলযোগ সংগ্রহ করাও দুষ্কর। কিছুদিন পূর্ব্বে একদল শ্বেতাঙ্গ, নেটালের ডাণ্ডি পল্লীতে একখানি ভারতীয় দোকানে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। ভারতীয়গণের প্রতি এই বিজাতীয় ঘৃণার অভিব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার নানারাজ্যে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা সঙ্কোচক আইন-কানুনে পরিস্ফুট হইয়াছে।”*

মাদ্রাজে উল্লিখিত বক্তৃতা করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভিতর ভারতীয়-বিদ্বেষ প্রজ্বলনোন্মুখ ধূমের ন্যায় ঘনায়িত হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশে শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের ডার্ব্বাণ বন্দরে অবতীর্ণ হন।

* পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, ইহা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ে ট্রান্সভালে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তদবধি অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদকারী, ন্যায়দণ্ডধারী, সমদর্শী বৃটনের নৈতিক প্রভাবে এবং পরবর্ত্তী ঘটনায় ভারতীয়গণের গুণের পরিচয় পাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ অধুনা অনেকটা সংযত হইয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই বিলাতে রাষ্ট্রীয় সমর-পরিষদে (Imperial War Conference) সমবেত বৃটিশ উপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের প্রস্তাবানুযায়ী উপনিবেশবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থ সংক্রান্ত কতিপয় গুরুতর সমস্যার অনুকূল মীমাংসা করিয়া দেন এবং অবশিষ্ট অনুযোগগুলির আশু মীমাংসার নিমিত্ত স্ব স্ব গভরমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

বন্দরে নামিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বাধীনতার লীলাভূমি বিলাতে ও আফ্রিকায় কত প্রভেদ! শুধু ভারতীয় বলিয়া তাঁহাকে অনেকবার বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি নেটালের সুপ্রিম কোর্টে ভোকেট্‌রূপে প্রবেশপ্রার্থী হইলে তত্রত্য আইন-সমিতি Law Society) এই বলিয়া আপত্তি তুলিলেন যে, কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের গৌরব লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক ধীরবুদ্ধি বিচারকগণ এ আপত্তি শুনিলেন না। পরে আদালতে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারি শিরস্ত্রাণ উন্মোচনের নিমিত্ত কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করা হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী একান্ত বিরক্ত হইয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

গান্ধীর লাঞ্ছনা।

ট্রান্সভাল গমন কালে ট্রেণের গার্ড তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে জোরপূর্ব্বক নামাইয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া সেই কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি গার্ডের আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিলেন, এই কি সেই ন্যায়দণ্ডধারী, দুর্ব্বলের সহায়, বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য!

এইরূপ লাঞ্ছনা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বহুবার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজের জন্য যতটা বেদনা না বোধ করিতেন, ততোধিক বেদনা স্বদেশবাসীর জন্য অনুভব করিতেন। কিন্তু উপায় কি!

যে মামলা সূত্রে শ্রীযুক্তগান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়াছিলেন

তাহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শেষ হইয়া গেল। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। নেটালের ভারতীয়গণ একটী বিদায়-ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিল। ভোজের দিন সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের একখানি সংবাদ-পত্রে অকস্মাৎ এই সংবাদ পাঠ করিলেন যে, তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনে ভারতীয়গণ ভোট-দানের যে অধিকার এতাবৎকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অপহরণের নিমিত্ত শীঘ্রই একটী বিল উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে পেশ হইবে এবং তৎপরে ভারতীয়গণকে আটে-পিঠে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে আরও বহুবিধ আয়োজন চলিবে। শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, এবার সত্য সত্যই পশ্চিম গগনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিয়াছে; শীঘ্রই প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিবে। তাহাতে অভাগ্য ভারতীয়গণের নিষ্পেষণ অবশ্যম্ভাবী।

বিদায়ে বাধা।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ নেটালের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের তুল্য অধিকার ভোগ করিতেন; অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন শ্বেতাঙ্গ বা ভারতীয় পুরুষ পঞ্চাশ পাউণ্ড (সাড়ে সাতশত টাকা) মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইলে বা বার্ষিক দশ পাউণ্ড (দেড়শত টাকা) খাজনা দিলে, বৃটিশ প্রজা বলিয়া, তাঁহার নাম ভোটদাতৃগণের তালিকায় স্থান পাইত। কাফ্রিগণের ভোটদান সম্বন্ধে পৃথক্ নিয়ম প্রচলিত ছিল। সূক্ষ্মবুদ্ধি গান্ধী

অনুমানে বুঝিলেন যে, অতঃপর ভারতীয়গণকে আইনের চক্ষে কাফ্রিদের তুল্য হীন করা হইবে। তিনি এই বিপদ বার্ত্তা ভোজসভায় সম্মিলিত ভারতীয়গণকে জানাইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নাবিকহীন নৌকার আরোহীর ন্যায় একান্ত অসহায় বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ধরিয়া বসিলেন।

এখন শ্রীযুক্ত গান্ধী কোন্ পথে যাইবেন? স্বদেশে স্বজন-মণ্ডলীর মধ্যে ব্যারিষ্টারি করিয়া, তাঁহার ন্যায় মেধাবী যুবক অবশ্যই বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে পারিবেন—সকলের সম্মানভাজন হইবেন—এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। তিনি

পরার্থপরতার জয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অতি অল্প দিনের জন্য গিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। তত্রত্য ভারতীয় সমাজ তাঁহার তুল্য শিক্ষিত নহে। তাহাদের কাহারও সহিত তাঁহার আত্মীয়তা নাই; এমন কি পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। সেখানে ব্যারিষ্টারি করিয়া তেমন লাভের আশা করাও বাতুলতা মাত্র; বরং পদে পদে নির্যাতন ও অবমাননা সহ্য করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কয়জন যুবক বিদেশে পরের জন্য নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতে পারে?

পরার্থৈকপ্রাণ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের বিপদে বিচলিত হইলেন। তিনি তাহাদের অদৃষ্টের সহিত নিজের অদৃষ্ট মিলাইয়া দিলেন। তাঁহার পরামর্শে তৎক্ষণাৎ

উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে এই মর্ম্মে তার প্রেরিত হইল যে, ভারতীয়গণের সম্বন্ধে সঙ্কল্পিত বিলটী যেন তাড়াতাড়ি আইনে পরিণত না হয়।

সঙ্ঘ গঠন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী দেখিলেন, ভারতীয়গণের স্বার্থ রক্ষার্থ একটী সভা প্রতিষ্ঠা না করিলে, সমবেতভাবে কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। এই সঙ্কল্প সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইল—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নেটালে সম্ভ্রান্ত ভারতীয়গণের সহযোগে 'নেটাল ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস' নামে এক মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী ঐ সভার অনারারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। তা'ছাড়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা-সমিতি নানাস্থানে লোকমত গঠনে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর অধীনে একদল ত্যাগী কর্ম্মঠ ভারতীয় যুবক, স্বদেশীয়গণের হিতসাধন কল্পে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রবল, অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা, আদর্শ আতুর-সেবা, কঠোর সংযমাভ্যাস, আড়ম্বরহীন আচরণ, একনিষ্ঠ সত্যবাদিতা ও নিষ্কলঙ্ক পরার্থপরতা সন্দর্শন করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল; মনে করিল—শ্রীভগবান তাহাদেরই উদ্ধারের নিমিত্ত এই দেবদূতটীকে প্রেরণ করিয়াছেন!

অতঃপর উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে উত্থাপিত ভারতীয় বিলটী নাকচ করাইবার জন্য নবীন কংগ্রেসের পক্ষে উৎসাহী গান্ধী অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল

না। প্রস্তাবিত বিলটী যথারীতি পাশ হইয়া 'এসিয়াবাসীর বহিষ্কার বিধি' (Asiatic Exclusion Act) নাম ধারণ করিল। আইনের মর্ম্ম এই যে, এসিয়াবাসী মাত্রেই ভোটের অধিকার ভ্রষ্ট হইবেন। কোন নূতন আইন পাশ হইলে তাহা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরী লইতে হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত আইনের বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি যুক্তিপূর্ণ দরখাস্ত বিলাতের তৎকালীন উপনিবেশ-সচিব মিঃ জোসেফ্ চেম্বারলেনের * নিকট প্রেরণ করিলেন। উপনিবেশ-সচিব শ্রীযুক্ত গান্ধীর অলজ্ঘ্য যুক্তিপরম্পরা পাঠ করিয়া নূতন আইনে মহারাণীর মঞ্জুরী রদ্ করিয়া দিলেন। ফলে, প্রথম আইন-জাল শতধা ছিন্ন হইল।

প্রথম আইন রোধ।

পর বৎসর উপনিবেশ-কর্ত্তৃপক্ষ উল্লিখিত বিলটী প্রত্যাহার করিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিল উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে পাশ হইল। শেষোক্ত বিলটী আইনে পরিণত করিবার পূর্ব্বে উপনিবেশিক কর্ত্তারা তাহা মিঃ চেম্বারলেনকে দেখাইয়া লইয়াছিলেন; সুতরাং এবার ভারতীয়গণের পক্ষে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও নূতন আইনে মঞ্জুরী লাভ করিতে বিলম্ব ঘটিল না। উল্লিখিত আইনের মর্ম্ম এই যে, যে দেশে

দ্বিতীয় আইন প্রবর্ত্তন।

* ইনি ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের পিতা; ১৮৯৫ খৃঃ হইতে ১৯০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিব ছিলেন।

পার্লামেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচিত সদস্য সমবায়ে গঠিত শাসন-প্রতিষ্ঠান নাই, সে দেশের কোন অধিবাসী (শ্বেতাঙ্গ বংশসম্ভূত না হইলে) সকৌন্সিল গভর্ণরের ছাড়পত্র ব্যতীত, ভোটদাতৃগণের তালিকাভুক্ত হইবে না; তবে যাহাদের নাম ইতিপূর্ব্বে ঐ তালিকায় স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অধিকার পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী দেখিলেন, একেই ত ভারতীয়গণের মধ্যে ভোটদাতার সংখ্যা অতি অল্প, তদুপরি যদি প্রকারান্তরে তাহাদের ভোটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আইনের চক্ষে তাহারা ত ছোট হইবেই; পরন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের মনোমত সভ্য নির্ব্বাচনের সুবিধা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। তিনি ভারতীয়গণের পক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, নির্ব্বাচনমূলক শাসন-প্রতিষ্ঠান ভারতেও রহিয়াছে; সুতরাং নূতন আইনটী এসিয়াবাসীর পক্ষে যদি বা প্রযোজ্য হয়, ভারতীয়গণের সম্বন্ধে কিছুতেই খাটিবে না। ইহাই বিরোধের প্রথম স্তর।

এত বিদ্বেষ কেন?

ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়াও উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নেটাল-যাত্রী দরিদ্র শ্রমিক-দলকে দেখিয়াই, ভারতের অধিবাসিগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে হেয় ধারণা জন্মিয়াছিল। ভারতীয়গণ যে আর্য্য সন্তান—ব্যাস বশিষ্ঠের বংশধর—তাহারাই যে

জগতে সভ্যতার প্রথম আলোকশিখা জ্বালিয়াছিল—জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষণায় একদিন জগতে গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিল, এ সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণের কর্ণে কখনও পৌঁছে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, ভারতীয় মাত্রেই কুলি। কুলি কখনও শ্বেতাঙ্গের সমান আসন পাইতে পারে না।

শ্রমিক আইনের শক্ত বাঁধন।

এদিকে স্বাধীনজীবী ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। কোথাও কোথাও বা তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ বণিকগণের সহিত সমকক্ষতা করিতেন। তাঁহাদের তুল্য সুলভে বা স্বল্পলাভে জিনিষ পত্র সরবরাহ করা শ্বেতাঙ্গ বণিকগণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; কারণ তাঁহাদের সাজ-সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় অনেক অধিক। কাজেই স্বাধীনজীবী ভারতীয়গণকে দেশান্তরিত করিবার জন্য আইনের এক নূতন ফাঁদ পাতা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইত,—

(১) পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবে না। (২) স্ত্রীপুত্রাদি সহ বিনা ভাড়ায় কার্য্যস্থানে নীত হইবে। (৩) নিজের ও পরিজনবর্গের আহার এবং বাসস্থান বিনামূল্যে পাইবে। (৪) প্রথম বৎসর মাসে দশ শিলিঙ (সাড়ে সাত টাকা) বেতন প্রদত্ত হইবে; পরে প্রতি বৎসারান্তে মাসিক বেতন এক শিলিঙ (বার আনা) বাড়িবে।

(৫) চুক্তির কাল অতীত হইলে কোন শ্রমিক যদি আরও পাঁচ বৎসর কাল স্বাধীন শ্রমিকরূপে তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে বিনা ভাড়ায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে।

ইহার পরিবর্ত্তে নেটাল গভরমেণ্ট নিম্নলিখিত সর্ত্তে এক নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইলেন,—

প্রথম চুক্তির পাঁচ বৎসর অতীত হইলে শ্রমিকগণকে হয়, (ক) ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা (খ) আজীবন নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে কালাতিপাত করিতে হইবে। শেষোক্ত পন্থাবলম্বি-গণের বেতন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া নয় বৎসর পরে মাসিক এক পাউণ্ড অর্থাৎ পনর টাকা দাঁড়াইবে। কোন শ্রমিক চুক্তিকাল অন্তে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন বা নূতন চুক্তিতে প্রবেশ না করিয়া নেটালে অবস্থান করিলে, তাহা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

নেটালের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন যে, সঙ্কল্পিত বিলটী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে ভারত গভরমেণ্টের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন; কারণ, ভারত গভরমেণ্ট যদি ঐরূপ সর্ত্তে শ্রমিক পাঠাইতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে নেটালের কৃষিক্ষেত্রগুলি আবার আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কাজেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেটালের পক্ষে দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ভারতে আসিয়া নূতন সর্ত্ত গ্রহণের জন্য তৎকালীন বড়লাটের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ভারত গভরমেণ্ট অন্যান্য সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন বটে; কিন্তু কোন শ্রমিক চুক্তির কাল অন্তে স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে, বা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হইলে,

ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইবে, এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

নেটালের কর্ত্তৃপক্ষ তখন অন্য উপায় আবিষ্কার করিলেন। তাঁহারা ফৌজদারী দণ্ড প্রয়োগের পরিবর্ত্তে, নেটালের স্বাধীন ভারতীয়গণের উপর বার্ষিক তিন পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ টাকা) মুণ্ডকর (Poll Tax) আদায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র—সকল স্বাধীন ভারতীয়কেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই গুরু করভার বহন করিতে হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন, ইহা সাধারণ শ্রমিকের ছয় মাসের বেতন! জনপ্রতি বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ টাকা মুণ্ডকর দিয়া কোন্ শ্রমিক নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিতে সক্ষম? কাজেই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, ভারতীয় শ্রমিকগণকে চুক্তিকাল অন্তে হয় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা দাসখৎ লিখিয়া দিয়া আজীবন দাসত্বের পাদুকা শিরে বহন করিতে হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। নেটালে শ্রমিক-জীবনের শেষ পরিণাম এই!

শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ভারতীয়গণের পক্ষে উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে তীব্র প্রতিবাদ-পত্র প্রেরিত হইল। কিন্তু হায়! কোন ফল হইল না—বিলটী যথা নিয়মে পাশ হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়গণের এইরূপ বহিষ্কার প্রস্তাব একবার নেটাল দরবারে উত্থাপিত হওয়ায়, যাঁহারা তৎকালে

দৃঢ়তার সহিত তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবার তাঁহারাই এই আইনের উদ্যোগী! সে সময়ে ঐরূপ আইন প্রবর্ত্তন প্রয়োজন কিনা, স্থির করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনে নেটালের এটর্ণি-জেনারেল এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেন,—

বিফল আন্দোলন।

"ভারতীয় শ্রমিকগণ নামে মাত্র স্বেচ্ছায় এদেশে আসিলেও বস্তুতঃ তাহারা প্রায়ই বিনা সম্মতিতেই আনীত হইয়া থাকে। তাহারা জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঁচটী বৎসর এদেশের কাজে কাটাইয়া দেয়। এই সময়ের মধ্যে পুরাতন সম্বন্ধ তাহারা ভুলিয়া যায়—নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়; হয়ত এদেশে ঘর-বাড়া বাঁধিয়া বসে। অতএব আমার ন্যায়বিশ্বাসমতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া, পরে তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা ভারতীয় শ্রমিকের আমদানি আদৌ বন্ধ করিয়া দেওয়া অনেক ভাল। এই উপনিবেশ ভারতীয়গণকে চায়, অথচ তাহাদের আগমনের ফল এড়াইতে উৎসুক। আমি যতদুর জানি, ভারতীয়গণ কোন ক্ষতি করে নাই; বরং এক হিসাবে অনেক ভালই করিয়াছে। যাহারা পাঁচ বৎসর সচ্চরিত্রতার সহিত এদেশে কাটাইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উপযুক্ত কারণ, আমি কিছুই শুনি নাই।"

দশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ নির্ভীক ভাষায় যিনি ভারতীয়গণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনিই এবার নূতন বিলের খসড়া উপনিবেশিক পার্লামেন্টে পেশ করিলেন! শুধু এটর্ণি জেনারেল নহেন, নেটালের বহু পদস্থ ব্যক্তিই এবার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

নূতন বিলের বিবরণ পাঠ করিয়া লণ্ডনের 'টাইম্স'ও

'ষ্টার' প্রমুখ স্বনামপ্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রসমূহ নেটালপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'ষ্টার' পত্র লিখিলেন,—

"নূতন বিলে ভারতীয়গণকে ক্রীতদাস করিবার আয়োজন হইয়াছে। প্রস্তাবটী একান্ত গর্হিত, বৃটিশ প্রজার অপমানকর, প্রস্তাবকারিগণের কলঙ্কসূচক ও আমাদের প্রতি উপেক্ষাব্যঞ্জক। দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদারদের বণিকসুলভ অর্থগৃধ্নুতার ফলে এত বড় একটা উৎকট অন্যায় যাহাতে না ঘটে, তৎপ্রতি প্রত্যেক ইংরাজেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।"

'টাইম্‌স' বলিলেন,—

"ভারত গভরমেণ্টের হাতে এক অতি সহজ প্রতিকারোপায় রহিয়াছে। উপনিবেশ-যাত্রিগণের বর্ত্তমান মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহারা নেটালে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারেন।"

এবারও শ্রীযুক্ত গান্ধী উপনিবেশ-সচিবের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইলেন। তিনি এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন যে, প্রস্তাবিত বিলটী পরিত্যক্ত হউক, অথবা ভারতীয় শ্রমিক আমদানির পথ রুদ্ধ হউক। বিলাতী সংবাদ-পত্রসমূহের অনুকূল মন্তব্য পাঠ করিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন বিল নাকচ হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের আয়োজন এমনই প্রবল যে, শ্রীযুক্ত গান্ধীর আবেদন-পত্র বন্যামুখে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া গেল। বিলটী মহারাণীর মঞ্জুরী লাভ করিয়া পাকা আইনে পরিণত হইল। কর্ম্মবীর গান্ধী

কিন্তু ইহাতেও হতাশ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, আরও কঠোর পরীক্ষা আসিতেছে।

স্বদেশে সহানুভূতি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা-কাহিনী বিবৃত করিয়া একখানি 'খোলা চিঠি' ভারতীয় নেতৃগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমিকতা এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবলের পরিচয় বহুপূর্ব্বেই ভারতবাসীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। ভারতবাসী তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া প্রীতির মাল্য পরাইয়া দিল। তিনি বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি নানাস্থানে সাধারণ সভায় প্রবাসী ভারতীয়গণের নির্য্যাতন-বার্ত্তা জ্বলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়া এবং ঐ বিষয়ক পুস্তকাদি অজস্র প্রচার করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী অভাগ্য ভারতীয়গণের জন্য এদেশে সহানুভূতির স্রোত তর তর বেগে বহিল।

ভারতে এই আন্দোলনের সংবাদ 'রয়টারে'র তারে অতি সংক্ষেপে বিকৃতাকারে নেটালে পৌঁছিল। নেটালের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণ শুনিলেন, শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে আসিয়া এই মর্ম্মে পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন যে, নেটালে ভারতীয়গণ প্রহৃত, হৃতবিত্ত ও পশুবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

তাহার প্রতিকার কিছু হয় না। ‘রয়টার’ ইহাও জানাইলেন যে, বোম্বায়ের ‘টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া’ পত্র এই অভিযোগের তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত সংবাদ বারুদ-স্তূপে নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নেটালের শ্বেতাঙ্গ সমাজে ঘোর জিঘাংসানল প্রজ্জ্বলিত করিল। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার নানা স্থানে সভা আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিরুদ্ধে অশেষ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রজ্জ্বলিত রোষবহ্নি নেটালের নিরীহ ভারতীয়গণের ভীতি উৎপাদন করিল। তাঁহারা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে অবিলম্বে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য জরুরি সংবাদ পাঠাইলেন।

শরণাগত-বৎসল গান্ধী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি স্ত্রীপুত্রাদিসহ সত্বর দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। যে জাহাজে তিনি ডার্ব্বাণ পৌঁছিলেন, সেই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ছয় শত ভারতীয় আরোহী লইয়া আর একখানি জাহাজ ঐ বন্দরে প্রবেশ করিল। উভয় জাহাজকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ‘কোয়ারাণ্টাইন’* আইন অনুসারে যাত্রীদলসহ আটক রাখা হইল। এদিকে ডার্ব্বাণ বন্দরে

* সংক্রামক ব্যাধি-প্রপীড়িত বন্দর হইতে আগত কোন জাহাজ নূতন বন্দরে পৌঁছিলে, তাহাকে যাত্রী ও মালপত্র নামাইবার পূর্ব্বে, কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হয়। ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ, এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

গুজব রটিয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী এবার স্বদেশ হইতে বহু সুদক্ষ কারিগর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন; তাহারা শ্বেতাঙ্গ কারিগরগণকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিয়া, সমস্ত শিল্পকার্য্যগুলি আয়ত্তাধীন করিবে; ফলে শ্বেতাঙ্গ কারিগরগণের অন্নে ধূলি পড়িবে।

এই জনরবে আস্থা স্থাপন করিয়া নেটালের শ্বেতাঙ্গ শিল্পিগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। তাহারা স্থির করিল যে, নবাগত ভারতীয়গণকে কিছুতেই জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইবে না। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। দলে দলে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবিগণ সমুদ্রতটে সমবেত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব করিল যে, যাত্রীদলসহ জাহাজ দুইখানি অগাধ জলধি তলে ডুবাইয়া দেওয়া হউক! অবশেষে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে জানান হইল যে, তিনি যদি সঙ্গীদলসহ ডার্ব্বাণে অবতীর্ণ হইতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ ঘটিবে; সে সঙ্কটে কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব তিনি দলবলসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু ইহাতে তিলমাত্র ভীত হইলেন না; তিনি 'কোয়ারাণ্টাইনে'র কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 'কোয়ারাণ্টাইনে'র আইনসঙ্গত সময় কাটিয়া গেল; কিন্তু যাত্রীদলকে অবতরণের আদেশ প্রদত্ত হইল না—জাহাজ দুইখানি রাজা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যপথে আটক রহিল। জাহাজের সত্ত্বাধিকারিগণ তখন

উপায়ন্তর না দেখিয়া আদালতের আশ্রয় লইবেন, স্থির করিলেন। তখন নেটাল গভরমেণ্ট নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাত্রীদলকে বন্দরে নামাইবার হুকুম দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ডার্ব্বাণের ক্রোধান্ধ শ্বেতাঙ্গগণ দলে দলে 'ডক্' অভিমুখে ছুটিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্থানটী রুদ্র জনতায় ভরিয়া গেল! চারিদিকে রোষদীপ্ত আস্ফালন, প্রবল হুঙ্কার ও অশ্রান্ত কোলাহলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বুঝিয়া নেটালের এটর্ণি-জেনারেল জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর দোহাই, তোমরা এখানে হাঙ্গামা করিও না ; স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাও। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, নেটাল পার্লামেণ্ট ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা অতি সত্বর করিবেন।"

জীবন সঙ্কট।

ইহার পর হাঙ্গামাকারিগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহযাত্রীদল তীরে নামিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ শ্রীযুক্ত পার্শি রস্তমজী নামে জনৈক ধনবান বন্ধুর গৃহে প্রেরিত হইলেন। তখনও হাঙ্গামাকারীরা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টার আসিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সে সময় বন্দরে নামিতে নিষেধ করিলেন ; বলিলেন,—'আপনি সন্ধ্যার পর নামিবেন।' কিছুক্ষণ পরে মিঃ লাউটন নামে নেটালের জনৈক উদারহৃদয় শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জাহাজে আসিলেন। নির্ভীক

গান্ধী অন্ধকারের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার সহিত তীরে নামিয়া পড়িলেন। বৃটিশের ন্যায়বুদ্ধি ও সততাই তাঁহার ভরসা! তিনি বন্ধুর সহিত পদব্রজে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কয়েকজন হাঙ্গামাকারী তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। তাহারা বাঘের পশ্চাতে 'ফেউ'র মত বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল। বন্ধুটী তাড়াতাড়ি একখানি 'রিক্স' * ভাড়া করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু জনতা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন বন্ধুর সহিত পুনরায় পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। জনসজ্ঘ উত্তরোত্তর প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। বন্ধুদ্বয় একটী রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া জনতার চাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে হাঙ্গামাকারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; অজস্র প্রহারে তিনি অর্দ্ধমৃত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন।

শ্বেতাঙ্গ মহিলার মহত্ত্ব।

দূর হইতে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া এক সহৃদয়া শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রাণ কাঁদিল। শক্তিরূপিনী জননীর ন্যায় তিনি বিপন্নের রক্ষায় ধাবিতা হইলেন; কিন্তু এ অবস্থায় তিনি একা কি করিবেন! কি উপায়ে ক্রোধান্ধ জনসজ্ঘের মুখ হইতে প্রহার-জর্জ্জরিত গান্ধীকে ছাড়াইয়া লইবেন? সহসা প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির জয় হইল। মহাপ্রাণা শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিজের ছাতাটী খুলিয়া বিপন্ন গান্ধীর মস্তকে ধরিলেন। উন্মত্ত জনসজ্ঘ বিস্ময়বিস্ফারিত

* মানুষটানা হাল্কা গাড়ী।

লোচনে দেখিল—ইনি স্বয়ং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডণ্টের সহধর্ম্মিণী মিসেস্ আলেকজান্দার!

শ্রীযুক্ত গান্ধী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পুলিশদল তাঁহাকে এক বন্ধুর গৃহে লইয়া গেল। সেখানেও আবার উত্তেজিত জনসঙ্ঘ চারিদিকে উগ্র আস্ফালন করিতে লাগিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইলেন যে, হয়ত তাহারা অগ্নি-সংযোগে গৃহদাহ করিতে পারে। পাছে বন্ধুটী সর্ব্বস্বান্ত হন, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী কনষ্টেবলের বেশে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সরকারী থানায় আশ্রয় লইলেন। হাঙ্গামাকারিগণের এই সাময়িক উচ্ছ্বাস শনৈঃ শনৈঃ প্রশমিত হইল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্যের বুয়রগণের বিরুদ্ধে বিপুল বৃটিশবাহিনী অবিলম্বে প্রেরিত হইল।

বুয়র-সমর।

শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, ভারতীয়গণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সময় আসিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভারতীয়গণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিবার—বিদ্বিষ্ট উপনিবেশিকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার—ইহাই ত শুভ অবসর! তাঁহার আহ্বানে দক্ষিণ আফ্রিকার শত শত ভারতীয় যুবক স্বেচ্ছাসেবকরূপে যুদ্ধে যাইবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু তাহাদের আবেদন কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিলেন না। উৎসাহী গান্ধী আবার একবার দরখাস্ত দিলেন, সেবারও তাহা পরিত্যক্ত হইল। শেষে

যখন কর্ত্তারা দেখিলেন যে, বুয়রগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত সহজ নহে, তখন তাঁহারা ভারতীয় সেবকদলকে আহ্বান করিলেন।

জনপ্রিয় গান্ধীর নেতৃত্বে এক সহস্র ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবক সমবেত হইল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতগণকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার ভার পাইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচালনায় ভারতীয় বাহকদল কিরূপ অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধার মুখে শুনুন। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে জোহানেস্‌বার্গের 'ইলাষ্ট্রেটেড্ ষ্টার' পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক-দলের কৃতিত্ব।

"অতঃপর নেটালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর গঠিত ভারতীয় বাহকদলের কঠোর কর্ত্তব্য আরম্ভ হইল। ভারতীয়গণ এই ব্যাপারে অসাধারণ সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। এক রাত্রি গুরুতর পরিশ্রমের পর আমি প্রত্যুষে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম। তিনি সৈন্যদলের রসদী বিস্কুট খাইতেছিলেন। জেনারেল বুলারের অধীনস্থ সৈন্যগণ তখন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। সারা বিশ্ব তাহাদের চক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কিন্তু ব্যবহারে খুব সংযত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কথা-বার্ত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং প্রসন্ন-নয়ন দেখিলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় যথারীতি আদব-কায়দার সহিত সম্পন্ন হয় নাই; তথাপি আমাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। তদবধি আমি তাঁহাকে নেটালের যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার সেই শিক্ষাহীন ক্ষুদ্র দলের সহিত কর্ম্মরত দেখিয়াছি। যেখানে সাহায্য প্রয়োজন, সেইখানেই তাহারা উপস্থিত! এই অপ্রগলভ

নির্ভীকতার ফলে, তাহাদের মধ্যে অনেকে জীবন হারাইয়াছিল। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন গোলা-গুলির সহরদে না যায়।"

একদিন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ব্যাপ্টে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, রণস্থল হইতে আহতগণকে তৎক্ষণাৎ সরাইতে পারিলে, বড়ই উপকার করা হয়। তখনও যুদ্ধ চলিতেছে—উভয় পক্ষের গোলা-গুলি সন্ সন্ ছুটিতেছে! ভারতীয় সেবকগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর ইঙ্গিতে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, অসহায় আহতগণের উদ্ধারার্থ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। এ দিন অনেক ভারতীয় সেবক রণাঙ্গণে প্রাণ হারাইয়াছিল।

ইহারাই একদিন অশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির ভিতর হইতে স্বনামধন্য ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিয়াছিল।

প্রকৃত গুণের আদর করিতে ইংরাজ কোন দিন পশ্চাদ্পদ নহেন। সরকারী রিপোর্টে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রশংসা শতমুখে নিনাদিত হইল; কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সামরিক পদক দানে সম্মানিত করিলেন। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে ভারতীয়গণের প্রতি কতকটা প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

রাজ-সন্মান লাভ।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বুয়র্ সমর মিটিল। বুয়রগণ পরাভূত এবং ট্রান্সভাল তথা অরেঞ্জ রাজ্য ইংরাজের করতলগত হইল।

ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের প্রতি অত্যাচার, যুদ্ধের অন্যতম হেতু বলিয়া বৃটিশ গভরমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং নূতন শাসন-ব্যবস্থায় দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা নিশ্চয়ই ঘুচিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীপুত্রাদিসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, স্থির করিলেন।

বিদায়-সম্বর্দ্ধনা।

নেটালের গুণমুগ্ধ ভারতীয়গণ বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে তাঁহাকে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ও সন্তানগণকে কয়েকখানি মূল্যবান সুবর্ণপাত্র ও রত্নালঙ্কার উপহার দিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহা নিজের জন্য গ্রহণ না করিয়া আবশ্যককালে জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহারার্থ বিনীতভাবে প্রত্যর্পণ করিলেন। এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ মহাপ্রাণ গান্ধীর জীবনে পদে পদে প্রতিভাত। তিনি বোম্বায়ে আসিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত চিত্তে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে যে অচিরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার ফিরিতে হইবে, এরূপ কল্পনা তৎকালে তিনি মনে স্থান দেন নাই।

ট্রান্সভালে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু অভাগ্য ভারতীয়গণের অদৃষ্ট বিন্দুমাত্র সুপ্রসন্ন হইল না; বরং নির্যাতন বাড়িল। ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল! এমন কি যাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ট্রান্সভালে অবস্থান করিতেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় বৃটিশ বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ছাড়পত্র ব্যতীত ট্রান্সভালে পুনরায় প্রবেশ

করিতে দেওয়া হইল না। ছাড়পত্রের উপরও খুব কড়াকড়ি পড়িয়া গেল। ফলে, ট্রান্সভালের প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় ব্যবসাদারগণ নিতান্ত বিপন্ন হইলেন ; কারণ তথায় তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বড় সামান্য নহে। কোন কোন ব্যবসাদার নিজের জন্য ছাড়পত্র পাইলেও, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুত্রপরিজন ও কর্ম্মচারিবর্গকে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবসাদারেরা যে কোন স্থানে কারবার চালাইতে পারিতেন ; নূতন শাসনে সে পথ প্রায় রুদ্ধ হইল। এমন কি ভারতীয় ফেরিওয়ালাগণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে স্বেচ্ছানুযায়ী যে কোন রাজ-পথে পরিভ্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আইনের ফাঁদ বাড়িল। ইহা ছাড়া ভারতীয়গণের প্রতিকূলে এই কয়টী বিশেষ বিধান ট্রান্সভালে প্রচলিত ছিল,—(ক) নাগরিকের অধিকার লাভে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। (খ) নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে তাঁহারা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিতেন না। (গ) স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে তাঁহাদিগকে সহরের একাংশে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইত। (ঘ) প্রত্যেক আগন্তুক ব্যবসায়ী বা স্বাধীনজীবীর নিকট গভরমেণ্ট তিন পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ টাকা) সেলামী আদায় করিতেন ! নূতন শাসন-ব্যবস্থায় বর্ণ-বিদ্বেষও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

ট্রান্সভালে নূতন বিপদ।

ট্রান্সভালের নবীন গভরমেণ্ট ভারতীয়গণের সংখ্যা-সমৃদ্ধি

দমনের নিমিত্ত 'এসিয়াটিক্ ডিপার্টমেণ্ট' নামে এক নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে, আইনের নাগপাশে পড়িয়া তত্রত্য ভারতীয়গণ 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িলেন। এ আর্ত্তনাদ শ্রীযুক্ত গান্ধীর কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল না।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের ভারতীয়গণের প্রেরিত একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাইলেন।

পুনর্যাত্রা।

টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই যে, উপনিবেশ-সচিব মিঃ চেম্বারলেন শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা স্বয়ং পরিদর্শনের নিমিত্ত আসিতেছেন; অতএব ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগ তাঁহাকে জ্ঞাপনার্থ শ্রীযুক্ত গান্ধীর তথায় উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। বিপন্নের আহ্বানে ব্যথিতের প্রাণ টলিল—শ্রীযুক্ত গান্ধী তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইলেন!

নেটালে পৌঁছিয়া তিনি তত্রত্য ভারতীয়গণের পক্ষে এক 'ডেপুটেশন্' (প্রতিনিধি-মণ্ডলী) উপনিবেশ-সচিবের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। নেটালের সরকারী কর্ম্মচারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুণের পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ডেপুটেশনে'র মুখ-পাত্ররূপে উপনিবেশ-সচিবকে ভারতীয়গণের অভাব-অভি-যোগের কথা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ট্রান্সভালেও ঐরূপ আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু সেখানকার সরকারী

কর্ম্মচারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে 'ডেপুটেশনে'র সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। ট্রান্সভালের ভারতীয়গণ তখন নিরুপায়; তাঁহার 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু তাহা হইতে দিলেন না; তিনি নিজে যাইতে না পারিলেও, অন্যান্য প্রতিনিধিগণকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া উপনিবেশ-সচিব সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণ আপনাদের অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটসঙ্কুল হইতেছে বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আর্ত্তবন্ধু গান্ধী তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী এবার প্রিটোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে এটর্ণিরূপে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্ঘশক্তি।

শ্রীযুক্ত গান্ধী জানিতেন,—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্ত-দন্তিনঃ।' ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণ প্রবল রাজশক্তির তুলনায় তৃণতুল্য তুচ্ছ হইলেও, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, এই আশায় শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ঐ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত গান্ধীর উপর সভার সম্পাদকতা ও আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দানের ভার পড়িল।

শুধু সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্যোগী গান্ধী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভারতীয়গণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার করা, ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের বিবরণ তাহাদের ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের সম্মুখে প্রচার করা এবং ভারতীয়গণকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেওয়া, কিরূপে হইতে পারে? এজন্য সংবাদ-পত্রের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য্য। ফলে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' (ভারতীয় অভিমত) নামক সংবাদ-পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। পত্রিকাখানি প্রথমে ইংরাজী, গুজরাটী, হিন্দী ও তামিল, এই চারিটী ভাষায় মুদ্রিত হইতে লাগিল; শেষে কিন্তু নানা কারণে হিন্দী ও তামিল ভাষা পরিত্যক্ত হয়। এই সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম বৎসর ত্রিশ হাজার টাকা ঐজন্য নিজের তহবিল হইতে প্রদান করেন। শুধু টাকায় নহে, তাঁহার লিখিত বহু সুচিন্তিত ও সারবান প্রবন্ধে নূতন সংবাদ-পত্রের গৌরব শত্রু-মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আর্থিক লাভ কিছু না হইলেও, এই সংবাদ-পত্রখানি পরে ভারতীয়গণের পক্ষে প্রধান অস্ত্ররূপে প্রতিপক্ষের কূট কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল।

সংবাদ-পত্র।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহানেস্‌বার্গে ভারতীয় অধিবাসিগণের ভিতর ভীষণ প্লেগরোগ দেখা দিল। স্থানীয় মিউনিসিপাল

কর্তৃপক্ষ প্রথমে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই; অথবা অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই বিপদ বার্ত্তা শুনিয়াই জোহানেস্‌বার্গে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে মহামারী আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাঁহাদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একদিন অহোরাত্রের মধ্যে একুশ জন ভারতীয় প্রাণত্যাগ করিল। তখন আর মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া বৃথা কালক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত নহে স্থির করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী ৪।৫ জন সঙ্গীসহ একখানি ভারতীয় দোকানের দ্বার উন্মোচন করত রোগিগণকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। সেই স্থানে রোগিগণের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার সম্যক ব্যবস্থা হইল; শ্রীযুক্ত গান্ধী সঙ্গীদলসহ স্বয়ং রোগিপরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। এমন সৎসাহস ও নির্ভীকতা না থাকিলে কি কেহ নেতা হইতে পারে? পরদিন প্রাতে মিউনিসিপাল কর্ত্তাদের চক্ষু ফুটিল, তাঁহারা প্লেগ প্রতিষেধের যথোপযুক্ত আয়োজনে মন দিলেন। এই দুর্ঘটনায় শতাধিক ভারতবাসী শমন সদনে প্রেরিত হইল।

প্লেগে পরিচর্য্যা।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত গান্ধী ডার্ব্বাণ বন্দর হইতে বার মাইল দূরে শ্যাম শস্পশোভিত নিভৃত পল্লীভূমে 'ফিনিক্স সেট্‌লমেণ্ট্' নামক পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটী সহরের ধূলি কোলাহল ও আবর্জ্জনা বর্জ্জিত; পর্ব্বত পার্শ্বে, রেল ষ্টেশন হইতে

মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। উহার চারিদিকে উর্ব্বর ইক্ষুক্ষেত্র। পল্লী-জননীর স্নেহাঞ্চলে শান্ত শীতল বিটপি-ছায়ায়, অভিনব সমাজবদ্ধ হইয়া কর্ম্মময় জীবন যাপনের কল্পনা, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক রাস্কিনের লিখিত "Unto this Last" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত গান্ধী পাঠ করেন। কল্পনাটী তাঁহার এতই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল যে, তিনি অবিলম্বে ফিনিক্স গ্রামে এক সরহদ্দে তিন শত বিঘা ভূমি নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া, কয়েকটী বিশিষ্ট ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ পরিবারকে তথায় বাস করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তাঁহার নিজের ও 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' পত্রের গৃহ তথায় নির্ম্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে স্থানটী নূতন বাসিন্দায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা নিম্নলিখিত সর্ত্তে নূতন স্থানে বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা।

(১) মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদ-পত্র ও ভূসম্পত্তির উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। (২) প্রত্যেক বাসিন্দা দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। (৩) কেহ মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকার অধিক গ্রহণ করিবেন না। [বলা বাহুল্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এদেশের তুলনায় অনেক মহার্ঘ। (৪) যৌথ সম্পত্তিতে লাভ হইলে তাহার অংশ সকলে সমানভাবে পাইবেন। (৫) নূতন বাসিন্দার বাসগৃহ প্রথমতঃ সাধারণ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইবে। তিনি যতদিনে পারেন, কিস্তিবন্দী করিয়া উহা শোধ দিবেন। ঐ টাকার সুদ লাগিবে না। (৬ প্রত্যেক বাসিন্দা ছয় বিঘা জমি নিজ চাষাবাদের জন্য পাইবেন। উহার দরুণ দেয় টাকাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পরিশোধ করা

চলিবে। (৭) বাসিন্দাগণ সাধারণের হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না ; তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন।

কৃচ্ছ্র-সাধন।

এই পল্লীবাসে সকলকেই রীতিমত কায়িক শ্রম করিতে হইত। কর্ম্মঠ কৃষকের ন্যায় কেহ মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কেহ লাঙ্গল চালাইতেছেন, কেহ বা কৃষিজাত শস্যরাশি গৃহে তুলিতে ব্যস্ত ; অথচ তাঁহারা অশিক্ষিত 'চাষা' নহেন—বরং অনেকে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। পাঠক, মনে করুন সে কেমন আনন্দময় স্থান! শ্রীযুক্ত গান্ধী এইস্থানে স্ত্রীপুত্রাদিসহ কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন আরম্ভ করিলেন। বিলাসিতা দূরে পলাইল। আহার—নামমাত্র, পরিধেয়—অতি স্থূল বসন, শয্যা—কম্বলাসন, আবাস—সামান্য কুটীর! তদুপরি অবিরাম পরিশ্রম! এইভাবে কিছুদিন অভ্যাসের ফলে অদ্ভুতকর্ম্মা গান্ধী কঠোর কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তখন কে জানিত, তাঁহার সংযম-শুষ্ক শরীর ভবিষ্যৎ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে গঠিত হইতেছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। নেটালে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। এ সংঘর্ষে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজের নেতৃত্বে বিশজন ভারতীয় সেবক সহ ডুলি-বাহকরূপে, আহতগণকে হাঁসপাতালে বহন করিবেন বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাঁহারা অশ্বারোহী সৈন্যদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া পদব্রজে রওনা হইলেন। হাতে অস্ত্র নাই, চারিদিকে অসভ্য শত্রুপক্ষের আস্তানা—কখন কোন্ বৃক্ষান্তরাল হইতে বিষাক্ত তীর আসিয়া শরীরে বিঁধিবে বলা যায় না; এইরূপ অবস্থায় কোন কোন দিন ত্রিশ মাইল কুচ্ করা কি সহজ সাধ্য! তাঁহারা সহস্র বিপদ শিরে লইয়া, প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিয়া, আহত জুলুগণের শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন। ভারতীয় সেবকদলের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতার বিবরণ সরকারী রিপোর্টে ফুটিয়া উঠিল; কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ করিলেন।

জুলু বিদ্রোহ।

অতঃপর ট্রান্সভালের নূতন গভরমেণ্ট এসিয়াবাসিগণের অপমানকর এক অভিনব আইনের (Ordinance) খসড়া প্রস্তুত করিলেন। আইনের মর্ম্ম এই যে, এসিয়াবাসিগণকে সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে এবং নামের পার্শ্বে স্ব স্ব টিপ-সহি দিতে হইবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী পুরুষ, কেহই রেহাই পাইবেন না—সকলকেই অঙ্গুষ্ঠাগ্র মসীলিপ্ত করিয়া কয়েদীদের মত সরকারী খাতায় কৃষ্ণাঙ্গের কলঙ্ক-চিহ্ন স্বহস্তে আঁকিয়া দিতে হইবে! ট্রান্সভালে আগন্তুক ভারতীয়দলের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করাই আইন-কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য; পরন্তু প্রস্তাবিত আইনে ভারতীয়-

আবার আইনের নাগপাশ।

গণের প্রতি এমনই একটা বিজাতীয় ঘৃণার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল যে, তাহা নীরবে সহ্য করা কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, আজ ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের ললাটে যে দাসত্বের ছাপ চিরাঙ্কিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা যদি একবার নির্ব্বিবাদে মাথা পাতিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যেও, এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি ঐরূপ দাসাসাজ্য বর্ব্বর ব্যবস্থা হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। অতএব জাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়িতেই হইবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী ট্রান্সভালের প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীসহ প্রথমে প্রস্তাবিত আইনের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণের দর্শন-প্রার্থী হইলেন। তাঁহাদের সহিত বহু বিচার-বিতর্ক ও আলোচন-আন্দোলনের পর স্থির হইল যে, ভারতীয় রমণীগণ রেজিষ্ট্রী আইনের আমলে আসিবেন না। সম্ভাবিত নিগ্রহের কতকটা রেহাই হইল বটে; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী এইখানেই নিরস্ত থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি সঙ্কল্পিত বিধানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে, প্রকাশ্য বক্তৃতায়, সাধারণ কথাবার্ত্তায়, ভারতীয়গণ রেজিষ্ট্রী আইনের প্রতিকূলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা কাণে তুলিলেন না।

প্রস্তাবিত আইনের ধারাগুলি একরূপ বিনালোচনায় ট্রান্স-ভালের ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া গেল।

যে দিন উল্লিখিত আইনটী ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হয়, সেই দিনই সহরের অপরাংশে 'এম্পায়ার' থিয়েটারে ভারতীয়গণ এক বিরাট বৈঠকে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই নাম রেজিষ্ট্রী করিবেন না—টিপ-সহি দিবেন না; ইহার ফলে যে কোন নির্যাতন আসে আসুক, নীরবে সহ্য করিবেন। ইহারই নাম—'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' (Passive Resistance)। প্রতিরোধিগণ লাঠিসোটা ধরিবেন না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবেন না; শুধু সুদৃঢ় মানসিক বলে সহস্র নিপীড়ন সহ্য করিয়াও সঙ্কল্প অটুট রাখিবেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টম্বর মহাত্মা গান্ধী ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ইহাই ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে অক্ষয় কবচরূপে রক্ষা করিয়াছিল।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ।

নূতন আইনে সম্রাটের সম্মতি যাহাতে প্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য বিলাতে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধী কয়েকজন কর্ম্মীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ট্রান্সভালের দায়িত্ব-মূলক গভরমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছিল। বিলাতের 'কর্ত্তৃপক্ষ' শ্রীযুক্ত গান্ধীর উত্থাপিত সমস্যার মীমাংসা ভার

বিলাতে আন্দোলন।

ট্রান্সভালের ভাবী গভরমেণ্ট করিবেন বলিয়া, প্রস্তাবিত আইনে সম্রাটের সম্মতি রদ্ করিয়া দিলেন।

এই সুযোগে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থ রক্ষার্থ লণ্ডনে এক কমিটী প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রাজের

লণ্ডনে কমিটী।

ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড এম্‌থিল * কমিটীর প্রেসিডেণ্ট এবং স্যার মঞ্চেরজী ভবনগরী উহার কার্য্যকরী (Executive) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

এত আয়োজন সত্ত্বেও কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। ট্রান্সভালে নূতন শাসন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রস্তাবিত আইনটী পুনরায় পরিগৃহীত হইয়া সম্রাটের সম্মতি লাভ করিল।

এখন ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণ কি করিবেন? তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আইন অমান্য করিলে জেলে যাইতে হইবে, অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে—হয় ত বা কর্ত্তৃপক্ষের কোপানলে পড়িয়া পথের ভিখারী সাজিতে হইবে। জলে বাস করিয়া কে কুমীরের সহিত বাদ সাধিতে সক্ষম?

এদিকে শ্রীযুক্ত গান্ধীর জ্বলন্ত বক্তৃতা, অশ্রান্ত উৎসাহবাণী ভাবোন্মাদিনী লেখনী, ভারতীয়গণের হৃদয়ে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চার করিতেছিল। তিনি স্বজাতির গৌরবনিশান সমুন্নত

* ইনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জনের অনুপস্থিতি কালে ৩০শে এপ্রিল হইতে ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাখিবার জন্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভারতীয়গণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দক্ষিণ আফ্রিকার

তুমুল আন্দোলন।

ভারতীয় সমাজ-যন্ত্র এক গভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল; সকলে সমস্বরে কহিল,—'আমরা মরিব, তবুও আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিব না।' দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী চীনাগণ এশিয়াবাসী বলিয়া নূতন আইনের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল; তাহারাও এই আন্দোলনে যোগ দিল।

সরকারী রেজিষ্ট্রারেরা ভারতীয়গণের নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রায় পনর আনা ভারতবাসী কিছুতেই নাম লিখাইলেন না—টিপ-সহি দিলেন না। তখন তাঁহাদিগকে আইনের বলে দলে দলে জেলে পাঠান হইতে লাগিল। ভারতীয় কয়েদীদলে কারাগার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, বালক বৃদ্ধ, সকল শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলে সানন্দে স্ফীতবক্ষে কারাঙ্গনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কারাগার আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্ত গান্ধীও আইন অমান্যের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। তিনি আদালতে

কারাগারে গান্ধী।

বিচারকের সমক্ষে ভারতীয়গণের সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"আমিই তাঁহাদিগকে 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ'-নীতি শিখাইয়াছি, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি আমাকে দেওয়া

হউক।” ইতিপূর্ব্বেই প্রিটোরিয়ায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর কয়েক-জন সহকর্ম্মী ছয়মাস সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহাই আইনের চরম দণ্ড। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিচারক তাঁহাকে মাত্র দুই মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয়গণের অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হই-লেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হাঙ্গামা সহজেই মিটিবে—আইনের চাপে ভারতীয়গণ সায়েস্তা হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবল ভাবের বন্যায় ভারতীয় সমাজ উথলিয়া উঠিল। তখন কর্ত্তারা বিপদ গণিলেন। মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ‘ট্রান্সভাল লিডার’ পত্রের সম্পাদক মিঃ কার্টরাইটের মারফতে শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গকে জানান হইল যে, আপাততঃ তিনমাস কাল নূতন আইনের প্রয়োগ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় নাম লিখাইতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আইনটী পরে একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। গভরমেণ্টের পক্ষে জেনা-রেল স্মাট্‌স স্বয়ং সরকারী কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, ভারতীয়গণ যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন, তাহা হইলে আইনটী নিশ্চয়ই বাতিল করা হইবে। জেনারেল স্মাট্‌সের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সরলহৃদয় গান্ধী প্রস্তাবিত সর্ত্তে স্বীকৃত

মিটমাটের প্রস্তাব।

হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মিগণের মধ্যে কয়েকজন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিল। তাহারা ভাবিল, এ কাপুরুষতা কেন? কেহ কেহ তাঁহাকে সরকারী গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধী সকলকে স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, নিজে পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হইলেন।

প্রহারে প্রাণ-সংশয়।

রেজিষ্ট্রী আফিসের পথে এক অবস্থানভিজ্ঞ নির্ভীক পাঠান, তাঁহাকে বিভীষণ ভ্রমে, গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত করিল। প্রহার-কাতর গান্ধীর সংজ্ঞাহীন দেহযষ্টি রাজপথে লুঠাইয়া পড়িল। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলে অজস্র রক্তধারা ছুটিতেছিল ; কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া রেভারেণ্ড মিঃ জে-জে ডোকের গৃহে তুলিলেন। ডোক সাহেব শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুণ-মুগ্ধ বন্ধু। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনাইলেন ; কিন্তু ক্ষতস্থান সেলাই হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত গান্ধী নাম রেজিষ্ট্রীর দরখাস্তে সহি করিবেন বলিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখনও শোণিতধারা ছুটিতেছে, ক্ষতস্থানে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে ; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। অনেকে তখন তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ নাম রেজিষ্ট্রী না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

প্রহারের ফলে শ্রীযুক্ত গান্ধীর অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন

হইয়া উঠিল যে, অনেকে তাঁহার জীবনাশা ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে রেভারেণ্ড মিঃ ডোকের সহৃদয়া পত্নী, জননীর ন্যায় অহোরাত্র রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহধারা ঢালিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে শ্রীযুক্ত গান্ধী উত্তরোত্তর নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

পাছে ভারতীয়গণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত দুর্ঘটনার দিন অপরাহ্নে রোগ যন্ত্রণায় কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাল্লিখিত ইস্তাহার প্রচার করেন,—

"প্রহারকারিগণ জানিত না যে, তাহারা কি করিতেছে। তাহাদের মনে হইয়াছিল, আমিই অন্যায় করিতেছি। ফলে, প্রতিকারের যে এক-মাত্র উপায় তাহারা জ্ঞাত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কিছু করা না হয়—ইহাই আমার অনুরোধ।

"হিন্দুগণ হয়ত এইজন্য ক্ষুব্ধ হইতে পারেন যে, একজন বা কয়েকজন মুসলমান আমাকে আঘাত করিয়াছে। এ ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিধাতার চক্ষে এবং জগৎবাসীর সমক্ষে দোষী হইবেন। আজ যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহা যেন হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে জুড়িয়া দেয়—ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। শ্রীভগবান আমার কামনা পূর্ণ করুন।

"নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় থাকিবে না। সংযমশীল ভারতীয়গণ ঐ নীতি অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না; তাঁহারা স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিলে নূতন আইন পরিত্যক্ত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি



শ্রীমতী গান্ধী



মিসেস ডোক

প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে কর্ত্তব্যজ্ঞানে উপনিবেশিক গভরমেণ্টের মতানুবর্ত্তী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।”

মহাপ্রাণ গান্ধীর এই আহ্বান-বাণী ব্যর্থ হইল না। ভারতীয়গণ দলে দলে সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন।

এইবার কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসিল; কিন্তু তাঁহারা পাকা আইন বর্জ্জন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের পণভঙ্গ।

শ্রীযুক্ত গান্ধী লাট দরবারে বহুবার গতায়াত করিলেন—জেনারেল স্মাট্‌সের প্রতিশ্রুতির কথা তুলিয়া, অনেক উপরোধ-অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। শেষে পুনরায় ‘নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ’ পন্থা অবলম্বন করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। যাঁহারা নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া ‘রেজিষ্ট্রেশন্ সার্টিফিকেট্’ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রয়োজন স্থলে সেই সার্টিফিকেট্ প্রদর্শন করিতে এবং টিপ-সহি দিতে হইবে, ইহাই আইনের বিধান। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণ প্রাণান্তেও সার্টিফিকেট দেখাইবেন না, বা টিপ-সহি দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলেন।

বিরোধের দাবানল আবার বিকট তাণ্ডবে জ্বলিয়া উঠিল। বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে ভারতীয়গণ আইন অমান্যের অপরাধে দলে দলে কঠোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেহ পতিপ্রাণা পত্নীকে

অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধা জননীর চক্ষে শোকের দরবিগলিত ধারা ছুটাইয়া, কেহ বা আশ্রয়হীন সন্তানসন্ততিগুলিকে ঘোর বিপদসাগরে ভাসাইয়া জাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য, অকাতরে কারাদণ্ড শির পাতিয়া লইলেন। কারাগার যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। অতি দীন দরিদ্র হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলেই সমান নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর! কেহ কেহ বা দৈনন্দিন পরিশ্রমলব্ধ অর্থে অতিকষ্টে নিজের উদরান্ন সংস্থান করিত—স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইত। পাঠক, এই শ্রেণীর দুঃস্থ শ্রমিকগণের অবস্থা একবার মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করুন। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, অনশনক্লিষ্ট শরীরে কুকুর-বিড়ালের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলে কাহার না চোখ ফাটিয়া জল আইসে? অন্যদিকে বড় বড় ভারতীয় সওদাগরেরা শুধু সত্যরক্ষার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হইলেন! ইহাও কি কম মানসিক বলের পরিচায়ক?

ট্রান্সভালবাসী মোট নয় হাজার ভারতীয় পুরুষের মধ্যে দুই হাজার সাত শত জন এই ব্যাপারে অশেষ কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদীদের জন্য যতদূর সম্ভব জঘন্য রসদ ব্যবস্থা করিলেন

কিন্তু তাহাতে আইন অমান্যকারিগণের জেদ্ বাড়িল বই কমিল না।

এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মহিলাগণ রাজপুত রমণীর ন্যায় স্বামী-পুত্র-সহোদরগণকে বীরোচিত কঠোর কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উগ্র উদ্দীপনায় সত্যাশ্রয়ী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মের মহান্ আদর্শ সকলের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধী এবার আদালতে অভিযুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এজাহার দিলেন,—

"দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি সেই একই অপরাধে দ্বিতীয় বার বিচারালয়ে নীত হইয়াছি। আমি বেশ জানি যে, আমার অপরাধ ইচ্ছাকৃত এবং বিশেষ বিবেচনা সহকারে সম্পাদিত। অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমি আমার চরিত্র সততার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি যে, আমার স্বদেশবাসিগণ যাহাই করুন বা যাহাই ভাবুন, আমি সাম্রাজ্যের জনৈক নাগরিকরূপে—বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-রূপে—যতদিন গভরমেণ্ট একভাগ নাগরিকের (ভারতীয়গণের) সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে বিরত থাকিবেন, ততদিন পুনঃ পুনঃ আইন ভঙ্গ করিবই করিব। আমার আচরণ যদি নিন্দার্হ হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে, এসিয়াবাসীর বিরুদ্ধতা ব্যাপারে আমিই প্রধান উদ্যোগী; অতএব আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া হউক।"

বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দুইমাস সশ্রম কারাবাসে পাঠাইলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহাকে জোহানেস্‌বার্গের

রাজপথে সামান্য চোর-ডাকাতের মত কয়েদী বেশে 'ওয়ার্ডারে'র সঙ্গে পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। দৃঢ়ব্রত গান্ধী এ অপমান গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি মুক্তি লাভ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশাকাহিনী ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচার করিবার জন্য, দুইদল 'ডেপুটেশন' প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ডেপুটেশনের প্রতিনিধিগণ রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের অপরাধে কারাগারে আটক রাখিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী ইহাতেও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি স্বয়ং কয়েকটী মাত্র সঙ্গীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; অন্যদিকে 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' পত্রের সম্পাদক মিঃ এইচ এস-এল পোলাক্ * ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন।

আবার কারাবাস :

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। লণ্ডনের 'টাইমস্' প্রভৃতি সংবাদ-পত্র বরাবরই দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। এবার ট্রান্সভালের মন্ত্রিবর্গও এই সময়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ উভয়দলের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু জেনারেল স্মাট্স কিছুতেই নরম হইলেন না। শেষে শ্রীযুক্ত গান্ধী দক্ষিণ-

* এই মহাপ্রাণ ইংরাজ মনীষী ট্রান্সভালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সমব্যবসায়ী অর্থাৎ এটর্ণি ছিলেন।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের স্বপক্ষে আন্দোলন, বিলাতে জাগ্রত রাখিবার এবং ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিবার ভার একদল 'ভলান্টিয়ারে'র উপর দিয়া ট্রান্সভালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের বহু বিজ্ঞ রাজনীতিক দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে মিঃ পোলাক্ ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দক্ষিণ-আফ্রিকার করুণ কাহিনী এদেশে অনেকটা রাষ্ট্র হইয়াছিল।

নিরুপদ্রব প্রতি-রোধের জয়।

তদুপরি তাঁহার জ্বলন্ত বক্তৃতায় ভারতের প্রধান প্রধান সহরে প্রবাসী স্বদেশীয়গণের জন্য সহানুভূতির স্রোত ছুটিল। তাহারা বিদেশে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াও যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। স্যার রতন টাটা প্রমুখ দয়ার্দ্র ধনকুবেরগণ অর্থ-কোষ উন্মুক্ত করিলেন। কোন কোন সদাশয় সামন্ত-নৃপতি সাহায্য পাঠাইয়া আন্দোলনকারিগণের কার্য্যে উৎসাহ দিলেন। ফলে, দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখলে নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের বিরুদ্ধে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোরতর আন্দোলন তুলিলেন। তাঁহার মনীষাপূর্ণ অকাট্য যুক্তি পরম্পরায় বড়লাটের আসন টলিল, তিনি নেটালে চুক্তিবদ্ধ

শ্রমিক প্রেরণ ব্যবস্থা একেবারে রদ্ করিয়া দিলেন। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের জয় এতদিনে ঘোষিত হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজেও একদল ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রাণ মনীষী ভারতীয়গণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা স্যার উইলিয়ম্ হস্‌কেনের নেতৃত্বে 'হস্‌কেন কমিটি' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া স্বজাতীয়গণের অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারমূলক অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যদিকে সঙ্কীর্ণচিত্ত শ্বেতাঙ্গগণ দুর্ব্বল ভারতীয়দলকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

নির্ব্বাসন ব্যবস্থা।

কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক কলেরা রোগীর উৎকট ভেদ-বমন দমন করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে এমন সুতীব্র ধারক ঔষধ দিয়া বসে যে, তাহার ফলে রোগীর উদরাধ্মান হইয়া প্রাণান্ত ঘটে। এবার ট্রান্সভাল গভরমেণ্টেও সেইরূপ একটী হাতুড়ে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে এক আইন পাশ করিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন। এই আইন অনুসারে তাঁহারা কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাকে নেটাল-সীমান্ত পার করিয়া দিলেন; কিন্তু নেতৃগণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন,—'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি!' ইহাতেও কিন্তু তাঁহারা দমিলেন না, এক সঙ্গে চৌষট্টি

জন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতবর্ষে চালান দিলেন। ভারতে আসিয়াই ভারতীয়গণ স্বদেশবাসীর সাগ্রহ উৎসাহে ও স্বেচ্ছাদত্ত অর্থানুকূল্যে আবার দ্বিগুণ সাহসে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইলেন। ট্রান্সভাল-কর্ত্তৃপক্ষের জেদ্ বাড়িয়া গেল; তাঁহারা স্থির করিলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তন-কারিগণকে আর জাহাজ হইতে কিছুতেই নামিতে দেওয়া হইবে না। নির্ব্বাসিতগণ নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ স্বামী নামে জনৈক অসমসাহসিক যুবক তীরে উঠিতে সচেষ্ট হইলে সরকারী লোকেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বেচারা বন্দর হইতে বন্দরান্তরে বিতাড়িত হইয়া শেষে পর্ত্তুগীজ এলাকায় ডেলাগোয়া উপসাগরে সলিল-সমাধি লাভ করিল। এই নির্ভীক যুবকের শোচনীয় মৃত্যুর ফলে ভারতীয় সমাজে দারুণ প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভারত গভরমেণ্ট এদেশবাসীর হৃদয়ে গভীর চাঞ্চল্য অনুভব করিয়া, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে ট্রান্সভাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সন্ধির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বিলাত গভরমেণ্টের অনুরোধে ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের নির্ব্বাসন-ব্যবস্থা রহিত হইল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কেপ-কলোনি, নেটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্য সম্মিলিত হইয়া "ইউনিয়ন্ অব্ সাউথ্ আফ্রিকা" বা দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলন, এই নূতন নাম গ্রহণ করিয়া-

ছিল। যৌথ গভরমেণ্টের বিচার বিভাগীয় কেন্দ্র প্রিটোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারত গভরমেণ্টের অনুরোধে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তত্রত্য ভারতীয়গণের আপত্তিকর মূল আইনটী বর্জ্জন করিয়া, উহার পরিবর্ত্তে এমন বিধান প্রবর্ত্তন করা হউক, যাহাতে জাতি-বিদ্বেষের গন্ধ থাকিবে না; পরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় নবাগত ভারতীয়দলের প্রবেশ-পথ প্রায় রুদ্ধ হইলেও, প্রতিবৎসর অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ভারতবাসী যেন তথায় যাইতে পারেন। বিলাত গভরমেণ্ট ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে উপনিবেশকারিগণ যে সকল সুবিধা এযাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বিলাত গভরমেণ্টের চাপে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট মূল আইন বর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নূতন আইনের খসড়া, যাহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গড়িয়া তুলিলেন তাহাতে জাতি-বৈষম্য নিরাকৃত হইল না; অধিকন্তু সমুদ্রোপকূলবাসী ভারতীয়গণের অনেকগুলি সুবিধাজনক অধিকার কাড়িয়া লইবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইল। ভারতীয়গণ উল্লিখিত বিলে কোন মতে সম্মতি দিতে পারিলেন না, কাজেই বিলটী বাতিল হইয়া গেল।

এই সময়ে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের সহিত ভারতীয় নেতৃ-

গণের মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। গভরমেণ্ট জানাইলেন যে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নূতন বিল পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত 'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' যেন বন্ধ রাখা হয়। ভারতীয়গণ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গভরমেণ্ট যে বিল পেশ করিলেন, তাহাও ভারতীয়গণের বিশেষ অনুকূল নহে; কাজেই, আবার সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হইল। শেষে ভারতীয়গণ আর এক বৎসর কাল মিটমাটের আশায় অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর মহামতি গোখলে কেপ-টাউনে পৌঁছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মবীর গান্ধীর আহ্বানে, ভারত গভরমেণ্টের তথা বিলাত গভরমেণ্টের সম্মতিক্রমে, তিন সপ্তাহ কাল সারা দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান সহরে ভারতীয়গণের ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মতামত জানিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই তাঁহাকে প্রভূত সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। নেটালের সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ডার্ব্বাণে বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অভিনন্দন-বক্তৃতায় ভারতীয়গণের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রীতিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা মুণ্ডকর বর্জ্জনের পক্ষে প্রচুর আশ্বাস দিলেন। পরে তত্রত্য চেম্বার-অব-কমার্সের

গোখলের মধ্যস্থতা।

বৈঠকেও ঐরূপ সহানুভূতির সুবাতাস বহিতে দেখিয়া, শ্রীযুক্ত গোখলে ভারতীয়গণকে জানাইলেন যে, নেটালে মুণ্ডকর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। তিনি প্রিটোরিয়ায় 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিটমাটের প্রতিশ্রুতি পাইলেন; এমন কি, নেটালে মুণ্ডকর রদ্ করিবেন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গীকার করিলেন। মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আশার উজ্জ্বল আভাসে ভারতীয়গণের হৃদয়াকাশ ভরিয়া গেল—তাঁহারা এতদিনের পর পরিত্রাণ পাইবেন ভাবিয়া, হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

উদ্বাহ অসিদ্ধ।

ইতিমধ্যে 'ইউনিয়ন্' আদালতে একটী দেওয়ানি মামলায় বিচারকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতীয়গণের বিবাহ আইন-মতে সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ যে প্রথানুসারে পুরুষেরা একাধিক রমণীর পাণি-পীড়ন করিতে সক্ষম, তাহা অবৈধ। শ্বেতাঙ্গ সমাজে বহু বিবাহ অচল হইলেও হিন্দু-মুসলমানের শাস্ত্রানুসারে উহা দূষণীয় নহে। বিচারকগণ শুধু বহু বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের তাবৎ বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ বলিয়া রায় দিলেন! তবে কি 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের দৃষ্টিতে ভারতীয় রমণীগণ স্বামীর ধর্ম্মপত্নী নহেন? তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা কি আইনের তুলাদণ্ডে অবৈধ সংযোগের ফল বলিয়া সমাজে হেয় হইবেন? হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র পরিণয় ব্যাপারে এমন জ্বালাময় কলঙ্কের প্রলেপ ঢালিয়া

দিতে, ইতিপূর্ব্বে কেহই সাহসী হন নাই। ভারতীয়গণের সমাজিক আচার-ব্যবহারে 'ইউনিয়ন্'' কর্ত্তৃপক্ষের এ হস্তক্ষেপ কেন? উল্লিখিত বিচার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজে সহসা যে ঘোর অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিল, সপ্ত সমুদ্রের জলেও বুঝি তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষ 'ইউনিয়ন্' পার্লামেণ্টে বহুদিন প্রত্যাশিত নূতন বিল পেশ করিলেন। ভারতীয়গণ মুক্তিলাভের যে উচ্চ আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন—মহামতি গোখলে তাঁহাদিগকে যে বুকভরা ভরসা দিয়াছিলেন—তাহার এতটুকুও প্রস্তাবিত বিলে পূরণের সম্ভাবনা দেখা গেল না। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলের যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। নূতন সর্ত্তের মধ্যে কেবল এইটুকু ছিল যে, ভারতীয় রমণীগণ মুণ্ডকর হইতে রেহাই পাইবেন; তবে, তাঁহাদিগকেও প্রতি বৎসর নূতন ছাড়পত্র লইতে হইবে।

ভারতীয়গণ কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে শ্রীযুক্ত গোখলের নিকট তারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুণ্ডকর কি কেবল রমণীগণের সম্বন্ধে রহিত করিবেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন? প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গোখলে জানাইলেন যে, সকলের সম্বন্ধেই উহা নাকচ হইবার কথা ছিল। ভারতীয়গণ প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। বিলটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে 'ইউনিয়ন্'

পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত গান্ধী বৃটিশ দরবারে ও ইংলণ্ডের সজ্জন-সমাজে সকল ব্যাপার জানাইবার জন্য এক 'ডেপুটেশন' পাঠাইলেন।

লর্ড এমথিল শ্রীযুক্ত গোখলের মুখে বিশদ বিবরণ অবগত হইয়া বিলাতে লর্ড সভায় 'ইউনিয়ন্' কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অজুহাতে সুতীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!' ভারতীয়দলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

তখন 'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' পন্থাবলম্বন ব্যতীত ভারতীয়-গণের পক্ষে অপর কোন প্রতিকারোপায় রহিল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা অদম্য উৎ-সাহে পুনরায় 'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' ঘোষণা করিলেন। এবার তাঁহাদের দাবী এই,—

আবার নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ।

(১) মুণ্ডকর রহিত করিতে হইবে। (২) আইন-কানুনে বর্ণ-বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে হইবে। (৩) ভারতীয়গণের বিবাহ আইন-সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। (৪) দক্ষিণ আফ্রিকাজাত ভারতীয়গণকে কেপরাজ্যে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে (৫) ভারতীয়গণের স্বার্থ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত সুমীমাংসা করিতে হইবে।

হাঙ্গামা পাকাপাকি হইবার পূর্ব্বে ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের অন্তর্বিভাগীয় সচিবের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিলেন,—

"নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ঘোষণার পরামর্শ সকলকে দিয়া, আমি যে কি গুরুতর দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইতেছি, তাহা জানি; কিন্তু ঐরূপ পরামর্শ

না দিয়া আমি থাকিতে পারি না, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় উহাই আবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি। উহার ফলে লোকে শিক্ষালাভ করিবে; শেষে ভারতীয়গণ তথা কর্ত্তৃপক্ষ প্রভৃত লাভবান হইবেন। পন্থাটী এই,—এখন যাঁহাদিগকে বার্ষিক তিন পাউণ্ড মুণ্ডকর দিতে হয়, তাঁহারা যাহাতে ঐ কর আর না দেন এবং তজ্জন্য স্বেচ্ছায় রাজদণ্ড সহ্য করিতে প্রস্তুত হন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধসহকারে উৎসাহিত করা হইবে। তা'ছাড়া যাহারা এখন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে নানাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ চুক্তির কাল অতীত হইলে যাহাদিগকে বার্ষিক তিন পাউণ্ড মুণ্ডকর দিতে হইবে, তাহাদিগকেও ঐ কর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইবে। সেদিন বিলাতে লর্ড সভায় লর্ড এমথিল মিঃ গোখলের সম্মতিক্রমে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণের প্রতি আমার পরামর্শ ন্যায়সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। এখনও কি আমি জেনারেল স্মাট্সের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি না যে, তিনি মুণ্ডকর সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করুন?"

পত্রখানি জেনারেল স্মাট্সকে প্রদর্শিত হইলে, তিনি কোন উত্তর দিলেন না—প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকারও করিলেন না।

নারী-শক্তির প্রভাব।

শৈশবে স্নেহময়ী জননীরূপে, যৌবনে অনন্যহৃদয়া সহধর্ম্মিণীরূপে, অন্তিমে বিশ্বপ্রসবিনী জগদ্ধাত্রীরূপে, যে শক্তি মানবকে কঠোর কর্ম্মপথে পরিচালিত করে, সেই গরীয়সী নারীশক্তি আজ বিপন্ন ভারতীয়গণের পুরোভাগে ত্যাগের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিলেন। নেটালের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ভারতীয় পুরমহিলা, পত্নীত্বের দাবী

আইনের চক্ষে অক্ষুণ্ণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য, জেলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। জোহানেস্‌বার্গেও ঐরূপ আর একদল নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী নারীসঙ্ঘ গঠিত হইল।

নেটালের বীরবালাগণ ট্রান্সভালের সীমান্তবর্ত্তী ভক্সরাষ্ট্ পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে পৌঁছিবা-মাত্র অনধিকার প্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া তিন মাস কঠোর কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পাইলেন। ইহাঁরাই কারাতীর্থের প্রথম যাত্রী!

অন্যদিকে জোহানেস্‌বার্গের নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিনীগণ নেটালের উত্তর সীমায় আসিয়া নিউক্যাসলে আড্ডা পাতিলেন। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের কয়লা-খনিসমূহে প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণকে মুণ্ডকর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ: যোগে কাজ ছাড়িবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ধর্ম্মঘটের বিষাণ বাজিয়া উঠিল। নেটালের কয়লা-খনিসমূহে দরিদ্র শ্রমজীবীদল যেন সহসা নূতন প্রাণ পাইল—আবালবৃদ্ধবনিতা কোন অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিতে জাতির কল্যাণ-মন্দিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে ব্যগ্র হইল। কর্ম্ম-কোলাহলময় কয়লা খনিসমূহ একে একে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। আর সে ব্যস্ততা নাই, উদ্দাম কর্ম্ম-প্রবণতা নাই—শ্রমিকদল দলেদলে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল।

কয়লা-খনির স্বত্বাধিকারিগণ বিচলিত হইলেন। তাঁহারা

তাড়াতাড়ি ডার্ব্বাণে এক বৈঠক আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন।

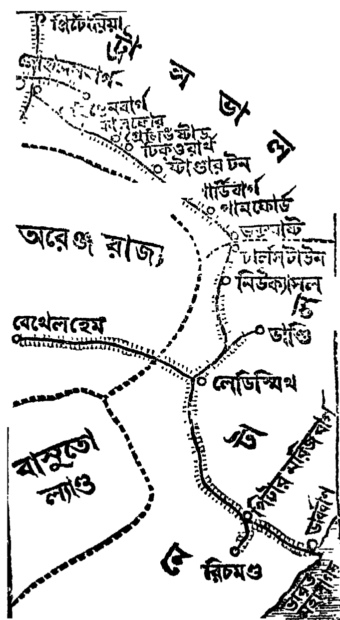
ধর্ম্মঘট।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীযুক্ত গান্ধী সভায় সকলের সমক্ষে ভারতীয়গণের অনুযোগ-কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, খনির স্বত্ত্বাধিকারিগণ মুণ্ডকর বর্জ্জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন জানিয়াই শ্রমিকদল ধর্ম্মঘট করিয়াছে ; অতএব কর্ত্তৃপক্ষের অঙ্গীকার অনুযায়ী মুণ্ডকর রহিত হইলেই, তাহারা আবার স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। সভার অনুষ্ঠাতৃগণ তখন জেনারেল স্মাট্সকে তারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীযুক্ত গান্ধীর কথিত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল কি না ? এবার জেনারেল স্মাট্স ও জেনারেল বোথা প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন ; কিন্তু মিঃ ফিসার (যিনি মিটমাটের কথাবার্ত্তার সময় মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত ছিলেন) তাহা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত গোখলে স্পষ্ট ভাষায় তার পাঠাইলেন যে, মুণ্ডকর বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই প্রদত্ত হইয়াছিল।

যাহা হউক গোলযোগের মীমাংসা কিছুই হইল না। খনির সত্ত্বাধিকারিগণ মিটমাটের আশায় শ্রমিকদলের রসদ প্রথম কয়েক দিন বন্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য গভরমেণ্টের সাহায্যে নানারূপ অবৈধ চাপ দিতে লাগিলেন। শ্রমিকগণ তখন দলে দলে কয়লা-খনি ত্যাগ করিয়া নিউক্যাসল অভিমুখে রওনা হইল।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! রেলে, রাজপথে, পঙ্গপালের মত শত শত বালক যুবক বৃদ্ধ বনিতা আপনাদের যৎসামান্য জিনিস-পত্র স্কন্ধে লইয়া, কেহ কেহ বা দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানগুলিকে বুকের উপর ফেলিয়া, নিউক্যাসলে সমবেত হইতে লাগিল। সে সময়ে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে। গভীর কর্দ্দমাক্ত পথে লট্‌বহর লইয়া যাইতে শ্রমিকগণ দারুণ কষ্টে পড়িল বটে, কিন্তু তাহাদের মনের বল কিছুতেই হ্রাস হইল না। এদিকে মিঃ ক্যালেনব্যাক্ প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মঠ সঙ্গীর সাহায্যে শ্রীযুক্ত গান্ধী শ্রমিক-দলের রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা নিজের হাতে লইলেন। দেখিতে দেখিতে লেডিস্মিথ তথা ডাণ্ডি হইতে নিউক্যাসল পর্য্যন্ত চারিদিকের শ্রমিকদল নিউক্যাসলে আসিয়া পৌঁছিল।

নিউক্যাসল যাত্রা।



ডার্ব্বাণ হইতে প্রিটোরিয়া।

তাহারা প্রত্যেকে এক এক মুষ্টি চাউল, সামান্য পরিমাণ রুটি ও একটু-মাত্র চিনি পাইয়া সকল অভাব ভুলিল। রন্ধনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা দুর্ঘট, বাসস্থান—উন্মুক্ত আকাশতল;

ইহাতেও কিন্তু তাহারা ক্ষুণ্ণ নহে, কারণ কর্ম্মবীর গান্ধী যে তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মত কষ্ট সহ্য করিতেছেন! তিনি রোগীর শুশ্রূষায়, ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য বিতরণে, আশ্রিতগণের যথা সম্ভব কষ্ট নিবারণে একা শত হস্তীর বল ধরিয়াছেন। এমন কর্ম্মকুশল মহাপ্রাণ আদর্শ নেতাকে সম্মুখে দেখিলে, কাহার চিত্ত আত্মত্যাগে উৎসুক না হইয়া থাকিতে পারে?

বিরাট অভিযান।

নিউক্যাসলে শ্রমিকদল সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহাদিগকে লইয়া ট্রান্সভাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ছাড়পত্র ব্যতিরেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলে তাঁহারা অবশ্যই গ্রেপ্তার হইবেন এবং জেলে যাইবেন, ইহাই তাঁহাদের কামনা। জেলে এত কয়েদীকে স্থান দেওয়া সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ এত লোক যে আইনের বিরোধী তাহা বাহাল রাখাও বড় দুষ্কর। কাজেই 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টকে হয় বাধ্য হইয়া আইন বদলাইতে হইবে; নতুবা অশান্তির তিক্তরসে প্রভুত্বের আস্বাদন তাঁহাদের অতৃপ্তিকর হইয়া উঠিবে—ইহাই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণের অভিমত।

৩০শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত গান্ধী শ্রমিকদলসহ নেটালের সীমান্তবর্ত্তী চার্লস্‌টাউন পল্লীতে পৌঁছিলেন। এই অভিযানের প্রাক্‌কালে কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় ধর্ম্মঘটকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রমিকদল নিরুৎসাহ হওয়া দূরে থাক, তাহাদের জেদ্ আরও বাড়িয়া গেল। শত

শত ব্যক্তি চার্লস্‌টাউনে আসিয়া শ্রমিকদলের সহিত যোগ দিল। এখানে মেসার্স বলীভাই এণ্ড মুকদুম নামে ভারতীয় ব্যবসাদারগণ অভিযাত্রীদলের অভাব মোচনে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট হইলেন। ডার্ব্বাণ ও জোহানেস্‌বার্গের ভারতীয় সওদা-গরেরা প্রচুর রসদাদি পাঠাইতে লাগিলেন। ভারত হইতে তারে আশাতীত অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে তখন তিন সহস্র ভারতীয় নরনারী ক্ষুদ্র চার্লস্‌টাউন পল্লীটী যেন ছাইয়া ফেলিল। এই সময়ে 'নেটাল মার্কারি' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আমি ৫ই নভেম্বর তারিখে দুইবার চার্লস্‌টাউন্‌ পরিদর্শন করি। সারা পল্লীখানি যেন ভারতীয় বাজার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সর্ব্বত্রই ভারতীয়গণের জনতা। প্রথমে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই; শেষে শ্রীযুক্ত গান্ধীর উদ্যোগে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ অনেকটা সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একখানি ভারতীয় দোকানের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী প্রাঙ্গনে আমি শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দেখিলাম। ঐ দোকান হইতে তাঁহার অনুচরগণকে চাউল ও তরকারি অংশ মত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছিল। ঐ দিন একজন রুটি-বিক্রেতা ভারতীয়গণকে পাঁচ হাজার রুটি বিক্রয় করিয়াছিল।"

চার্লস্‌টাউন পার হইলেই ট্রান্সভাল রাজ্যের সীমানা। ঐ পল্লীতে পৌঁছিয়াই শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহার সঙ্কল্প তারে কর্ত্তৃ-পক্ষকে জানাইলেন এবং উত্তরের আশায় সাতদিন দলবলসহ ধীরভাবে প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।



মিঃ ক্যালেনব্যাক



মিঃ পোলাক্

বরং শ্রমিকদলের ডেপুটী-প্রটেক্‌টার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণকে কাজে ফিরাইবার জন্য বহু প্রলোভন দেখাইয়াও যখন বিফল-প্রয়াস হইলেন, তখন তাহাদের মধ্যে কয়েকদলকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহারা পরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

৬ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধী, ভারতীয় রমণী ও বালক-বালিকাগণের অধিকাংশ, সহকর্ম্মী মিঃ ক্যালেনব্যাকের অধীনে চার্লস্‌টাউনে রাখিয়া স্বয়ং দুই সহস্র সঙ্গীসহ ট্রান্সভাল রওনা হইলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, গভরমেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন, ভালই ; নচেৎ তাঁহারা ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহানেস্‌বার্গ সহরের সমীপবর্ত্তী ললীগ্রামে টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্র অবধি পদব্রজে গমন করিবেন। চার্লস্‌টাউন হইতে জোহানেস্‌বার্গ প্রায় দুই শত মাইল ব্যবধান ; প্রত্যহ গড়ে পঁচিশ মাইল হাঁটিলে তাঁহারা আটদিনে তথায় পৌঁছিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রয়োজনানুরূপ রসদাদি সঙ্গে লইলেন।

ট্রান্সভাল রাজ্যের প্রবেশমুখে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী কয়েকজন মাত্র সিপাহীসহ সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রীদল তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন যাত্রীশ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে শেষ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখে পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার একটু বিলম্ব ঘটিল। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদল অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা

ট্রান্সভাল প্রবেশ।

উচ্চ কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে ভক্সরাষ্টের রাজপথে ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ প্রহরিগণ বিশাল সাগরে জল বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া গেল।

যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যাগমে পাম্‌ফোর্ড পল্লীতে উপনীত হইল। তত্রত্য ভারতীয়গণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্য পৃথক বাসস্থান ও সুচারু আহার্য্য আয়োজন করিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর গান্ধী সে সমাদর বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন,—'আমার শত শত সহচর যে ভূমিশয্যায় ও সামান্য আহারে সন্তুষ্ট, আমিও তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকিব।' মহাপ্রাণ গান্ধীর এই মহান্ ত্যাগনিষ্ঠা ও কঠোর আত্মসংযম প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহযাত্রীদলের হৃদয়-তটিনী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গৌরবে কুলে কুলে ভরিয়া উঠিল।

'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট আবার একটী ভুল চাল চালিলেন। দৈত্যসম্রাট হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে হরিনাম বন্ধ করিবার জন্য যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 'ইউনিয়ন্' কর্ত্তৃপক্ষ এবার সেই পথ ধরিলেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য, ওয়ারেণ্ট মঞ্জুর করিলেন। তাঁহাদের ধারণা, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কবলিত করিতে পারিলেই যাত্রীদল যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে, ফলে সকল হাঙ্গামা মিটিবে!

শ্রীযুক্ত গান্ধী পাম্‌ফোর্ডে সরকারী ওয়ারেণ্ট-বাহিগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে নিজের কয়েকজন সহচরকে তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য

নির্দ্দেশ করিলেন; নচেৎ তাঁহাকে অপরাধী প্রমাণ করাও নিতান্ত সহজ নহে। সরকারী লোকেরা তাঁহাকে মোটর-যানে ভক্সরাষ্ট্ অভিমুখে লইয়া গেল। তত্রত্য আদালতে তিনি পরদেশীর আইন (Immigration Act) ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। অনুচরগণ পাছে কোন বিপদে পড়ে অথবা অবৈধ হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী আদালতে জামিন প্রার্থনা করিলেন এবং 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের অন্তর্বিভাগীয় সচিবের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার পাঠাইলেন,—

গান্ধী গ্রেপ্তার।

"নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল উদ্যোগীকে গভরমেণ্ট অবশেষে কেন গ্রেপ্তার করিয়াছেন, বুঝিতেছি; কিন্তু আমি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, যে মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা মনুষ্যত্বের চক্ষে নিতান্ত গর্হিত। গভরমেণ্ট সম্ভবতঃ জানেন যে, যাত্রীদলের মধ্যে ১২২টী রমণী ও ৫০টী দুগ্ধপোষ্য শিশু রহিয়াছে। তাহারা প্রায় অনাহারে, বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া, স্বেচ্ছায় পথ অতিক্রম করিতেছে। এ সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে আমাকে ছিনাইয়া লওয়া, কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। গত রাত্রে গ্রেপ্তার হইয়া আমি তাহাদিগকে কোন কথা জানাইয়াও আসিতে পারি নাই। তাহারা হয়ত ক্রোধান্ধ হইতে পারে। অতএব আমাকে তাহাদের সহিত যাইতে দেওয়া হউক, অথবা গভরমেণ্ট তাহাদিগকে ট্রেণে করিয়া টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিন এবং তাহাদের খাদ্যের সুব্যবস্থা করুন। আশাকরি, গভরমেণ্ট পুনর্বিবেচনার ফলে যাত্রীদলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে অপসারিত না করিতে অথবা

তাহাদের জন্ম কোনরূপ সরকারী ব্যবস্থা করিতে, অগ্রসর হইবেন। ইহার পর যাত্রীদলের যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে—তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রাণ ত্যাগ করে—বিশেষতঃ শিশু ও রমণীগণের ভিতর কাহারও যদি জীবনহানি হয়, তাহা হইলে গভরমেণ্ট দায়ী হইবেন।”

শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত আবেদনের কোন উত্তর পাইলেন না; তবে, বিচারক তাঁহাকে জামিনে খালাস দিলেন।

মুক্তিলাভ করিয়াই শ্রীযুক্ত গান্ধী মোটরে দ্রুতবেগে যাত্রীদলের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদল পাড়িবার্গ পল্লীতে পৌঁছিয়াছিল। অতিরিক্ত ভ্রমণবশতঃ তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পদতলে দারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত গান্ধী শিশু ও মহিলাগণকে, কয়েকজন ক্ষতকাতর পুরুষের তত্ত্বাবধানে, এই গ্রামে রাখিয়া আবার পূর্ণোদ্যমে অভিযান আরম্ভ করিলেন। ৮ই নভেম্বর প্রাতে তাঁহারা ষ্টাণ্ডারটন্ সহরে পৌছিলেন। এইখানে কোন কোন খনির ম্যানেজার পুলিশের সাহায্যে কয়েকদল ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়া ট্রেণে নেটালে চালান দিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীও এযাত্রা বাদ পড়িলেন না। তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত অপরাধে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় আদালতে হাজির করা হইল। তিনি এবারও জামিনের প্রার্থনা জানাইলেন। অন্যদিকে ভারতীয় যাত্রীদল, তাহাদের গুরুকল্প নেতাকে সঙ্গে না লইয়া কিছুতেই আদালতগৃহ ত্যাগ করিবে না বলিয়া জেদ্ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে

জামিনে খালাস দিলেন। ভারতীয় যাত্রীদল উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে তৎক্ষণাৎ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

এদিকে মিঃ পোলাক্ দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদ ভারতে প্রচার করিবার জন্য অতি শীঘ্র রওনা হইবেন বলিয়া, ৯ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে পরামর্শ স্থির করাই, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য। ষ্টাণ্ডারটন্ হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী টিক্ওয়ার্থ নামক স্থানে মিত্রদ্বয়ের সম্মিলন ও সংবাদ আদান-প্রদান সম্পন্ন হইল। তাঁহারা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ যাত্রীশ্রেণীর পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানি সরকারী গাড়ী তাঁহাদের দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে। তখনও গ্রেলিঙষ্টাড্ পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিবার সম্ভাবনা। গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও সর্ব্বশেষে ট্রান্সভালের প্রধান ইমিগ্রেসন্ অফিসার মিঃ চাম্‌নে দেখা দিলেন। মিঃ চাম্‌নে, নেটালের চুক্তিবদ্ধ-শ্রমিক-আইন অনুসারে প্রদত্ত ওয়ারেণ্ট বলে, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন। পুরুষসিংহ গান্ধী এজন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। সরকারী গাড়ীখানি তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল; মিঃ পোলাক্ যাত্রীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় যাত্রীদল গ্রেলিঙষ্টাডে পৌঁছিল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। পল্লীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে তাহারা যৎসামান্য উনান

জ্বালিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। আঁধার পল্লী যেন সহসা সহস্র চক্ষু বিস্তার করিয়া আগন্তুকগণের উদ্দেশে বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করিল; কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভাব রহিল না। যাত্রীদল আহারান্তে পথিপার্শ্বে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিমসিক্ত প্রবল পার্ব্বত্য ঝটিকায় ও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত ফলে, বড়ই কষ্টবোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এ কষ্ট যে তাহাদের অঙ্গের ভূষণ!

পরদিন উষাগমে আবার অভিযান আরম্ভ হইল। গ্রেলিঙ-ষ্টাড্ হইতে বালফোর তের মাইল। যাত্রীদল ৯টার সময় শেষোক্ত স্থানে পৌঁছিল। এখানে আসিয়া মিঃ পোলাক্

যাত্রীদল গ্রেপ্তার

দেখিলেন যে, তিনখানি স্পেশাল ট্রেণ পথি-পার্শ্ববর্ত্তী রেল ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে। মিঃ চাম্‌নে ও জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী মিঃ পোলাক্‌কে জানাইলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদলকে নেটালে লইয়া যাইবার জন্য ট্রেণ তিনখানি পাঠাইয়াছেন; তাহারা তথায় পৌঁছিলে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হইবে। মিঃ পোলাক্ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করুন। তবে এ সময়ে গভরমেণ্ট শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাত্রী-দলের ভিতর হইতে সরাইয়া লওয়ায় তাহাদিগকে আমার মতাবলম্বী করা সহজসাধ্য হইবে না; কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।" প্রত্যুত্তরে

মিঃ চাম্‌নে জানাইলেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম গভরমেণ্ট দেন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই সময়ে হিল্ডেন-বার্গ হইতে ডাণ্ডিতে নীত হইতেছিলেন। তিনি পথে উল্লিখিত সংবাদ পাইয়া যাত্রীদলকে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে একটু গোলমাল বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। যাত্রিগণের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া জোহানেস্‌বার্গে যাইবার জন্য জেদ্ ধরিল। তাহারা অপরাপর যাত্রিগণকে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিবার জন্য পরামর্শ দিল। তখন মাত্র পঁচিশটী পুলিশ প্রহরী সম্মুখে দণ্ডায়মান। যাত্রীদল তাহাদের প্রদত্ত বাধা না শুনিলে হয়ত রক্তপাত হইবে—'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধে'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মিঃ পোলাক্ নিমেষ মধ্যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ বিজ্ঞ নেতার ন্যায় সক-লের সম্মুখে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—'নিরুপদ্রব-প্রতি-রোধীদের শেষ লক্ষ্য জোহানেস্‌বার্গ যাত্রা নহে—জেলে প্রবেশ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; অতএব আপনারা শান্ত হউন।' মেষপালের ন্যায় যাত্রিসঙ্ঘ তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ফিরিল। মিঃ পোলাক্ পুলিশদলের সাহায্যে যাত্রিগণকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন এবং নিজে প্রথম ট্রেণে উঠিলেন।

ট্রেণ চার্লসটাউনে পৌঁছিলে মিঃ পোলাক্ কর্ত্তৃপক্ষের

আদেশে গ্রেপ্তার হইলেন। এইখানে ধর্ম্মঘটকারিগণকে আট ঘণ্টা কাল হাজতে অনাহারে আটক রাখা হইল। তৃষ্ণায় তাহাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহাদের স্ত্রী-পুত্রগণ (যাত্রার প্রারম্ভে যাহারা চার্লসটাউনে মিঃ ক্যালেনব্যাকের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল) রেল-ষ্টেশনে দেখা করিতে আসিলে পুলিশ প্রহরীরা বাধা দিল। ট্রেণ দুই মিনিটের অধিক ষ্টেশনে দাঁড়াইল না। রমণী ও বালকেরা দূর হইতে গলদশ্রুলোচনে আত্মীয়গণকে জানাইল,—'দেখিও যেন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইও না।' ট্রেণ তিনখানি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। সে বিদায়ের দৃশ্য কি করুণ! এইরূপে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের বিরাট অভিযান পরিসমাপ্ত হইল। 'ইউনিয়ন্'-কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন, ভারতীয়গণের দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও একাগ্রতা কিরূপ অদম্য!

শ্রীযুক্ত গান্ধী ভক্সরাষ্ট আদালতে বিচারককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"নিষিদ্ধ যাত্রীদলকে সঙ্গে লইয়া ট্রান্সভালের সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আমি অন্তর্বিভাগীয় সচিবকে সময় থাকিতে আমার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলাম এবং কোন্ তারিখে সীমান্ত অতিক্রম করিব, তাহাও ভক্সরাষ্টের ইমিগ্রেশন অফিসারকে পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান ঘটনা, ট্রান্সভালে কোন ব্যক্তি বিশেষের লুক্কায়িত প্রবেশ-চেষ্টার সহিত তুলিত হইতে পারে না। বরং বলিতে পারি যে, ট্রান্সভালে আসিয়া অবধি আমি বরাবরই ব্যক্তি বিশেষের লুকাইত প্রবেশ-চেষ্টায় ও বে-আইনী

বসবাস-প্রয়াসে বাধা দিয়া গভরমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমি জানিয়া-শুনিয়া বে-আইনী কাজ করিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা; এমন কি আমার সহকর্ম্মিগণকেও প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। ইহাও জানি যে, আমরা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ না করিলে গভর্ণরের তথা 'ইউনিয়ন্' বাসিগণের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইবে না। আমি আইন ভঙ্গ করিয়াছি বটে; কিন্তু এখানকার আইন-মান্যকারী প্রকৃতিস্থ নাগরিকের অধিকার দাবী করিতেছি।"

বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পনর মাস কারাবাসে পাঠাই-লেন। তাঁহার সহযাত্রী শত শত ভারতীয় কঠোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষসমর্থনকারিগণ তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ডার্ব্বাণে, জোহানেস্‌বার্গে ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য সহরে ভারতীয় অধিবাসিগণের বিরাট সভায় 'ইউনিয়ন্'-কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দাবাদ তীব্র ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়লা-খনির শ্রমিকদলের দেখাদেখি নেটালের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ক্ষেত্রাধিকারিগণ পশুবল প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্মঘটকারিগণের কয়েকজনকে তাঁহারা বন্য পশুর মত গুলি করিয়া মারিলেন। অনেকে গুলির আঘাতে আহত হইল।

উল্লিখিত বীভৎস সংবাদ ভারতে পৌঁছিলে, এদেশবাসী জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ভারতের তৎকালীন বিচক্ষণ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে মর্ম্মন্তুদ বেদনার আক্ষেপ অনুভব করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা'র প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সহানুভূতির স্নিগ্ধ ধারা ঢালিয়া দিলেন,—

লর্ড হার্ডিঞ্জের মহাপ্রাণতা।

"সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাদের ধারণামতে অন্যায় ও বিদ্বেষজনক আইনসমূহের বিরুদ্ধে 'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' ঘোষণা করিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা নিজেদের হাতেই লইয়াছেন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সন্দর্শন করিলেও উল্লিখিত আইনসমূহের সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত একমত না হইয়া থাকিতে পারি না।

"তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। উহার ফলে তাঁহারা দণ্ডিত হইবেন, জানিতেন; তথাপি সম্পূর্ণ সাহসে ও ধৈর্য্যবলে তাহা সহ্য করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। এই ব্যাপারে সারা ভারতের গভীর ও জ্বলন্ত সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। শুধু ভারতের নহে —আমার ন্যায় যাঁহারা ভারতবাসী না হইলেও ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—তাঁহাদেরও হৃদয়তন্ত্রে সমবেদনায় করুণ ঝঙ্কার উঠিয়াছে।

"অধুনা কিন্তু অবস্থা বড় সঙ্গীণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই অনুযোগ বহুলভাবে প্রচারিত হইতে দেখিয়াছি যে, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী দলের প্রতি এমন আচরণ করা হইয়াছে, যাহা কোন সভ্য রাজ্যে এক মুহূর্ত্ত সহ্য করা চলে না।

"দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্বসম্পন্ন গভরমেণ্ট ঐ সকল অভিযোগের সত্যতা স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের অস্বীকারের মধ্যেও এমন সব স্বীকারোক্তি আছে, যাহা শুনিয়া আমার মনে হয় যে,'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিমানের মত বিচার করেন নাই। বর্ত্তমানে প্রকৃত অবস্থা এই। এখন দক্ষিণ আফ্রিকার গভরমেণ্ট যদি ভারতবাসীর চক্ষে তথা পৃথিবীর সমক্ষে আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহা হইলে নির্ভীক সদস্যগণের সমবায়ে গঠিত কমটীর দ্বারা অপক্ষপাত তদন্তের ব্যবস্থা করাই একমাত্র পন্থা। তদন্ত-কমিটীতে ভারতীয়গণের প্রতিনিধিও থাকা চাই। কমিটীর সদস্যগণ অভিযোগসমূহের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবেন। অদ্য প্রাতে যে সরকারী ইস্তাহার (Communique) প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আপনারা দেখিয়াছেন যে, আমি ভারত-সচিবের নিকট ঐ অভিমত জোরপূর্ব্বক জানাইতে ইতস্তত করি নাই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, ভারত গভরমেণ্ট এই প্রস্তাব বৃটিশ গভরমেণ্টের নিকট নির্ব্বন্ধ সহকারে উত্থাপন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

লাট-পাদরীর উদার উক্তি।

উদারহৃদয় লর্ড হার্ডিঞ্জের এই সমবেদনাপূর্ণ নির্ভীক বক্তৃতায় তাঁহার মহদন্তঃকরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় দক্ষিণ-আফ্রিকা লিগের উদ্যোগে মাদ্রাজে এক সার্ব্বজনিক সভা আহূত হয়। মাদ্রাজের লর্ড বিশপ ঐ সভার সভাপতিরূপে বক্তৃতার উপসংহারে বলেন,—

"উৎপীড়নের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে আমি বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছি। উৎপীড়িত ব্যক্তি যে দেশের বা যে জাতির হউক না কেন, তাহার পক্ষে দাঁড়ান আমি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরূপে কয়েকটী কথা কহিব। যাহারা আপনাদিগকে যিশুখৃষ্টের শিষ্য বা পদানুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের উপর নিষ্ঠুর অন্যায়াচরণ করিতেছে শুনিয়া, আমার হৃদয়ে অধিকতর ঘৃণা জন্মিয়াছে। উৎপীড়ন সর্ব্বত্র ঘৃণার্হ। বিশেষতঃ যখন কোন খৃষ্টান আপনার ধর্ম্মনীতি অমান্য করিয়া—প্রভু খৃষ্টের প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শ ভুলিয়া—অপরকে উৎপীড়ন করে, তখন তাহা দ্বিগুণ দোষাবহ। হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াও আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাহারা জেলে পাঠাইয়াছে তাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদের তুলনায় আমার চক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধীই ক্রুশ-বিদ্ধ পরিত্রাতার যোগ্যতর প্রতিনিধি; কারণ তিনি ন্যায় ও কৃপা লাভের নিমিত্ত ধৈর্য্যবলে উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন।"

ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে লর্ড এমথিলের নেতৃত্বে লণ্ডনের 'দক্ষিণ-আফ্রিকা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ কমিটী' নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের নির্যাতন কাহিনী নিয়ত বিলাতে প্রচার করিতেছিলেন। ফলে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের নির্দ্দেশ মতে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের অনুযোগ সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত এক কমিশন নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে স্যার উইলিয়ম্ সলোমণের সভাপতিত্বে সঙ্কল্পিত কমিশন গঠিত হইল বটে, কিন্তু উহার সদস্য নির্ব্বাচন ভারতীয়গণের

দিবেন পছন্দমত না হওয়ায়, তাঁহারা কমিশনকে আদৌ আমল না, স্থির করিলেন।

এই সময়ে প্রেমের অবতার যিশু খৃষ্টের একনিষ্ঠ সেবক ধর্ম্মপ্রাণ রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ড্রুজ ও রেভারেণ্ড মিঃ পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত হইয়া বিপন্ন ভারতীয়দলের দুর্দ্দশা মোচনে স্বতঃপরত সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার শান্তি-মন্দাকিনী নামিয়া আসিল। সলোমণ কমিশনের সদস্যগণ ভারতীয়দলের সম্পূর্ণ অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ফলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট 'ইণ্ডিয়ান্ রিলিফ্ এক্ট' বা 'ভারতীয় মুক্তি আইন' বিধিবদ্ধ করিয়া সকল মনো-মালিন্য মুছিয়া দিলেন। মুণ্ডকর রহিত হইল; ইমিগ্রেশন্ আইনে জাতিগত বৈষম্য উঠিয়া গেল; হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ বৈধ বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিলেন; ভারতীয়গণের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার ন্যায়সঙ্গত আইনবলে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্স শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, ভারতীয়গণের অসুবিধাজনক অবশিষ্ট অনুযোগগুলির প্রতিকার ব্যবস্থা তিনি ক্রমশঃ করিবেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন কর্ত্তব্য শেষ হইল বুঝিয়া, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা পূর্ব্বক দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিদায় গ্রহণে সমুদ্যত হইলেন।

পরিসমাপ্তি।

গত আট বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন অকাতরে সহ্য

করিয়া, ত্যাগবীর গান্ধী দেশবাসীকে যে সুমহৎ শিক্ষা দিলেন—জগতে যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার প্রদর্শিত আত্মনির্ভরতার নবীন আলোকছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার আদর্শে ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে পরতে পরতে স্বজাতি-প্রীতির মধুর রাগিণী মোহন ছন্দে বাজিতেছিল,—

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই—
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

কর্ম্মবীর গান্ধী বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয়গণের প্রাণে এই দেশাত্মবোধ জাগাইতে না পারিলে তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিষ্ঠান দুঃসাধ্য হইবে। তাই তিনি সহস্র বিপদ শিরে লইয়া নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের অগ্নি-পরীক্ষায় প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শত শত অনুচর সে প্রচণ্ড অনলে ঝাঁপ দিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে প্রাণত্যাগ করে নাই, এরূপ নহে। কুমারী ভালিয়াম্মা নাম্নী এক বীরবালা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধে যোগ দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

"সরল বিশ্বাসবতী বালিকা জানিত না যে, 'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ' কি? উহার ফলে সমাজের কি কল্যাণ হইবে, তাহাও সে অবগত ছিল না। তবে, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সে অসীম উৎসাহে মাতিয়াছিল—জেলে গিয়াছিল। জেল হইতে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বেচারা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।"



কুমারী ভালিয়াম্মা



হরবং সি

হরবৎ সিং নামে জনৈক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের সহিত মিশিয়া জেলে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আসিয়াছিলে কেন?" বৃদ্ধের দুই চক্ষু সহসা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সগর্ব্বে কহিল—"তাতে কি আসে যায়? আপনি কি জন্য লড়িতেছেন আমি জানি। আপনাকে মুণ্ডকর দিতে হয় না—আমার ন্যায় চুক্তিমুক্ত শ্রমিকগণকেই উহা দিতে হয়। আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা গৌরবের মৃত্যু আর কি আছে?"" এই নির্ভীক বৃদ্ধ ডার্ব্বাণ কারাগারে প্রাণত্যাগ করে।

নাগাপ্পান নামে আর একজন তামিল যুবক জেল হইতে বাহির হইয়াই পরলোক প্রয়াণ করিয়াছিল। স্বজাতির মঙ্গলকামী অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণ স্বামীর আত্মোৎসর্গ কাহিনী পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই সকল অমূল্য জীবনের বিনিময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণ শেষে মুক্তির দ্বারে দাঁড়াইলেন বটে; কিন্তু এ সকল শোকের স্মৃতি কি কখনও মুছিবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজেও বড় কম নির্যাতন ভোগ করেন নাই।

কর্ত্তব্যমুখে পত্নী-পুত্র।

তিনি তিনবার জেলে গিয়াছিলেন। প্রথম বার গ্রেপ্তার হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী মৃত্যু-শয্যায় শায়িত; যদি শেষ

দেখা দেখিতে চান ত এখনই ফিনিক্স পল্লী অভিমুখে রওনা হউন। দৃঢ়ব্রত গান্ধী অবিচলিত চিত্তে কহিলেন,—'পুত্রের জীবন রক্ষার ভার শ্রীভগবানের করে অর্পণ করিয়া আমি জোহানেস্‌বার্গে চলিলাম ; কারণ পুত্র অপেক্ষা আমার জাতি বড়। জোহানেস্‌বার্গে স্বজাতীয়গণ আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।" করুণাময় ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার জেলে অবস্থানকালে তিনি তারে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পত্নীর জীবনের আশা প্রায় নাই। জেল পরিদর্শনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন,—"আপনি জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করুন, কারণ এ সময়ে পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ গান্ধী বিনীতভাবে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন,—"আমি হাল ছাড়িলে সব বান্‌চাল হইয়া যাইবে।"

পরে সরকারী আদেশে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী আবার গ্রেপ্তার হইলেন। এবার ইচ্ছা করিলে তিনি মামলা মুলতুবি রাখিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। ট্রান্সভাল গভরমেণ্ট তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে সমুৎসুক জানিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তিম-শয্যাশায়িতা পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। সে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য স্মরণেও চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। সুখের বিষয় পতিপ্রাণা পত্নী বিধাতার করুণায় সে যাত্রা রক্ষা পান।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীরূপে

কয়েক মাস জেলে গিয়াছিলেন। কারাগারের কঠোতায় অভ্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মবীর গান্ধী অপর দুইটি শিশু সন্তানকেও আন্দোলনে টানিয়া লইয়াছিলেন। পাঠক, মনে করিবেন না, তিনি স্ত্রী-পুত্রের প্রতি নিতান্ত কঠোর। তাঁহার তুল্য পুত্রবৎসল পিতা, পত্নীপ্রিয় ভর্ত্তা, সংসারে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি একদিকে যেমন কুলিশ-কঠোর, অন্য দিকে তেমনি পরাগ-পেলব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কারণ মহামতি গোখলে তখন বিলাতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতরত্ন গোখলের প্রতি শ্রীযুক্ত গান্ধীর শ্রদ্ধা চিরকালই অটল। তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন—অভিন্নহৃদয় বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিতেন। এমন শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ শেষশয্যায় শায়িত শুনিয়া মহাপ্রাণ গান্ধী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি সস্ত্রীক ইংলণ্ড যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃতজ্ঞ ভারতীয়গণ জোহানেস্‌বার্গে এক সভা আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বিদায়-অভিনন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—

শেষ বিদায়।

"আমাদের শাস্ত্রের আদেশ এই যে, কুত্রাপি নিজের সুখ্যাতি শুনিলে সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ পলাইতে হয়; তাহা না পারিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। ঐ দুইটী পন্থা যাঁহারা অবলম্বন করিতে অক্ষম, তাঁহারা

সকল সুখ্যাতি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবেন। আশা করি আজ আমি ও আমার পত্নী আপনাদের কথিত তাবৎ সুখ্যাতি সেই সারাৎসারের চরণে অঞ্জলি দিতে পারিব।”

ইহার পর তিনি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের সমর্থনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির গুণপণা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া নিজের দীনতা অকুণ্ঠ ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। ফলে শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধী লণ্ডনে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহামতি গোখলে সে যাত্রা মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪) জর্ম্মণীর সহিত ইংরাজের তুমুল যুদ্ধ ঘোষিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী কাল বিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে স্বেচ্ছাসেবকদল (Indian Volunteer Ambulance Corps) গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সস্ত্রীক ঐ দলে নাম লিখাইলেন; কিন্তু তাঁহার শরীর আর বহিল না। কঠোর কারাবাসে, নিরবচ্ছিন্ন শ্রমশীলতায় ও বহু নৈষ্ঠিক উপবাসে তাঁহার রুগ্ন শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তিনি বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ পরামর্শে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বিলাতে কর্ম্মানুষ্ঠান।

শ্রীযুক্ত গান্ধী আপোলো বন্দরে অবতীর্ণ হওয়া অবধি ভারতের নানাস্থানে তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনার সমারোহ

পড়িয়া গেল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের উপাধি তালিকায় ভারত গভরমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীকে 'কৈশার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দানে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে তাঁহার প্রধান সহায় মহামতি গোখলে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য ধামে চলিয়া গেলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল মাদ্রাজে সম্বর্দ্ধনা-সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ।

"আপনারা বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয় নরনারীগণকে আমিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলাম। এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া আমি মানিয়া লইতে পারি না। সেখানকার সরলচিত্ত, একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিগণই আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা সামান্য-মাত্র পুরস্কারের প্রত্যাশাও করে নাই। তাহাদের মহান্ আত্মত্যাগ ও অদ্ভুত ভগবদ্-বিশ্বাস আমাকে আপন সঙ্কল্পে অটল রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ও আমার পত্নী কর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল আলোকে পড়িয়া লোকের দৃষ্টিপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছি; কাজেই আপনারা আমাদের অনুষ্ঠিত সামান্য কার্য্যকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছেন।

"আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করি না যে, আমরা তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলাম; পরন্তু তাহারাই আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। আমরা শাসক-সম্প্রদায় ও পরিত্রাণ-প্রার্থী, এই উভয় দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া দোভাষীর কাজ করিয়াছিলাম। আমরা এই উভয় দলের সংযোজক ছাড়া কিছুই ছিলাম না।"

এ যুগে এমন স্পষ্ট ভাষায় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে কয়জন নেতা সক্ষম?

ভারতের অবস্থা অন্ততঃ এক বৎসর কাল স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে এদেশের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে, মহামতি গোখলে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি ভারতের নানা জনবহুল সহরে পরিভ্রমণ করিয়া দেশবাসীর গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণীর রেল-গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতেন। কীর্ত্তিমান গান্ধী কলিকাতায় আসিবেন শুনিয়া বাঙ্গলার নেতৃগণ তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত উৎসাহিত হইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে দলবলসহ হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবেন, সাগ্রহে বরণ করিয়া কলিকাতায় আনিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। কলিকাতার জননায়কগণ হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় মুহুর্মুহু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাষ্পীয় রথ উদরগহ্বরে শতশত নরনারী লইয়া শীঘ্রই দেখা দিল। নেতৃগণ প্রথম শ্রেণীর কামরা অভিমুখে ছুটিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী কোথায়? প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, অবশেষে মধ্যম শ্রেণীর সকল গাড়ী তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কোথাও পাওয়া গেল না! তবে কি তিনি আসেন নাই? সকলে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে দেখা গেল, সামান্য পরিচ্ছদধারী শ্রীযুক্ত গান্ধী নগ্নপদে

হাওড়া ষ্টেশনে অপূর্ব্ব দৃশ্য।

একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিতেছেন। সকলে অবাক্! এই কি সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী? যাহাহউক সম্বর্দ্ধনার ত্রুটি হইল না। শ্রীযুক্ত গান্ধী সাদরে কলিকাতায় নীত হইলেন।

এদেশে তৃতীয়শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাঁচি হইতে যে বর্ণনা-পত্র প্রচার করেন, তাহা একদিকে যেমন দুঃস্থপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অন্যদিকে তেমনই সূক্ষ্মদৃষ্টির স্পষ্ট পরিচায়ক। *

বিহারে নীলকর।

বিহার—ত্রিহুত অঞ্চলে অনেক শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়াল বহুদিন যাবৎ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কতক খাসে কতক বা প্রজাদের দ্বারা নীল আবাদ করাইয়া তাহা কুঠির কারখানায় পচাইয়া নীল রঙ প্রস্তুত করত ইউরোপে চালান দিতেন। এই সূত্রে দেশীয় জমিদারগণের নিকট দু'দশখানি গ্রাম তাঁহারা কুঠির নামে ইজারা লইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থানের প্রজাগণকে সাধারণতঃ 'তিন কাঠিয়া' প্রথানুসারে বিঘাপ্রতি তিন কাঠা হারে ভূমি নীল আবাদের জন্য পৃথক রাখিতে হইত। বলা বাহুল্য, কুঠিয়াল সাহেবদের কর্ম্মচারিগণ প্রজার ভাল জমিখানিই নীলের জন্য বাছিয়া দিতে ছাড়িতেন না। ইহার ফলে, অনেক সময়ে রায়তেরা ভিটা-জমীতে নীল আবাদ করিতে বাধ্য হইত; তাহাতে আবরু নষ্ট হয় বলিয়া তাহারা

* বর্ণনা-পত্রের মর্ম্মানুবাদ পরিশিষ্টে দেখুন।

আপত্তি তুলিত। তাহাদের নিকট 'বেগার' ও 'জরিমানা' আদায় করা আইনসঙ্গত বলিয়া অনেক কুঠিয়াল মনে করিতেন। তা'ছাড়া 'আবোয়াব্' 'সরেবেশি' 'হিসাবানা' 'মাথট্' প্রভৃতি নানা বাবে 'বাজে আদায়' সংগ্রহ করিতেও তাঁহারা বিরত ছিলেন না। ফলে, প্রজাদের সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের মনোমালিন্য বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুত—মতিহারী অঞ্চলে দরিদ্র প্রজাদলের সহিত কয়েকটী কুঠির সাহেবগণের ঘোরতর হাঙ্গামা বাধে। সেই হাঙ্গামার তদন্ত-ভার তৎকালীন কৃষি-ডিরেক্টর, সদাশয় সিভিলিয়ান্ মিঃ গুর্লের উপর অর্পিত হয়। গুর্লে সাহেবের রিপোর্ট কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন নাই। বলা আবশ্যক শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়ালগণের ন্যায় কোন কোন দেশীয় তালুকদারও প্রজাগণের নিকট নানারূপ বে-আইনী 'বাজে আদায়' সংগ্রহ করিতেন।

জর্ম্মণীর কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের পর এদেশে নীলের বাজার একেবারে পড়িয়া যায়। ১৯০৮-১০ খৃষ্টাব্দ হইতে অনেক কুঠিয়াল নীলের কারবার বন্ধ করিয়া দেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রজাগণকে নীলচাষের বাধ্যতা হইতে রেহাই দিবেন বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে মোটা টাকা সেলামী (তাওয়ান্) আদায় করিতে অথবা পাকা জমার নিরীখ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে করভারপ্রপীড়িত রায়তেরা ঘোরতর আপত্তি তুলে। অন্যদিকে সরকারী সেট্‌লমেণ্ট বা জরিপের ফলে

প্রজাদলের সহিত কুঠিয়ালদের জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা বহুলভাবে বাধিয়া উঠে। কাজেই ত্রিহুতের দীন প্রজাগণ বিপাকে পড়িয়া 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ে।

কংগ্রেসে প্রস্তাব।

দীনের আর্ত্তনাদ একদিন দীনবন্ধুর কর্ণে নিশ্চয়ই পৌঁছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে (Subjects Committee) এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় যে, ত্রিহুতের প্রজা-সাধারণের অনুযোগ সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যগণের সমবায়ে এক কমিটী গঠনের জন্য গভরমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। বিহারের প্রতিনিধিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি কিন্তু ইহাতে সম্মত হন নাই ; পরন্তু বলেন, —"আমি ঐ বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। তবে, যথাবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি প্রয়োজনীয় মনে করি, তবে ইহা পরে কংগ্রেসে পেশ করিব।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীযুক্ত গান্ধী ত্রিহুতের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মজঃফরপুর রওনা হন। মজঃফরপুর পৌঁছিয়া তিনি 'বেহার প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারি মিঃ উইল্‌সন্ ও ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ মর্শেডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীযুক্ত গান্ধীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন। কমিশনার সাহেব

বলেন—"নীলকর সাহেবদের সহিত রায়তগণের সম্পর্ক লইয়া অনেক আলোচনা গভরমেণ্ট বহুদিন যাবৎ করিতেছেন। আমরা এখন চম্পারণের সমস্যা লইয়াই সবিশেষ ব্যস্ত আছি। এরূপ স্থলে একজন বাহিরের লোক আসিয়া সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইলে আমাদের কার্য্যে হাঙ্গামা বাধিবে। এ কার্য্যে আপনাকে আহ্বান করিল কে?" প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিলেন,—"আমি দেশের লোকের আহ্বানে আসিয়াছি। আপনারা আমার কার্য্যে সাহায্য করুন, আমিও আপনাদের কার্য্যে সাহায্য করিব।" কমিশনার সাহেব তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু কাজে নামিয়া পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। তিনি ১৫ই এপ্রিল মজঃফরপুর হইতে মতিহারী রওনা হন। পরদিন চম্পারণের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেকক্ বিভাগীয় কমিশনারের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত গান্ধীর উপর ফৌজাদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারামতে এই মর্ম্মে নোটীশ জারি করেন যে, তিনি ঐ জেলায় অবস্থান করিলে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা—এমন কি লোকের প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; অতএব পরবর্ত্তী ট্রেণে তিনি যেন চম্পারণ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

বহিষ্কারের আদেশ!

প্রত্যুত্তরে দৃঢ়ব্রত গান্ধী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন যে, সাধারণের কার্য্যে যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনুরোধে তাঁহাকে চম্পারণ জেলায় থাকিতেই

হইবে—জেলা ছাড়িয়া যাইতে তিনি পারিবেন না; তবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঐ অবাধ্যতার জন্য দণ্ড বিধান করেন, তাহা তিনি বহন করিবেন।

কর্ম্মবীর গান্ধী আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে তিনি অনভ্যস্ত নহেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এজাহার দিলেন,—

"আদালতের অনুমতি লইয়া আমি স্বল্প কথায় বুঝাইয়া দিতে চাই যে, কেন আমি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারামতে প্রদত্ত সরকারী আদেশ বাহ্যতঃ অমান্য করিয়া ঘোরতর দায়িত্ব লইয়াছি। আমার মতে ব্যাপারটী আমার সহিত সরকারী কর্ম্মচারিগণের মতভেদ লইয়া ঘটিয়াছে। আমি মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এবং স্বজাতির সেবার নিমিত্ত এ প্রদেশে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়া রায়তগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। রায়তেরা বলে যে, নীলকর সাহেবেরা তাহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। তাহাদের আহ্বানে আমি এখানে আসিয়াছি। সমস্ত সমস্যাটী আগাগোড়া না জানিয়া, আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি না। তজ্জন্য সমস্ত ব্যাপারটী জানিবার উদ্দেশ্যে—এমন কি সম্ভব হইলে, সরকারী কর্ম্মচারিগণের ও নীলকর সাহেবদের সাহায্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবার আশায়—আমি এ অঞ্চলে আসিয়াছি। ইহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়াই শান্তিভঙ্গ হইবে অথবা লোকের জীবনহানি ঘটিবে। এরূপ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা কিন্তু অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। আমি তাঁহাদের

অসুবিধার কথা জানি এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তাঁহারা কেবল অপরের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন। আইন-মান্যকারী নাগরিকরূপে সরকারী আদেশ মানিয়া চালাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাদের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি অব্যাহত রাখিয়া আমি সরকারী আদেশ মানিতে পারি নাই! আমার মতে, এখন ইহাদের মধ্যে থাকিতে পারিলেই, আমি ঠিক কাজ করিতে পারিব। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতে পারি নাই। কর্ত্তব্যের এই কঠোর সমস্যায় আমাকে এখান হইতে সরাইবার ভার সরকারী কর্ম্মচারিগণের ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমি বেশ জানি, ভারতে আমার মত যাহারা জনসাধারণের কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কোন কার্য্যে আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। অধুনা আমরা যে জটিল সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে যাহার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তিনি ঠিক আমারই মত আচরণ করিবেন; অর্থাৎ আদেশ অমান্য করার দরুণ দণ্ড, বিনা প্রতিবাদে মাথা পাতিয়া লইবেন। আমি দণ্ড লাঘবের নিমিত্ত কৈফিয়ৎ দিতেছি না; তবে এইটুকু জানাইতে চাই যে, আমি রাজশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আইন অমান্য করি নাই—অন্তর মধ্যে বিবেকের বাণী শুনিয়াই এই কার্য্য করিয়াছি।”

এই ব্যাপারে ভারতের সর্ব্বত্র আশঙ্কার সারা পড়িয়া গেল। মিঃ পোলাক্ ঝটিতি বাঁকিপুরে পোঁছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে মিঃ হাসন ইমাম, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, মিঃ মজহরল হক্ প্রমুখ বেহারী নেতৃগণ, শ্রীযুক্ত গান্ধীর সাহায্যার্থ অবিলম্বে মতিহারী রওনা হইলেন। চারিদিকে

তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতের নানা স্থান হইতে বড়লাটের নিকট প্রতিকার প্রার্থনায় অজস্র টেলিগ্রাম্ আসিতে লাগিল। বাসুকির শিরঃসঞ্চালন কালে ধরিত্রী যেরূপ সহসা টলমল করিয়া উঠে, ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ সেইরূপ অকস্মাৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বেহার গভরমেণ্ট অবশেষে বুদ্ধিমানের মত ব্যবস্থা করিলেন। সরকারী আদেশে মামলা প্রত্যাহৃত হইল—মহাপ্রাণ গান্ধী খালাস পাইলেন; পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তদন্ত কার্য্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী গ্রামে গ্রামে গিয়া শত শত রায়তের মুখে তাহাদের অভিযোগ-কাহিনী অবগত হইতে লাগিলেন।

তদন্ত-কমিশন।

শেষে বেহারের কর্ত্তৃপক্ষ ভারত গভরমেণ্টের ইঙ্গিতে ঐ সম্বন্ধে আমূল তদন্তের নিমিত্ত মধ্য-প্রদেশের কমিশনার মিঃ শ্লাইর নেতৃত্বে পাঁচজন অবস্থা-ভিজ্ঞ সদস্যের সমবায়ে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই কমিশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। কমিশনের সদস্যগণ বেথিয়া, মতিহারী প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাসাধারণের ও নীলকর সাহেবদলের সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নীলকর সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে অযথা লেখনী চালনা করিতে বিরত হন নাই। কর্ম্মবীর গান্ধী কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ণোদ্যমে প্রকৃত

রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রজাপক্ষের বহু দুঃখ-কাহিনী সাক্ষিগণের মুখে প্রকাশিত হইল। শেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভরমেণ্ট 'চম্পারণ কৃষি আইন' পাশ করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা কতকটা মিটাইলেন। ফলে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তিরোহিত হইল।

পুরুষসিংহ গান্ধী এই ব্যাপারে যে দৃঢ়তা, সংযম ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব।

চম্পারণ হাঙ্গামার সময় মিঃ আরুইন নামে জনৈক কুঠিয়াল সাহেব শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিদ্রূপপূর্ণ এক পত্র 'পায়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী লিখেন,—

দেশীয় পরিচ্ছদের আদর।

"পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধুর্য্য বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া আমি আমার জাতীয় সাজ-সজ্জার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি। আমি নিজে বস্ত্র বয়ন ও কৃষিকর্ম্ম করি। স্বদেশী-ব্রত আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমার কাপড় ও জামা আমার স্বহস্তে বা সহকর্ম্মিগণের হস্তে বোনা ও সেলাই করা হইয়া থাকে। আমি ভারতবাসীর প্রকৃতির অনুরূপ জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি। আমার মতে বিলাতী পরিচ্ছদ অনুকরণ করা আমাদের অবনতি, হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আমরা জাতীয় পরিচ্ছদ পরিহার করিয়া জাতীয় পাপ অর্জ্জন করিতেছি। এদেশের জল-হাওয়ার পক্ষে আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদই উপযুক্ত। আমাদের পোষাকের মত সাদাসিধে, কৌশলসম্পন্ন অথচ সুলভ পোষাক পৃথিবীতে আর কোন জাতির নাই। উহা দ্বারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয়। ইংরাজেরা যদি বৃথা অহঙ্কার ও অমূলক 'প্রেষ্টিজের' মায়া কাটাইতে

পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার আরম্ভ করিতেন। পবিত্রতার খাতিরে আমি জুতা ব্যবহার ছাড়িয়াছি। তার ফলে বুঝিয়াছি, সম্ভবপর হইলে জুতা ব্যবহার না করাই ভাল; কারণ তাহাই মানবের প্রকৃতিসুলভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।"

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের মূলমন্ত্র—সত্য। তিনি নিজে কঠোর সত্যাশ্রয়ী—অপরকেও কায়মনোবাক্যে সত্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি জানেন, সত্যের বল— মহাবল।

সত্যগ্রহাশ্রম। ছাত্রগণকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি আমেদাবাদে নিজের তত্ত্বাবধানে, 'সত্যগ্রহাশ্রম' নামে এক শিক্ষাশালা স্থাপন করিয়াছেন। তথায় শিক্ষার্থিগণকে নিম্নলিখিত কয়টী পবিত্র পণ গ্রহণ করিতে হয়,—"(১)সর্ব্বদা সত্য কহিব; (২) হিংসা ত্যাগ করিব, (৩) বিবাহ করিব না; (৪) আহারে লোভ সম্বরণ করিব; (৫) পরদ্রব্য অপহরণ করিব না; (৬) নিতান্ত অপরিহার্য্য জিনিস ব্যতীত আবশ্যকতারিক্ত কিছুই ব্যবহার করিব না; (৭) জীবনে কাহারও নিকট ভীত হইব না; (৮) স্বদেশীর দীক্ষা লইব; (৯) পতিতোদ্ধারে ব্রতী হইব।"

ছাত্রগণকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করাই কর্ম্মবীর গান্ধীর অভিপ্রেত। তাঁহার আশ্রমে ইংরাজী গৌণ ভাষারূপে শিখান হইয়া থাকে। শিক্ষার কাল—দশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রগণ পিতামাতার নিকট যাইতে পায় না। তাহাদিগকে ধর্ম্ম, কৃষি ও বয়ন শিক্ষা নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়। দেশীয় ভাষার

মধ্যে উর্দ্দু, বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু ও দেবনাগরী এই পাঁচ প্রকার অক্ষরে ছাত্রগণ অভ্যাস লাভ করে। ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দূরদর্শী গান্ধী তাঁহার আশ্রমে করিয়াছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড দিল্লীতে এক কন্‌ফারেন্স বা মন্ত্রণা-সভা আহ্বানের আয়োজন করেন। জর্ম্মনীর সহিত যুদ্ধে ভারতবাসী কি উপায়ে বৃটিশরাজকে ধনবলে ও জনবলে সম্যক্ সাহায্য দান করিতে পারে, ইহাই নির্দ্ধারণ করা কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য। ভারতের প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ ও সকল প্রদেশের প্রসিদ্ধ জননায়কগণ সভায় আহূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও এ নিমন্ত্রণে বাদ পড়েন নাই। তিনি ২৬শে এপ্রিল বড়লাটকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যেহেতু লোকমতের শক্তিশালী অধিনায়ক লোকমান্য তিলক, মিসেস্ বেশান্ত ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রিত হন নাই, তিনিও সভায় যাইতে পারিবেন না। বড়লাট শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত গান্ধী সভায় হাজির হইলেন বটে, কিন্তু তেমন উৎসাহের সহিত বিচার-বিতর্কে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি হিন্দী ভাষায় সমর্থন করিলেন। বড়লাটের দরবারে সেদিন বিচিত্র বেশভূষামণ্ডিত রাজন্যবর্গের সম্মুখে, সরকারী ও বে-সরকারী শত শত পদস্থ

দিল্লী কন্‌ফারেন্স।

দরবারীদের পুরোভাগে সামান্য ধুতি পরিহিত শ্রীযুক্ত গান্ধী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন—এ দৃশ্য কেমন! ধুতির এ মান, হিন্দী ভাষার এমন গৌরব, পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কয়রা জেলায় অজন্মা বশতঃ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ফলে সহস্র সহস্র প্রজা সরকারী খাজনা আদায় দিতে একান্ত অপারগ হইয়া পড়ে। যে সকল গ্রামে চারি আনা ফসল জন্মে নাই, তথায় রাজস্ব-আইন অনুসারে গভরমেণ্ট প্রজাদের খাজনা মকুপ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন গ্রামের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন গ্রামই ঐ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিল। শোষাক্ত গ্রামবাসিগণের পক্ষে গরু-বাছুর বা তৈজস-পত্র বিক্রয় করিয়া সরকারী খাজনা পরিশোধ দেওয়া বড়ই কষ্টকর হইতেছে বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী আমেদাবাদের 'গুজরাট সভা'র মারফতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট একদল 'ডেপুটেশন' প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, কমিশনারের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খাজনা আদায় যেন বন্ধ রাখা হয়। কমিশনার মিঃ প্রাট্ ইহাতে বিরক্ত হইলেন। তিনি 'ডেপুটেশনে'র প্রার্থনায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। ফলে সংঘর্ষ পাকাপাকি হইয়া উঠিল।

কয়রা কাণ্ড।

২২শে মার্চ্চ হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধী গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে 'সত্যগ্রহে' উৎসাহিত করিয়া কহিলেন—"তোমরা কিছুতেই বিচলিত হইও না। সরকারী কর্ম্মচারিগণের প্রতি অভদ্রতা করিও না। নিজেদের উপর অটল বিশ্বাস রাখিও। ইহা স্বত্ব সাব্যস্তের সংঘর্ষ মাত্র।" প্রজাগণ দলে দলে সত্যগ্রহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মিঃ প্রাট্ কৃষকগণকে বলিলেন,—"এ ব্যাপারে তোমাদেরই ক্ষতি ষোল আনা। 'হোমরুলারে'রা তোমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গায়ে আঁচ্‌টি পর্য্যন্ত লাগিবে না।" কমিশনার সাহেবের আদেশে 'মাম্‌লাট্‌দার' অর্থাৎ রাজস্ব-কর্ম্মচারিগণ প্রজার গরু-বাছুর, জমি-জমা নিলাম করিয়া খাজনা আদায় লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত শত ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তি সরকারী নিলামে বিকাইয়া গেল; কিন্তু প্রজাপক্ষ কিছুতেই বিচলিত হইল না।

আত্মরক্ষায় সত্যগ্রহ।

শ্রীযুক্ত গান্ধী স্থানে স্থানে সভা আহ্বান করিয়া সহস্র সহস্র বিপন্ন প্রজাকে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প স্থির রাখিবার জন্য এই মর্ম্মে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—

"সমগ্র ভারত এখন কয়রার প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। যদি কয়রার কৃষকগণ এই সংঘর্ষে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য অংশের কৃষকেরা আর বহুকাল মাথা তুলিতে পারিবে না। কোন

কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সে বিষয় একাধিক বার চিন্তা করিয়া দেখা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কার্য্যারম্ভের পর আমরা তাহা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অমানুষ বলিয়া অভিহিত হইব। ভূমির মূল্যবত্তা সেই ভূমিবাসী ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। কয়রার ভূমিসমূহে যদি লোকের বাস না রহিত, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। কয়রার এই সংঘর্ষ প্রকৃত পক্ষে খাজনা মকুপের সংঘর্ষ নহে—ইহা নীতি রক্ষার সংঘর্ষ মাত্র।”

এপ্রিল মাসের শেষভাগে বোম্বাই গভরমেণ্ট এই মর্ম্মে এক প্রেস-নোট প্রচার করিলেন যে, খাজনা আদায় স্থগিত রাখার ব খাজনা ছাড় পাওয়ার কথা, কয়রার প্রজারা অধিকার সূত্রে দাবী করিতেছে বটে; কিন্তু ঐ রূপ দাবী প্রজাপক্ষ করিতে পারে না। খাজনা আদায় স্থগিত রাখা বা খাজনা ছাড় দেওয়া গভরমেণ্টের দয়া সাপেক্ষ। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী জানাইলেন যে, প্রজার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রজা শাসন করাও অসঙ্গত। ফলে, বোম্বায়ে তুমুল আন্দোলন উঠিল। তত্রত্য ধনকুবেরগণ বিপন্ন কৃষকদলকে সাহায্য দান করিতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু কৃষকেরা শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরামর্শে সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। তাঁহার মতে, কষ্ট সহ্য না করিলে শুভ মুহূর্ত্ত কাটিয়া যাইবে।

প্রজাগণ দলে দলে উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে নরম হইলেন। জুনমাসের প্রারম্ভে তাঁহারা

খাজনা আদায় মুলতুবি রাখিতে স্বীকৃত হইলেন; তবে প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খাজনা মিটাইয়া দিতে হইবে। তখন শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন,—

"কলেক্টরের সহিত যুক্তিমতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আমার প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে হাঙ্গামা সহজেই মিটিবে। আমাদের আন্দোলনের প্রথম সর্ত্ত এই ছিল যে, দরিদ্রগণের খাজনা আদায় যদি মুলতুবি রাখা হয়, তাহা হইলে সক্ষমগণ স্ব স্ব খাজনা মিটাইয়া দিবেন। এখন প্রজাসাধারণের আত্মসম্মান বজায় রহিল। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা খাজনা অবিলম্বে মিটাইয়া দিন এবং যাহারা সত্য-সত্যই খাজনা দিতে অক্ষম, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন। যাহারা খুব দরিদ্র অর্থাৎ যাহাদের পক্ষে খাজনা দিতে হইলে ধার করা বা জিনিসপত্র বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাহারাই যেন তালিকাভুক্ত হয়। এরূপ প্রজার সংখ্যা যত কম হয়, ততই আপনাদের বাহাদুরী। আপনারা সরকারী হুকুমের অপব্যবহার করিবেন না—বিবেক-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্য করিবেন। কোন্ প্রজা খাজনা পরিশোধ করিতে অক্ষম বা কোন্ প্রজা সক্ষম, তাহা নির্দ্ধারণের ভার গভরমেণ্ট আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।"

অতঃপর কয়রার হাঙ্গামা মিটিল, মহাত্মা গান্ধীর জয় দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল।

জর্ম্মণীর সহিত মহাযুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে অস্ত্রধারণের নিমিত্ত

ভারত গভরমেণ্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন এদেশে সৈন্য সংগ্রহের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অদ্ভুতকর্ম্মা গান্ধী সত্যগ্রহ আন্দোলনের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র কয়রা জেলায় পরমাগ্রহে সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন।

সৈন্য সংগ্রহ।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজেয় নিকট—পৃথিবীর বীরেন্দ্র সমাজে—ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপাদনের ইহাই শুভ অবসর. ফলে, সৈন্য সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন,—

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরিক হওয়াই যখন ভারতবর্ষের লক্ষ্য, তখন সাম্রাজ্যের জন্য তাহাকে ত্যাগ স্বীকার—এমন কি প্রাণপাত পর্য্যন্ত—করিতে হইবে। সাম্রাজ্য যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে উহার সহিত আমাদের অন্তরের উচ্চাভিলাষ বিনষ্ট হইবে। যতদিন ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজের মুখাপেক্ষী রহিবে, ততদিন তাহার পক্ষে ইংরাজের সমান সরিক হইবার অধিকার জন্মিতে পারে না। ভারতবাসীকে অস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে হইবে। স্বরাজ লাভের এই সরল উপায় আয়ত্ত করিবার জন্য —সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য—তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। ইংরাজেরা যদি এই মহাসমরে ভারতীয় সেনার সাহায্যে জয় লাভ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রার্থনা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলেন যে, উহা যদি এখনই দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে বঞ্চনা করা হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনীতিবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এই অবিশ্বাস, আমাদের আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের যাহা ন্যায্য দাবী, তাহার জন্য আমরা কেন রাজনীতিজ্ঞগণের সৌজন্য বা দৌর্ব্বল্যের উপর নির্ভর করিব? আমরা

স্বরাজ-প্রার্থী হইলে আমাদের পক্ষে সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতেই হইবে। এই সাহায্য করার দরুণ পুরস্কার আমরা নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইব। আমরা যদি সদুদ্দেশ্যে সরলচিত্তে কার্য্য করি, তাহা হইলে গভরমেণ্টের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার অবশ্যই পাইব।"

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্পষ্টবাদী গান্ধী ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষ যদি শত্রুর করতলগত হয়, তাহা হইলে এদেশের ত্রিশ কোটী লোককে শৌর্য্যশূন্য করিয়া রাখার অভিসম্পাত ইংলণ্ডের উপর বর্ত্তিবে। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের সহৃদয়তা ব্যতীত নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি আমাদের নাই। অতএব আমরা যদি এখন সাম্রাজ্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সম্মত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহার সরিকী অস্বীকৃত হইলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রত্যেক গ্রাম হইতে ১০ জন্য সৈন্য চাহেন। ফলে, ২২শে জুন হইতে ২৫শে জুন, এই চারি দিনের মধ্যে কয়রা জেলায় ৮২৮ জন, পাঁচ মহলে ২৬৬ জন এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ২,৩৬১ জন যুবক সৈন্যদলে প্রবেশ করে। কর্ম্মবীর গান্ধীর আহ্বানে লোকে এমনই উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে রাজার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়।

স্থিতধী গান্ধী যুদ্ধের জন্য একদিকে যেমন বিপুল উৎসাহে সৈন্য সংগ্রহে মাতিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনিই ভারতের

রাজকোষ হইতে সামর্থাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দানের প্রস্তাবে স্পষ্ট প্রতিবাদ মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছিলেন। বোম্বাই—আমেদাবাদের ‘গুজরাট সভা’র প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার পাঠান,—

অর্থদানে আপত্তি।

“যুদ্ধ যাহাতে চলিতে পারে, তৎপক্ষে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে এই সভা অপর কাহারও অপেক্ষা অল্প অনুরাগী নহেন; এবং সভা মনে করেন যে, যুদ্ধ চালাইতে সাহায্য করা ভারতের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ইহাতেই রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে বৃটিশের সহিত ভারতের সমান অধিকারের পরিচয় পরিস্ফুট হইবে। তথাপি সভা বিশেষরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ আর কোন রকম আর্থিক বোঝা বহিতে অসমর্থ। ভারতের গভীর দারিদ্র্য যে ক্রমেই গভীরতর হইতেছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহা ভাল করিয়া বুঝেন না—ইহাই সভার সুদৃঢ় অভিমত। অতএব এই সভা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ সাহায্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে * তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতের উপর গুরুতর আঘাত লাগিবে। সভার অভিমত এই যে, ভারত হইতে আরও অর্থ সংগ্রহের জন্য আইন না করিয়া স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চাঁদার উপর নির্ভর

* এদিন ভারত গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিলাত গভর্ণমেণ্টকে দ্বিতীয় দফায় সাড়ে সাতষট্টি কোটী টাকা প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। প্রথম দফায় ঐ বাবত দেড়শত কোটী টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

করাই ভাল। অতএব সভা আশা করেন যে, ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না করার জন্য সভার এই আবেদনে গভরমেণ্ট অনুকূলভাবেই সাড়া দিবেন।”

সে সময়ে যুদ্ধের ব্যয় বহনে ভারতবাসীর অক্ষমতার কথা এমন নির্ভীক ভাষায় ব্যক্ত করিতে আর কাহাকেও শুনা যায় নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মানব হৃদয়ের নিখুঁত পরিচয় যেরূপ পাওয়া যায়, বৃহৎ ব্যাপারে সেরূপ সম্ভব নহে। বৃহৎ কাণ্ডে অনেক সময়ে কৃত্রিমতার মুখোস ঢাকা থাকে —ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহা সহজে ধরা পড়ে। মহাপ্রাণ গান্ধীর ভিতর ও বাহির অভিন্ন। তিনি মুখে যাহা বলেন, নিজের জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করেন। পশ্চাল্লিখিত দুইটী ঘটনায় পাঠক তাঁহার মহদন্তঃকরণের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন,—

মনের বল ;

কয়রা জেলায় হাঙ্গামার সময় শ্রীযুক্ত গান্ধী একদিন গো-যানে আরোহন করিয়া মফঃস্বলে কোন সুদূর পল্লী অভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, গাড়োয়ান লোহার কাঁটাযুক্ত তীক্ষ্ণ যষ্টিদ্বারা নিরীহ বাহন দুইটীকে পুনঃপুন নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে এবং যন্ত্রণাকাতর বুভুক্ষু জীবদ্বয় প্রতি নিঃশ্বাসে যেন প্রাণের গভীর বেদনা মুহুর্ম্মুহু জ্ঞাপন করিতে করিতে অতিকষ্টে গাড়ীখানি টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কয়েক বার নিষেধ সত্ত্বেও গাড়োয়ান তাহার কণ্টকময় যষ্টি পরিচালন

বন্ধ না করায়, করুণহৃদয় গান্ধী সে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া এগার মাইল পথ পদব্রজে ফিরিয়া আসিলেন। পরে প্রথম যাত্রার স্থান হইতে তিনি পুনরায় পদব্রজে গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত! এই ঘটনার পর ঐ অঞ্চলে গাড়োয়ানেরা লোহার কাঁটাযুক্ত যষ্টি ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী দারুণ রক্তামাশয় রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন সঙ্গীণ হইয়া উঠে। চারিদিকে আশঙ্কার সাড়া পড়িয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে ঔষধ সেবনের নিমিত্ত নিতান্ত জেদ্ করিতে থাকেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদে বড় বড় ডাক্তারেরা দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারাও রোগীর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী কিছুতেই ঔষধ সেবন করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকৃতি-জননী তাঁহাকে নিরাময় করিবেন। ফলে তাহাই হইল; কয়েক দিন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কাটাইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী উত্তরোত্তর সারিয়া উঠিলেন। তাঁহার লোকাতীত মনের বল দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর, বৃটিশ গভরমেণ্ট শত্রু-পক্ষের ষড়যন্ত্রাদি অনিষ্ট-চেষ্টা রোধ করিবার জন্য বিলাতে রাজ্যরক্ষা আইন (Defence of the Realm Act) নামে

এক কঠোর বিধান অস্থায়ীভাবে বিধিবদ্ধ করেন। তাহার অনুকরণে ভারত গভরমেণ্ট এদেশে ভারতরক্ষা আইন (Defence of India Act) এই মর্ম্মে পাশ করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে যতদিন ইচ্ছা আটক রাখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া ঐ আইন অনুসারে গভরমেণ্ট যাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিবেন, তাহাদের বিচার সাধারণ বিচারালয়ে না হইয়া তিন জন কমিশনারের সমবায়ে গঠিত স্পেশাল আদালতে নিষ্পন্ন হইবে। কমিশনের প্রদত্ত রায়ের উপর আর আপীল চলিবে না। এই আইন, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এবং তাহার পর ছয়মাস কাল বাহাল থাকিবে, এইরূপ সর্ত্তে পরিগৃহীত হয়।

ভারত-রক্ষা আইন।

আইন পাশের সময়ে সকলে মনে করিয়াছিল যে, শুধু যুদ্ধের জন্য যখন এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তখন শত্রুপক্ষের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেই উহা প্রযুক্ত হইবে—সাধারণ চুরি-ডাকাতি বা রাজনৈতিক মামলা, ঐ আইনের আমলে আসিবে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ঐ অনুমান অমূলক প্রতিপন্ন হইল। কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে বহু ব্যক্তিকে রাজদ্রোহী সন্দেহে অন্তরীণ (Intern) করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত দেশভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকে ডাকাতি মামলায় পড়িয়া স্পেশাল আদালতের বিচারে কঠোর দণ্ড লাভ

করিল। বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে পুলিশ এদেশে রাজনৈতিক হত্যা, ডাকাতি, দস্যুতা প্রভৃতি হাঙ্গামায় বড়ই বিব্রত হইয়াছিল। তাহারা এখন এই নূতন আইনের বলে হাজার হাজার যুবককে অন্তরীণ করিল। ইহার পর রাজনৈতিক হাঙ্গামা বহুল হ্রাস হইল বটে; কিন্তু সারা ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালায়—হাহাকার পড়িয়া গেল। কারণ অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্মীয় যুবকেরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও পুলিশ তাহাদিগকে বিনাপরাধে আটক রাখিয়াছে। এই শ্রেণীর আসামীগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করায়, কেহ কেহ বা উন্মাদ হওয়ায়, সংবাদ-পত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল।

রাউলাট কমিশন।

তখন গভরমেণ্ট প্রকৃত তথ্য ও তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিলাতের কিংস বেঞ্চ ডিভিসনের জজ অনারেবল মিঃ জষ্টিস্ রাউলাটের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। ১৯১৮খৃষ্টাব্দে কমিশনের সদস্যগণ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজদ্রোহের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। এই সময়ে ইউরোপে মহাযুদ্ধ শেষ হয়। কাজেই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে, ভারত-রক্ষা আইন পরিত্যক্ত হইলে, হয়ত রাজদ্রোহিগণকে আটক রাখা অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায়

গভরমেণ্ট রাউলাট কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইটী বিল * ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। এই দুইটী বিলের সাধারণ নাম—রাউলাট বিল। প্রথম বিলের স্থূলমর্ম্ম এই যে, সকৌন্সিল বড়লাট ইচ্ছা করিলে বৃটিশ ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন সময়ের জন্য ভারত-রক্ষা আইনের প্রায় অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন ; অর্থাৎ ঐ আইন বলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখিবার অধিকার প্রাদেশিক গভরমেণ্টের হাতে থাকিবে। দ্বিতীয় রাউলাট বিলের উদ্দেশ্য, ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করা। উহার মধ্যে কয়েকটী কঠোর ধারা এইরূপ,—

(১) কোন লোকের নিকটে যদি রাজদ্রোহপূর্ণ লেখা পাওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে না পারে যে, ঐ কাগজ সে কোন বৈধ উদ্দেশ্যে রাখিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(২) গভরমেণ্ট যদি কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে কোন ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব মামলায় উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ত্তমান মামলায় প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

(৩) আসামী যদি রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির সহিত মিলামিশা করে, তাহা হইলে সেই দণ্ডিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ত্তমান মামলায় প্রামাণ্যরূপে পরিগৃহীত হইবে।

---

* The Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. 1 of 1919 & the Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. 2 of 1919.

প্রথম ধারাটী সিলেক্ট কমিটীর বিচারে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু শেষোক্ত ধারাদ্বয় সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সিলেক্ট কমিটী পাশ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলদ্বয়ের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি নানা জনবহুল সহরে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহূত হইতে লাগিল। জননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন যে, প্রস্তাবিত বিলদ্বয় ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে উল্লিখিত বিল দুইটী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণ শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু গভরমেণ্ট কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল দুইটী বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে গভরমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, প্রথম আইনটী কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহা তিন বৎসর পরে পরিত্যক্ত হইবে।

ভারতের জনসাধারণ এই ব্যাপারে সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে কেহ কেহ

পদত্যাগ করিলেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠাবান জননায়ক বড়লাট ও ভারত-সচিবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন সংকল্পিত আইনে শেষ-সম্মতি না দেন। এদিকে বোম্বায়ের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট পরামর্শ-প্রার্থী হইলেন।

এবার শ্রীযুক্ত গান্ধী রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে 'সত্যগ্রহ'-শপথ প্রচার করিলেন,—

"প্রস্তাবিত বিলদ্বয় অন্যায়মূলক। উহা স্বাধীনতা ও ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের ধ্বংস সাধক। এই ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকারের উপর সমগ্র জাতির ও রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। অতএব আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, উল্লিখিত বিলদ্বয় যদি আইনে পরিণত হয়, তবে সেই আইন যতদিন না প্রত্যাহৃত হইবে ততদিন আমরা উহা নিরুপদ্রবে অমান্য করিব। উহা ছাড়া অপর যে কোন আইন অমান্য করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের কমিটী ঘোষণা করিবেন, তাহাও ভদ্রভাবে লঙ্ঘন করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই সংঘর্ষে আমরা সর্ব্বথা সত্যের অনুসরণ করিব এবং কাহারও প্রাণহানি, অঙ্গহানি বা সম্পত্তিনাশ করিব না।"

মার্চ্চ মাসে বোম্বাই অঞ্চলে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র বহুলভাবে স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে মিঃ পাটেল, মিঃ হর্ণিম্যান, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু, শ্রীমতী গান্ধী প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী

প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। মাদ্রাজে ও এলাহাবাদে লোকমতের নেতৃগণ এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সহসা চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

তখন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড সত্যগ্রহ-আন্দোলন সম্পর্কে গোপন-পরামর্শের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। বড়লাটের সহিত শ্রীযুক্ত গান্ধীর কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জানা যায় না। তবে তাহার ফল কিছুই হয় নাই। সত্যগ্রহ-আন্দোলন, হবিঃপুষ্ট হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত গান্ধী, আইন লঙ্ঘন কল্পে স্বয়ং বোম্বাই রাজপথে কয়েকখানি নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয়ে ব্রতী হইলেন। সারা ভারতে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সর্ব্বত্রই 'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল।

সত্যগ্রহ-দিবস।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে, রাউলাট আইন পাশ হইবার পরবর্ত্তী রবিবার যেন দেশবাসী জনসাধারণ উপবাস করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমতানুসারে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ দিন সত্যগ্রহ পালনের দিন বলিয়া দোকানপাট বন্ধ থাকিবে।

৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে সত্যগ্রহ পালনের দিন ভীষণ কাণ্ড বাধে। পুলিশের সহিত জনসঙ্ঘের সংঘর্ষ ফলে বহু নিরীহ নাগরিক হতাহত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ শেষে মেশিন কামান ও গোরা ফৌজ নিয়োগ করিয়া সহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই দারুণ দুর্দ্দিনে দিল্লীর মুসলমান জননায়কগণ ত্যাগবীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে স্থানীয় মসজিদে বক্তৃতার জন্য লইয়া যান। হিন্দু-মুসলমানের এমন সৌভ্রাত্র-নিদর্শন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম।

৬ই এপ্রিল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচী সিমলা, এলাহাবাদ, লক্ষ্মৌ, মূলতান, মুঙ্গের প্রভৃতি বহু স্থানে সত্যগ্রহ-দিবস মহোৎসাহে পালিত হয়। সর্ব্বত্রই দোকানপাট বন্ধ ছিল; জনসাধারণ অনশনে ভগবৎসমীপে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। হিন্দুর মন্দিরে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি এবং মুসলমানের মসজিদে নামাজ ও প্রার্থনা যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। এদিন যান-বাহনাদির ব্যবহার প্রায় কেহ করেন নাই। হাজার হাজার নাগরিক অপরাহ্নে সার্ব্বজনিক সভায় সমবেত হইয়া রাউলাট আইনের প্রতিবাদে সুদৃঢ় মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানান যে, তাঁহারা যেন ঐ আইন অচিরে রদ্ করিয়া দেন। এই দিন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—মারাঠী, মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাটী—মহাত্মা গান্ধীর ইঙ্গিতে একই পথে ছুটিয়াছিল।

৯ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাই হইতে দিল্লী রওনা হন। পঞ্জাব গভরমেণ্ট তাঁহাকে পথিমধ্যে ট্রেণে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বায়ে পুনঃ প্রেরণ করেন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাকে

জানান হয় নাই যে, কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে। কর্ম্মবীর গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, এই সংবাদে কলিকাতায়, আমেদাবাদে ও পঞ্জাবে অশান্তির দাবানল সহসা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে। বড় বড় সহরে 'হরতাল' ঘোষিত হয়। ১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে একটা ঘোর অনর্থকর আশঙ্কার আলোড়ন—অচিন্ত্যপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের প্রচণ্ড স্পন্দন—সারা হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িদ্বেগে বহিয়া যায়। পঞ্জাবের হাঙ্গামা প্রকাশ্য রাজদ্রোহ বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। কলিকাতা ও আমেদাবাদের দুর্ঘটনাও বড় সামান্য নহে। উভয় স্থলেই অনেক নিরস্ত্র নাগরিক গোরা ফৌজের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে। কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্জাবে ও আমেদাবাদে সামরিক আইন (Martial Law) জারি করিয়া কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনে ব্রতী হন। অশিক্ষিত জনসঙ্ঘ সত্যগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া বৃথা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইতেছে—অনর্থক প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে—দেখিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী সত্যগ্রহ আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখেন এবং ঘোষণা করেন যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রায়শ্চিত্তকল্পে তিনি নিজে তিনদিন অনশনে কাটাইবেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় হাঙ্গামাকারিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন,—

হরতাল।

"আমার গ্রেপ্তার জন্য কেন এত উত্তেজনা—এত চাঞ্চল্য—উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। ইহা ত 'সত্যগ্রহ' নহে—ইহা যে দুর্গ্রহেরও

অধিক! যাহারা সত্যগ্রহ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও অন্যের প্রতি বল প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য—তাহারা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ প্রভৃতি অকার্য্য হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই বোম্বাই সহরে আমাদের লোকেরা কি করিতেছে? তাহারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে, ট্রামগাড়ী হইতে লোককে নামাইয়া দিতেছে এবং নানারূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে! ইহা সত্যগ্রহ নহে।”

ইহার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়। পঞ্জাবের ব্যাপারই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে এমন গুরুতর হাঙ্গামা আর কখনও ঘটে নাই। দেশবন্ধু গান্ধীর গ্রেপ্তার সংবাদে উত্তেজিত জনসঙ্ঘ অমৃতসর ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কে আগুন ধরাইয়া, স্থানে স্থানে রেল-পথ, রেলের পুল ও রেল-ষ্টেশন ভাঙ্গিয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া এবং কোন কোন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর উপর অযথা নির্যাতন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের রোষবহ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল।

পঞ্জাব-হাঙ্গামা।

ইহার প্রতিশোধে জেনারেল ডায়ার প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগের নিদারুণ কাহিনী ভারতবাসীর স্মৃতিপটে চিরদিন রক্তাক্ষরে মুদ্রিত রহিবে। পঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্তের নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিযুক্ত হাণ্টার-কমিটির সম্মুখে জেনারেল

‘ডায়ারী’-লীলা।

ডায়ার স্বমুখে স্বীকার করেন যে, জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগের সভায় সমবেত অন্যূন পাঁচ হাজার নিরস্ত্র নাগরিকের উপর সহসা গুলিবর্ষণ করিতে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন। গুলিবর্ষণের পূর্ব্বে নাগরিকগণকে স্থান ত্যাগ করিতেও বলা হয় নাই। ফলে ৮।১০ মিনিটের মধ্যে পাঁচশত লোক নিহত ও দেড় হাজার লোক আহত হয়। সৈনিকগণের তোজদানে টোটা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাইয়াছিল। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর হতাহত ব্যক্তিগণের সৎকার বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা আদৌ করা হয় নাই। জেনারেল ডায়ার হাণ্টার কমিটীর সম্মুখে এই সকল কথা সগর্ব্বে খ্যাপন করিয়া বলেন যে, লোকে যাহাতে কখনও না ভুলে এমন একটা নৈতিক ছাপ (moral impression) সাধারণের মনে চিরমুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই তিনি কঠোর হস্তে দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে বৃটিশ-রাজের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের ক্রুটি ত হয়ই নাই, বরং তিনি ঠিক কাজ করিয়াছেন বলিয়া সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

পঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট স্যার মাইকেল ও'ডায়ার এই নৃশংস কাণ্ডের সমর্থন করেন। শুধু ইহাই নহে—গুজরণওয়ালায় ও খালসা কলেজে উড়োজাহাজ হইতে নিরীহ ব্যক্তিগণের উপর বোমা ফেলা, অমৃতসরের রাজপথে পথিকগণকে বুকে হাঁটিতে বাধ্য করা, স্থানে স্থানে অসহায়া রমণীগণের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন, পুরুষদিগকে প্রকাশ্য

স্থানে বার-বনিতাদের সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া বেতমারা, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে প্রত্যহ প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিবার সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া গোরা-বারিকে হাজিরা দিতে এবং কোথাও কোথাও কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করা, সম্ভ্রান্ত উকীল-ব্যারিষ্টারদিগকে স্পেশাল কনষ্টেবল করা, তাঁহাদিগকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করা—এমন কি কোন কোন স্থানে তাঁহাদের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া রাজপথে ঘুরাইয়া বেড়ান এবং পরিশেষে জননায়কগণকে দলে দলে দ্বীপান্তরে বা কারাগারে পাঠান—এই সকল রোমাঞ্চকর কঠোর শাস্তির নিষ্পেষণে পঞ্চনদের অধিবাসিগণ মথিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছিল। তৎকালে পঞ্জাবে দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তারা সামরিক-শাসনের নামে যে প্রচণ্ড প্রতিহিংসানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বুঝি সপ্ত সমুদ্রের জলেও নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

প্রচণ্ড শাসন।

পঞ্জাব গভরমেণ্ট এ সব সংবাদ যাহাতে বাহিরে প্রকাশ না হয়, সে জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাঙ্গামা-স্থলে সামরিক আইন (Martial Law) জারি হইয়াছিল। অন্য প্রদেশের সংবাদ-পত্র প্রতিনিধিগণকে এবং ব্যারিষ্টারদিগকে সে সময়ে পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ড্রুজ প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য তথায়

সংবাদ-রোধ।



কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ



মৌলানা মহম্মদ আলি

যাইতে চাহিলে, তাঁহাকেও ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হয় নাই। পরে ভিতরের ব্যাপার গুরুতর জানিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পঞ্জাব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ছোটলাট ও'ডায়ারের খাসমুন্সী মিঃ টম্‌সন অভদ্রভাবে তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময়ে পঞ্জাব গভরমেণ্টের কৃত অনাচারের প্রতিবাদে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্যার' পদবী পরিত্যাগ করিলেন এবং ভারত গভরমেণ্টের শাসন-পরিষদের একমাত্র দেশীয় সদস্য স্যার শঙ্করণ নায়ার পদত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ভারতে ও বিলাতে সংবাদপত্র-সমূহে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা পঞ্জাব-হাঙ্গামার তদন্তের নিমিত্ত লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে এক তদন্ত-কমিটী নিয়োগ করিলেন। এই তদন্ত-কমিটীতে পণ্ডিত জগৎনারায়ণ প্রমুখ তিন জন ভারতীয় সদস্যও স্থান পাইয়াছিলেন। জাতীয় দলের পক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রার্থনা করিলেন যে, যে সকল লোককে কারাগারে বা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সাক্ষ্য স্বাধীনভাবে গ্রহণ করা হউক; অর্থাৎ তাঁহারা যাহাতে সকল সত্য নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে সাহসী হন, তজ্জন্য এই সর্ত্তে সমন মঞ্জুর করা হউক যে, তাঁহারা যে কয়দিন সাক্ষ্য দিবেন সে কয়দিন অস্থায়ীভাবে মুক্তি পাইবেন। কর্ত্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মত

হাণ্টার কমিটী।

হইলেন না। শ্রীযুক্ত গান্ধী দেখিলেন যে, শুধু সরকারী সাক্ষীদের মুখে সকল সত্য উদ্ঘাটনের আশা বৃথা। কাজেই তিনি ঘোষণা করিলেন যে, দেশবাসীর পক্ষে কেহ হাণ্টার কমিটীতে সাক্ষ্য দিবেন না। ইহাই অনুগ্র অসহযোগ (Non-violent Non-co-operation) আন্দোলনের উদ্বোধন।

কংগ্রেসের তদন্ত।

এদিকে কংগ্রেস সব্-কমিটীর পক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ জননায়কগণ পৃথক তদন্তে ব্রতী হইলেন। উভয় তদন্তের রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেশবাসী জনসাধারণ বিস্ময়ে, ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। দেশব্যাপী এই প্রবল চাঞ্চল্যের তরঙ্গ ক্রমশঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার তটপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। সেখানকার অনেক নিরপেক্ষ সজ্জন ব্যক্তি সবিস্ময়ে বলিলেন,—'একি! এযে জর্ম্মণ-বর্ব্বরতারও অধিক!'

তদন্তের ফলাফল।

কংগ্রেস সব্-কমিটির প্রকাশিত বহু অত্যাচার-কাহিনীই হাণ্টার-কমিটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা জেনারেল ডায়ারকে স্পষ্টভাবে দায়ী সাব্যস্ত করিলেন না; অধিকন্তু ছোটলাট স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের অজস্র সুখ্যাতি তাঁহাদের রিপোর্টে মুখরিত হইল। অবশ্য হাণ্টার-কমিটীর দেশীয় সদস্যগণ এ-রায়ে রায় দেন নাই; কিন্তু তাঁহারা যে সংখ্যায় কম! ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু হাণ্টার-কমিটীর রিপোর্ট

পাঠ করিয়া জেনারেল ডায়ারের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ছোটলাট ও'ডায়ার ও বড়লাট লর্ড চেম্‌স-ফোর্ডের সম্বন্ধে তিনিও উচ্চ প্রশংসা-পত্র লিখিয়া দিলেন।

জেনারেল ডায়ারের সম্বন্ধে ভারত-সচিবের কঠোর মন্তব্য পাঠ করিয়া এদেশের অনেক শ্বেতাঙ্গ মহিলার কোমল প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠিল—তাঁহারা ডায়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্য চাঁদা সংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে ভারতের শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত প্রায় সমস্ত সংবাদ-পত্রেই ডায়ারের জন্য করুণার উৎস উচ্ছ্বসিত হইল। অনেকে ডায়ারকে পঞ্জাবের—এমন কি ভারতের—রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

অন্যদিকে দেশীয় সংবাদ-পত্রসমূহে জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এমন কি বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে অবিলম্বে বিলাতে ফিরাইয়া লওয়া হউক, এরূপ প্রস্তাবও অনেকে নির্ব্বন্ধ-সহকারে উত্থাপন করিতেছিলেন।

পার্লামেণ্টে আলোচনা।

অবশেষে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় অধিকাংশ সদস্যের মতে জেনারেল ডায়ার দোষী বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাঁহার পক্ষ-সমর্থনকারী সদস্যগণ বক্তৃতার মুখে এমন তীব্র ভারত-বিদ্বেষের হলাহল উদ্গীরণ করিলেন যে, ভারতবাসীর হৃদয়ে সুবিচারের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইল। তাহার পর লর্ড সভায় অধিকাংশ

সদস্যের মতে জেনারেল ডায়ার সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

বিলাতে সমর-বিভাগের বিচারে জেনারেল ডায়ার দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন বটে ; কিন্তু দণ্ডস্বরূপ তাঁহাকে প্রচুর পেন্সন দিয়া সরকারী কার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' সংবাদ-পত্র জেনারের ডায়ারের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে প্রভূত অর্থ সংগৃহীত ও পঞ্জাব-কীর্ত্তির পুরস্কার স্বরূপ তাহা জেনারেল ডায়ারের হস্তে ন্যস্ত হইল। ফলে জেনারেল ডায়ার দেখিলেন, তাঁহার ভাগ্যে শাপে বর!

ডায়ারের শাপে বর।

পক্ষান্তরে ইউরোপে মহাযুদ্ধ অবসানের পর খেলাফৎ-সমস্যা লইয়া ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তুরস্কের (রুমের) বাদসাহ মুসলমান-জগতের ধর্ম্মগুরু—ধর্ম্মের রক্ষক—প্রতিপালক। যুদ্ধের সময় বৃটিশ গভরমেণ্টের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণের ধর্ম্মভাবে যাহাতে আঘাত লাগে, এমন কোন ব্যবস্থা তুর্কীর সম্বন্ধে করা হইবে না। ফলে ভারতের মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত চিত্তে বৃটিশরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সন্ধিসর্ত্তে তুর্ক-সাম্রাজ্যটীকে খণ্ড খণ্ড করায়, উহার অধিকাংশ স্থান অ-মুসলমান রাজশক্তির হস্তে

খেলাফৎ-সমস্যা।

ন্যস্ত হওয়ায় এবং তুর্ক-সুলতানের পার্থিব ক্ষমতা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর নির্দ্দেশক্রমে কর্ম্মবীর মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিলাতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না।

তখন বহু ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় মুসলমান দেশত্যাগ করিয়া আফগানিস্থান অভিমুখে রওনা হইলেন। এইরূপে বৃটিশ গভরমেণ্টের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করার পক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বৃটিশরাজের প্রদত্ত সম্মান পদক প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে আগষ্ট মাসে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখেন,—

মহাজরিন্।

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সেবা-কার্য্যের জন্য আপনার পূর্ব্ব পদাধিকারী আমাকে যে কৈশার-ই-হিন্দ স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলুযুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ ভলাণ্টিয়ার সার্ভিস কোরে'র কর্ম্মচারীর কাজের জন্য আমাকে যে পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের সময় 'ইণ্ডিয়ান্ ভলাণ্টিয়ার ষ্ট্রেচার-বেয়ারার' দলে এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে যে পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল, আজ আমি ব্যথিত হৃদয়ে সে সকল প্রত্যাখ্যান করিতেছি। খেলাফৎ-আন্দোলন সংস্রবে যে অসহযোগ-নীতি পরিগৃহীত হইয়াছে,

তদনুসরণেই আমি এই পদকগুলি ফেরৎ পাঠাইতে সাহসী হইয়াছি। এই সম্মান-নিদর্শনগুলি আমার পক্ষে মূল্যবান্ হইলেও, আমার দেশবাসী মুসলমানগণের ধর্ম্মভাবের প্রতি প্রযুক্ত অন্যায় ব্যবহারের ফলে যতদিন তাঁহারা কষ্ট পাইবেন, ততদিন আমি স্বচ্ছন্দ জ্ঞানে ইহা ধারণ করিতে পারিব না। গত মাসের ঘটনায় আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, খেলাফৎ-সমস্যা সম্বন্ধে বৃটিশ গভরমেণ্ট বিবেকহীন, অসাধু ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই অসাধুতার সমর্থন করিতে গিয়া ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় অন্যায় আচরণ করিতেছেন। এমন গভরমেণ্টের জন্য আমি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কিছুই পোষণ করিতে পারি না। পঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে বৃটিশ গভরমেণ্টের এবং আপনার গভরমেণ্টের ভাব দেখিয়া আমি আরও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংঘটিত পঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কংগ্রেস-কমিশন বসিয়াছিল, আমি তাহার একজন সদস্য ছিলাম, ইহা আপনার অবিদিত নহে। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে—স্যার মাইকেল ও'ডায়ার পঞ্জাবের ছোটলাট পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন এবং তাঁহার শাসন-নীতিই অমৃতসরে জনসঙ্ঘের ক্রোধ উদ্রেকের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। অবশ্য, জনসঙ্ঘ যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। তাহারা যে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, পাঁচজন ইংরাজকে খুন করিয়াছিল এবং কাপুরুষের মত মিস্ সেরউড্কে প্রহার করিয়াছিল—এসব বড়ই শোচনীয় ব্যাপার এবং খুবই বাড়াবাড়ি কাণ্ড। কিন্তু জেনারেল ডায়ার, কর্ণেল ফ্রাঙ্ক জনসন, কর্ণেল ওব্রায়েন, মিঃ বস্ওয়ার্থ-স্মিথ, রায় শ্রীরাম সুদ, মিঃ মালিক খাঁ ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সব কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহা জনসঙ্ঘের অপরাধের তুলনায় বহু পরিমাণে অধিক ; এমন কি, তাহাকে নৃশংস

নিষ্ঠুরতা এবং অমানুষিক বর্ব্বরতা বলা যাইতে পারে। এমন ব্যাপার অধুনা প্রায় দেখা যায় নাই।

আপনি সরকারী কর্ম্মচারীদের অপরাধ সম্বন্ধে যে লঘু ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন, স্যার মাইকেল ও'ডায়ারকে যে একেবারে দোষমুক্ত বলিয়া দিয়াছেন, মিঃ মণ্টেগু যে ডেসপ্যাচ্ পাঠাইয়াছেন, পঞ্জাবের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে লজ্জাজনক অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, লর্ড সভা ভারত-বাসীর অনুরোধ-উপরোধের প্রতি ও তাহাদের মনোভাবের প্রতি যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহাতে আমার মনে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গুরুতর অপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। কাজেই আমি বর্ত্তমান গভরমেণ্ট হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি; এ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপ সহযোগিতা করিয়াছি, আর সেরূপ করিতে আমাকে অসমর্থ করিয়া ফেলিয়াছে। ভারত গভরমেণ্ট তাঁহার প্রজাবর্গের হিতসাধনে যেরূপ নৈরাশ্যজনক উদাসীনতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমার মতে ঐরূপ গভরমেণ্টের অনুশোচনার উদ্রেক করিতে হইলে—আবেদন, নিবেদন বা প্রতিনিধি প্রেরণাদি সাধারণ উপায় অবলম্বন সঙ্গত নহে।

ইউরোপে খেলাফৎ বা পাঞ্জাব ব্যাপারের মত অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিলে, ঘোর প্রজাবিপ্লব উপস্থিত হইত। এই ভাবের অকার্য্যে যে জাতীয় ক্লৈব্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা তাহারা কখনই সহ্য করিত না—যে কোন প্রকারে হউক, তাহার প্রতিরোধ করিত। কিন্তু ভারতের অনেক লোক এতই দুর্ব্বল যে, তাহারা ঐরূপ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে; অপর অর্দ্ধেক লোকের ঐরূপ প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছাই হয় না। এই জন্যই আমি সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। যাঁহারা সত্য-সত্যই গভরমেণ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এবং নিরুপদ্রবে

ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইলে ইহা দ্বারাই সব অন্যায়-অকার্য্যের সংশোধন সম্ভব হইবে। তবে, আমি যতক্ষণ আমার সাধ্যমত লোকজনকে আমার মতে রাজী করিয়া এই অসহযোগ-নীতি অনুসরণ করিতে থাকিব, ততক্ষণ এ আশাও ছাড়িব না যে, আপনিও ন্যায়-বিচারের চেষ্টা করিবেন। অতঃপর আমি আপনাকে জনসাধারণের স্বীকৃত নেতাদিগকে লইয়া একটী কন্‌ফারেন্স করিতে অনুরোধ করি এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে মুসলমানদের সন্তোষ সাধনের ও পঞ্জাবীদের ক্ষতিপূরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য—
এম. কে. গান্ধী।

এবার মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত অনুগ্র অসহযোগ-নীতি সারা ভারতে একটা নূতন সাড়া আনিয়া দিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় কংগ্রেস মহাসভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহার বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির বৈঠকে আসমুদ্র-হিমাচলের দেশমান্য নেতৃগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুগ্র অসহযোগ প্রস্তাবের * পক্ষে ও বিপক্ষে দুইদিন ধরিয়া তুমুল বিচার-বিতর্কে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সারা ভারত যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কংগ্রেসের অভিমত জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবে এমন উৎকণ্ঠা—এমন সার্ব্বজনীন ঔৎসুক্য—দেখা যায় নাই।

কংগ্রেসে অসহযোগ।

* মূল প্রস্তাবটী পরিশিষ্টে 'কংগ্রেসে অসহযোগ' শীর্ষক অনুবন্ধে দেখুন।

অবশেষে প্রস্তাবটী অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে পরিগৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটী পুনরায় ডিসেম্বর মাসে (১৯২০) নাগপুর কংগ্রেসে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে পরিগৃহীত হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন উল্লেখ-যোগ্য। সুরাটের দক্ষযজ্ঞ পালার পর গোখলে, মেটা প্রমুখ নেতৃগণ কংগ্রেসের কয়েকটা মূলমন্ত্র (Creed) বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতেন, তাঁহাদিগকে সেই মূল-মন্ত্র প্রথমে বিনা বিচারে মানিয়া লইতে হইত। তাহার মধ্যে একটী এই যে, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভই চরম লক্ষ্য। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই সংকীর্ণ মত বদলাইয়া কংগ্রেসের নূতন মন্ত্র (Creed) নির্দ্দেশ করিলেন,—বৈধ ও নিরুপদ্রব ভাবে স্বরাজ্য লাভ।

কংগ্রেসের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যাও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত যে কোন স্থান হইতে যত ইচ্ছা প্রতিনিধি কংগ্রেসে উপনীত হইতে পারিতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস স্থির করেন যে, অতঃপর প্রতি পঞ্চাশ হাজার ভারতবাসী একজন করিয়া প্রতিনিধি কংগ্রেসে পাঠাইতে পারিবেন। ফলে ভারতের লোকসংখ্যা অনুসারে মোট ছয় হাজারের অধিক প্রতিনিধি কংগ্রেসে স্থান পাইবেন না। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের হৃদয়ের যোগ অতি অল্পই স্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের নেতারা বৎসরান্তে বারোয়ারির মত স্থানে স্থানে দেশ-মাতৃকার আবাহন করিয়া তিন দিন উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিতেন; তাহার পর সারা বৎসর একরূপ অবসাদেই কাটিয়া যাইত। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচালনায় কংগ্রেসের সে জড়তা ঘুচিয়াছে। অনুগ্র অসহযোগের যে মহামন্ত্র কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে দেশের মধ্যে কার্য্যকরী হয়, তজ্জন্য অধুনা বহুল চেষ্টা চলিতেছে। নাগপুরে কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তথায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়। পরে ৩১শে জানুয়ারি হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (১৯২১) পর্য্যন্ত কলিকাতায় উক্ত কমিটীর আর এক অধিবেশন করাইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী দেশমান্য নেতৃগণের পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর এক খসড়া প্রস্তুত করেন।

কার্য্যক্ষেত্রে অসহযোগ।

অসহযোগের প্রস্তাব কংগ্রেসে পরিগৃহীত হওয়ার পর প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ-প্রার্থী জাতীয় দলভুক্ত অনেক সম্ভ্রান্ত সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠবান ব্যবহারাজীব আইনের ব্যবসায় বর্জ্জন করিলেন। ইহাঁদের

মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা আইন-ব্যবসায় বর্জ্জন করিয়া যে বিপুল ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিবে। ইহাঁদের আদর্শে কলিকাতায় ও মফস্বলে হাজার হাজার ছাত্র ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিবে বলিয়া স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আইসে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরে বিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কমিয়া যায়, ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেনেট সভায় সদুঃখে জ্ঞাপন করেন।

ছাত্র-সমাজে হুলস্থূল।

কলিকাতার ছাত্রগণ দেশের আহ্বানে দলে দলে স্কুল-কলেজ ছাড়িতেছে শুনিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি সহ ঝটিতি কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি ৮।১০ দিন ধরিয়া কলিকাতার নানা স্থানে লক্ষ লক্ষ উৎকর্ণ শ্রোতার সম্মুখে এই উপদেশ পুনঃ পুনঃ প্রচার করেন যে, স্বদেশের কল্যাণকল্পে গৃহে গৃহে চরকায় সূতা কাটার ব্যবস্থা করা, হিন্দী-ভাষা শিক্ষা করা, সর্ব্বপ্রকারে উগ্রতা পরিহার করা, জাতীয় তহবিলে অর্থ

সাহায্য করা, কায়মনোবাক্যে স্বদেশী-ব্রত পালন করা, এবং সরকারী সংস্রব সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সব সঙ্কল্প পালন করিলে আর নয় মাসের মধ্যে স্বরাজ আসিবেই আসিবে।

স্কুল-কলেজ ত্যাগী ছাত্রগণকে তিনি এই কয়টী শিক্ষা প্রদান করেন,—

১। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু অন্যায় ব্যবহার ও বলপ্রয়োগ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে।

২। অসহযোগের আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

৩। স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিলেও গৃহে পাঠ ত্যাগ করিবে না। যে সকল পুস্তক পাঠে স্বদেশ-প্রীতি জন্মে এবং চিন্তাশীলতার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ পুস্তক পড়িবে। নিয়মিতরূপে সংবাদ-পত্র পড়িবে। জ্ঞানলাভের জন্য শুধু বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিবে না।

৪। মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করিবে।

৫। চরিত্রবল ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। চরিত্রহীন ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইবে, দুর্গতিও তত বাড়িবে। অতএব হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলিকে সুপরিচালিত কর।

৬। এ কর্ম্মযোগের দিনে, কর্ম্মের সাধনভূত শক্তির সাধনা কর। ইস্পাতের মত দৃঢ় শরীর চাই, বাবুগিরীর শরীরে কোন কাজ হইবে না। স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া শরীরটাকে তৈয়ারী কর।

৭। পরিশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা কর। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া বৃথাভিমান করিও না। মনে রাখিও, এ অভিমান পরাধীনতারই নামান্তর। এ পৃথিবীতে সব কাজই সমান। কর্ম্মী কখনও কর্ম্মের ছোট বড় বিবেচনা করেন না।

৮। রেল-ষ্টীমারে যাতায়াত করিতে হইলে তৃতীয়শ্রেণীতে যাইবে। সামর্থ্য থাকিলেও উচ্চতর শ্রেণীতে যাতায়াত করিবে না।

৯। গভরমেণ্টের চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করিয়া দেশের উন্নতি করিবে। রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তবে ব্যবসায়ে হাত দিবে।

১০। কষ্টসহিষ্ণু হও; বিলাসিতা ত্যাগ কর; আরামপ্রিয়তা ছাড়িয়া দাও। আরামপ্রিয়তা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঘোর শত্রু।

১১। দেশের স্বার্থে নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও। পশুর ন্যায় নিজ শরীরটী লইয়া ব্যস্ত রহিও না। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর এবং তাহা দেশের কাজে নিয়োজিত কর।

১২। স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ কর। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়-চোপড় পরিয়া সুখী হও। বিদেশী দ্রব্যে বাবু সাজিও না। কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া, এ হত দরিদ্র দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইও না।

কলিকাতায় ডিউক।

এই সময়ে, ২৮শে জানুয়ারি তারিখে, ভারত-সম্রাটের পিতৃব্য ডিউক-অব্-কনট মহোদয় সম্রাটের নির্দ্দেশ ক্রমে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্ত কলিকাতায় পদার্পণ করেন। কর্ম্মবীর গান্ধীর পরামর্শে সর্ব্বসাধারণকে ডিউকের অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে নিষেধ করা হয়। ফলে, ঐ দিন

প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্নে ৩টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছোট-বড় সমস্ত দোকানপাট, হাট-বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কলিকাতায় এমন অভাবনীয় একতা আর কখনও দেখা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত গান্ধী ডিউক মহোদয়কে অনুগ্র অসহযোগ সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেন তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

আপনি অসহযোগ সম্বন্ধে, অসহযোগীদের সম্বন্ধে, তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ-নীতির প্রবর্ত্তক এই অধমের সম্বন্ধে অনেক কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন। আমার অশঙ্কা এই যে, এ সম্বন্ধে আপনাকে যে সকল সংবাদ শুনান হইতেছে, তাহা এক পক্ষের কথা। সুতরাং আপনার প্রতি, আমার বন্ধুবর্গের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনার্থ আমাদের পক্ষ হইতে অসহযোগের উদ্দেশ্য আপনার নিকট বিবৃত করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি। আমি ও আমার অনুরক্ত বন্ধু সওকৎ আলি এবং মহম্মদ আলি, এই ভাবের অসহযোগ-নীতি অনুবর্ত্তন করি।

আপনার আগমন উপলক্ষে জনসাধারণকে আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া আমি আদৌ আনন্দ বা তৃপ্তি বোধ করি নাই। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি রাজভক্ত প্রজার ন্যায় গভরমেণ্টের সহিত স্বেচ্ছায় সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ উপায়েই আমার দেশ স্বাধীন হইবে। সুতরাং দেশবাসী জনসাধারণকে আপনার অভ্যর্থনায় যোগ দিতে নিষেধ করা, আমাদের পক্ষে কম কষ্টকর নহে। আপনি একজন ইংরাজ ভদ্রলোক, এই হিসাবে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কাহারও কিছু বলিবার নাই। আপনার অঙ্গ আমাদের চক্ষে প্রিয়তম বন্ধুর অঙ্গের ন্যায় পবিত্র। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই,

যে প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন দিয়াও আপনাকে রক্ষা না করিবে। ইংরাজের প্রতি ব্যক্তিগত হিসাবে আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই ইংরাজদের বিনাশ করিতে আমরা চাহি না। কিন্তু যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের দেহ, মন, ও আত্মাকে ক্লীবত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহা বিনাশ করিতে আমরা চাহি। ইংরাজ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে ভাবের ফলে পঞ্চনদে ও'ডায়ারী ও ডায়ারী-লীলা সম্ভব হইয়াছে—যে ভাবের ফলে সাতকোটী ভারতবাসীর সেবিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের ঘোর অবমাননা করা হইয়াছে—সেই ভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়া সংগ্রাম করিতে আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি। প্রধান মন্ত্রীর প্রচারিত পবিত্র ঘোষণা-বাণীর ভাব ও ভাষা লঙ্ঘন করিয়া এই অবমাননা করা হইয়াছে। যে প্রাধান্য ও আধিপত্যের ভাব এতদিন অনেক গুরুতর বিষয়ে ত্রিশ কোটী নিরীহ ভারতবাসীর মনোভাবকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে, তাহা তাহা আর সহ্য করা আমাদের আত্ম-সম্মানের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেছি। ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারী অনুক্ষণ একলক্ষ ইংরাজের নিকট প্রাণভয়ে অবনত ও বশীভূত হইয়া থাকিবে, ইহা আমাদের পক্ষে হীনতার দ্যোতক এবং আপনার পক্ষেও গর্ব্বের বিষয় নহে।

উপরে যে শাসন-পদ্ধতির কথা বলিলাম, উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে আপনি আসেন নাই; পরন্তু উহার সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছেন। আপনার প্রথম বক্তৃতা, লর্ড উইলিংডনের নিছক্ প্রশংসাবাদ। আমি তাঁহাকে জানি; তিনি ইচ্ছা করিয়া একটী মক্ষিকাকেও আঘাত করিবেন না। কিন্তু শাসন-কার্য্যে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাহাদের স্বার্থ, তাহাদের দ্বারাই তিনি পরিচালিত হইয়াছেন। দ্রাবিড় দেশের জনসাধারণের মনোভাব তিনি বুঝিতেছেন না। বাঙ্গালায় আসিয়াও আপনি এখানকার

গভর্ণরকে প্রশংসা-পত্র দিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার অন্তরের কথা—বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা—কি, তাহা জানেন না। বাঙ্গালা বলিতে শুধু কলিকাতা সহর বুঝায় না। ফোর্ট উইলিয়ম ও তাহার চারিদিকে যে সৌধশ্রেণী দেখিতেছেন, ইহা এই বাঙ্গালা দেশের অতীব ভদ্র ও নিরীহ কৃষকগণের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যে শাসন-সংস্কার, ভারতের দুর্দ্দশা ও অপমানের উপর একটা রাঙ্‌ঝাল দিতেছে মাত্র, তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই প্রতারিত হইবেন না, ইহাই অসহযোগীদের সিদ্ধান্ত। তাই বলিয়া তাঁহারা অধীর বা ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমরা অধৈর্য্যমূলক ক্রোধের বশে নির্ব্বোধের মত হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইব না। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আমাদের যতটুকু নিন্দা প্রাপ্য তাহা আমরা লইতে প্রস্তুত। আমরা যে এতটা পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি, ইহার হেতু, ইংরাজের কামান অপেক্ষা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যই বেশী।

আপনার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত কোনরূপ শত্রুতা আছে বলিয়া যে আমরা আপনার অভ্যর্থনায় যোগ দিই নাই, ইহা ঠিক নহে। আপনি যে শাসন-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আসিয়াছেন, সেই শাসন-পদ্ধতির সহিতই আমাদের যত বিরোধ। আমি জানি যে, ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলেও ব্যক্তিগত চরিত্র সহসা বদলাইতে পারিবেন না। আমরা ইংরাজের সমান হইতে যদি বা না পারি—তাঁহাদের ভয় পরিহার করিবই। আমরা যে গভরমেণ্টের সংশোধন না হইলে, বিলাপ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, সেই গভরমেণ্টের বিদ্যালয়, আদালত, আশ্রয় ও অভিভাবকতা পরিহার করিয়া আত্ম-নির্ভরতা শিখিব। এই জন্যই অনুগ্র অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমি জানি, আমরা সকলে

এখনও কথায় ও কাজে উগ্রতা-রহিত হইতে পারি নাই—কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত জানাইতেছি যে, এ পর্য্যন্ত ইহাতে অতি বিস্ময়কর ফল দেখা দিয়াছে। লোকে ইহার গূঢ় রহস্য এখন যেরূপ বুঝিয়াছে, এমন আর কখনও বুঝে নাই। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্ম সম্পর্কিত আত্মশুদ্ধিমূলক আন্দোলন। আমরা মদ্যপান ও জল-অনাচরণীয়তা বর্জ্জন করিতেছি। বিদেশী জাঁকজমকপূর্ণ বিলাস-দ্রব্য দূরে ফেলিতেছি; চরকা প্রবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন কবি-কথিত সরলতাকে বরণ করিতেছি। এইরূপে আমরা বর্ত্তমান অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ফল করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমি অনুরোধ করিতেছি যে, ইংরাজ ভদ্রলোকরূপে আপনি এই আন্দোলনের বিষয় অনুধাবন করুন এবং ইহা পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর ও পৃথিবীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে—বুঝিয়া দেখুন। পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল, তাহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই। আমরা যে ভাবে ইসলাম ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছি, তাহাতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই রক্ষিত হইবে। ভারতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া আমরা সমগ্র মানব জাতির সম্মান রক্ষা করিতেছি। আমাদের অবলম্বিত উপায় কাহারও হানিকর নহে। ইংরাজের সহিত বন্ধুভাবে আমরা থাকিতে চাহি; কিন্তু সেই বন্ধুত্ব কথায় ও কাজে সমকক্ষতা-সূচক হওয়া চাই। যতদিন না আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন সহযোগিতা-বর্জ্জন করিতে অর্থাৎ আপনাদিগকে পবিত্র করিতে আমরা বিরত থাকিব না। অসহযোগীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনি ও আপনার মারফতে প্রত্যেক ইংরাজ উপলব্ধি করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।

আপনার অনুগত ভৃত্য—

এম, গান্ধী।

এই পত্রখানি পাঠ করিলে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অনুগ্র অসহযোগ-নীতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও উদ্দেশ্য অতি সহজে উপলব্ধি হয়। তিনি এযাত্রা কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্কয়ারে ন্যাশান্যাল কলেজের দ্বার উন্মোচন করেন। এই সময়ে মহাপ্রাণ গান্ধীর আদেশে কলিকাতায় ও বেহার অঞ্চলে অনুন্নতশ্রেণীর মদ্যপগণ একযোগে সুরাপান ত্যাগ করিতে থাকে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মাদ্রাজের অন্তর্গত বেজোয়াদা সহরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়।

বেজোয়াদা কন্‌ফারেন্স।

তাহাতে শ্রীযুক্ত গান্ধীর প্রস্তাবে স্থির হয় যে, কংগ্রেসের কাজের জন্য ৩০শে জুন তারিখের পূর্ব্বে (১) তিলক স্বরাজ ফণ্ডে এককোটী টাকা সংগ্রহ করা চাই; (২) কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা এককোটী হওয়া চাই এবং (৩) সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে অন্ততঃ বিশ লক্ষ চরকা চালান চাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই তিনটি দাবী পূরণ হওয়া অসম্ভব—বিশেষতঃ কংগ্রেসের নামে এক কোটী টাকা সংগ্রহের আশা বাতুলতা মাত্র—এইরূপ মন্তব্য সে সময়ে শত্রু-মিত্র অনেকেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণের উপর মহাত্মা গান্ধীর এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সকল দাবী যেন যাদুমন্ত্রে পূরণ হইয়া গেল। শত্রু-মিত্র সকলেই স্তম্ভিত হইয়া একবাক্যে বলিল,—'ভারতে গান্ধী অদ্বিতীয়।'

মে মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে শ্রীযুক্ত গান্ধী নূতন বড়লাট লর্ড রেডিঙের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সিমলা গমন করেন। তথায় উপর্য্যুপরি তিনদিন ধরিয়া বড়লাটের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; কিন্তু কোন সুফল হয় নাই। বরং শ্রীযুক্ত গান্ধী পরে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি না গেলেই ভাল করিতেন।

লর্ড রেডিঙের সহিত সাক্ষাৎ।

যাহা হউক উল্লিখিত ঘটনার পর শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুরোধে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের প্রদত্ত কয়েকটি উদ্ধত বক্তৃতার জন্য প্রকাশ্যভাবে ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, যতদিন তাঁহারা অসহযোগ-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত থাকিবেন, ততদিন বল প্রয়োগের সমর্থন করিবেন না। অতঃপর গভরমেণ্ট 'কমিউনিক্' প্রকাশ করিয়া জানান যে, আলি-ভ্রাতৃদ্বয় স্বেচ্ছায় ত্রুটি স্বীকার না করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু হইত।

জুলাই মাসের প্রথমাবধি শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বায়ে বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। তিনি বিদেশী-বস্ত্রের ব্যবসাদারদিগকে বকেয়া মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য দুইমাস সময় দিয়া বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনের এই দশটি কারণ 'বম্বে ক্রনিকেল' পত্রে নির্দ্দেশ করেন,—

বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন।

(১) বৃটিশের আগমনের পূর্ব্বে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম ছিলাম; এমন কি অনেক বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিতাম।

(২) জবরদস্তিমূলক অন্যায় উপায়ের দ্বারা এদেশ হইতে চরকা তিরোহিত হইয়াছে। ফলে অধুনা এদেশের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী তাহাদের আংশিক পেশা ও আয় হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

(৩) বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন করা এবং তৎপরিবর্ত্তে হাতে-কাটা সূতার কাপড় ব্যবহার করার অর্থ—আমাদের স্ত্রীলোকদের পবিত্রতা রক্ষণ। আমাদের স্ত্রীলোকেরা এখন ভদ্রোচিত সূতা-কাটা পেশার অভাবে, বাহিরের কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে তাহারা অযথা বিপদের মুখে গিয়া পড়িতেছে।

(৪) কলে তৈয়ারী কাপড় অপেক্ষা হস্তনির্ম্মিত কাপড়ে কলা-নৈপুণ্য অনেক অধিক। এই কার্য্যের ভিতর একটা সজীবতা—একটু কবিত্ব আছে।

(৫) উপযুক্ত পেশার অভাবে যাহারা অনশন-ক্লিষ্ট, এরূপ কোটী কোটী নির্ব্বাক লোকের ক্রম-বর্দ্ধমান শোচনীয় দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়—চরকার পুনঃ প্রচলন।

(৬) অন্যান্য শিল্প নষ্ট না করিয়া, শুধু বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন দ্বারাই ভারতের বার্ষিক অন্ততঃ ষাট কোটী টাকা লাভ হইবে।

(৭) বিদেশী-বস্ত্র দ্বারা ভারতের যত ক্ষতি হইয়াছে, এমন আর কোন বিদেশী-জিনিসের দ্বারা হয় নাই।

(৮) ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ১৫৭ কোটী টাকার মাল আমদানি হইয়াছে। তাহার মধ্যে কাপড় আসিয়াছে প্রায় ষাট কোটী টাকার। অর্থাৎ মোট আমদানির এক-তৃতীয়াংশের

অধিক কাপড়। তাহার নীচেই চিনি। চিনি আসিয়াছে প্রায় বাইশ কোটী টাকার।

(৯) এদেশে বিদেশী-বস্ত্র আমদানির ফলে ইংলণ্ড অমানুষোচিত স্বার্থ-পরতার দাস হইয়াছে এবং অধুনা জাপানও ঐরূপ হইতেছে। বেশী দিন ধরিয়া জাপানী কাপড় এদেশে আমদানি হইতে থাকিলে, ভারতকে শুধু ইংলণ্ডের নহে—জাপানের পদেও লুণ্ঠিত হইতে হইবে।

(১০) খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা যেমন আত্মহত্যা স্বরূপ, ভারতের ন্যায় সুবিশাল দেশের পক্ষে পরিধেয় বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকাও সেইরূপ আত্মহত্যা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধীর ইঙ্গিতে সারা ভারতে বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনের তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। দূরদর্শী গান্ধী সকলকে বিদেশী-বস্ত্র বহ্নিমুখে আহুতি দিতে অথবা উহা স্মার্ণায় বিপন্ন মুসলমানগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে উপদেশ দিলেন।

১লা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান সহরে সার্ব্বজনিক সভা আহ্বান করিয়া জননায়কগণ বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। কোথাও কোথাও বা বিদেশী-বস্ত্র বহ্নিমুখে আহুতি দানের ধূম পড়িয়াছিল।

আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি সহ আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, পাটনা ও কলিকাতা হইয়া আসাম অঞ্চল পরিভ্রমণে গমন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার

সফরে।

বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে শুধু দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়াছিল।

৬ই আগষ্ট অপরাহ্ণে তিনি আলিগড় জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা করেন। ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায় মির্জ্জাপুর পার্কে অগণিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি বলেন,—

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে যে, ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন করিতে হইবে। অতএব আপনারা বিদেশী-বস্ত্র ভস্মসাৎ করুন বা স্মার্ণায় পাঠাইয়া দিন। আমার এই জামা, কাপড়, টুপি—সমস্তই খদ্দর-নির্ম্মিত। ইহা সামান্য মোটা হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। হিন্দু ও মুসলমান—ভারতমাতার দুই সন্তান। উভয়ে মিলিয়া অনুগ্র অসহযোগ যুদ্ধে ব্রতী হইলে স্বরাজ সহজেই করতলগত হইবে।

এদিনও শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই স্ব-স্ব বিদেশী-বস্ত্র, জামা, টুপি প্রভৃতি সভার পার্শ্বে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতঃপর আসামে গৌহাটি, তেজপুর, যোরহাট, শ্রীহট্ট, নওগাঁ, ডিব্রুগড়, শিলচর প্রভৃতি নানাস্থানে উপনীত হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী হাজার হাজার উৎগ্রীব দর্শককে বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন করিতে, অনুগ্র অসহযোগ-নীতি পালন করিতে ও হিন্দু-মুসলমানে একতাবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। পরে চট্টগ্রাম ও বরিশাল হইয়া তিনি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে সদলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইবার মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ ক্রমে হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকগণ কলিকাতায় বড়বাজারে বিলাতী-বস্ত্র ব্যবসায়ী

মাড়োয়ারীদের দোকানের সম্মুখে দলে দলে পিকেটিং আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া মুটেরা ও গাড়োয়ানেরা বিলাতী বস্ত্রের গাঁইট বহিবে না বলিয়া বাঁকিয়া বসিল। সমস্ত কলিকাতায় ও হাওড়া সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় হ্যালিডে পার্ক, মির্জ্জাপুর পার্ক, বিডন পার্ক, হরিশ পার্ক, খিদিরপুর প্রভৃতি নানাস্থানে একদিনে ৭।৮টি সার্ব্বজনিক সভা আহ্বান করা হয়। সর্ব্বত্রই এক কথা—একই ধ্বনি ঃ—বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন কর—৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব বিদেশী-বস্ত্র ত্যাগ করিতেই হইবে।

মাড়োয়ারীদের প্রতি—

বড় বাজারে বিলাতী বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। মাড়োয়ারী মহাজনগণ তখন ফাঁপরে পড়িয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট এক 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিলেন। বিচক্ষণ গান্ধী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

পিকেটিং আপত্তিজনক বলিয়া আমি মনে করি না। ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং ইহা বন্ধ করিতে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আমার নাই। পিকেটিংএ যাহাতে জোর-জুলুম না হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। তবে যদি কোন পিকেটার নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া উৎপীড়ন করেন, তাহা হইলে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইব। আপনারা যদি কেহ অপমানিত হন, তাহা হইলে সে অপমান আমারই উপর করা হইল বলিয়া আমি ধরিয়া লইব। আপনারা ব্যবসায়ী, সুতরাং খরিদ্দারদের ইচ্ছামত বস্ত্র আপনাদিগকে

সরবরাহ করিতে হইবে, আপনাদের এই যুক্তি আমি সমর্থন করি না। এ যুক্তি পাশ্চাত্য দেশেই চলে—ভারতে ইহার স্থান নাই। গো-রক্ষার জন্য আপনারা মরিতে প্রস্তুত; সুতরাং আপনারা কখনই গো-মাংস বিক্রয় করিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি মদ চায়, তাহা হইলে কি আপনারা মদ বিক্রয় করিবেন? হিন্দুধর্ম্ম জীবনের সকল অবস্থাতেই বিধি-নিষেধ ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনারা সদাচারী হিন্দু। আপনারা বলিয়াছেন যে, বিদেশী-বস্ত্র বিক্রয় করা বিষ বিক্রয়ের মত পাপজনক নহে। আমি বলি, সেঁকো দেহের পক্ষেই বিষ—সেই জন্য বরং কতকটা সহনীয়; কিন্তু বিদেশী-বস্ত্রের ব্যবহার আত্মার পক্ষে বিষ—সুতরাং একেবারেই অসহনীয়। বিদেশী-বস্ত্র আমদানির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চির-দারিদ্র্য প্রবেশ করিয়াছে—এদেশের শতকরা আশি জন লোক বাধ্য হইয়া অলস-জীবন যাপন করিতেছে। এই বাধ্যতামূলক আলস্যের ফলে আমাদের ভগিনীগণকে দুঃখপূর্ণ লজ্জাজনক জীবন যাপন করিতে হইতেছে। বিদেশী-বস্ত্র আমদানির ফলে ভারতে বিদেশীর প্রভুত্ব ও আমাদের দাসত্ব সুদৃঢ় হইয়াছে। এই জন্যই আমি বলি, বিদেশী-বস্ত্র ব্যবহার, বিক্রয় বা ক্রয় করা পাপ। আপনারা বলিয়াছেন যে, বিদেশী-বস্ত্রের আমদানি হঠাৎ বন্ধ হইলে, এদেশের চাহিদামত বস্ত্র সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে। এই যুক্তির সমর্থনে আপনারা একটা হিসাবও উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আসন্ন 'বয়কটে'র ফলে এদেশে যত স্বদেশী-বস্ত্র প্রয়োজন হইবে তাহার অধিকাংশই শুধু মাড়োয়ারিগণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস, ভারত চরকার বাণী বুঝিয়াছে। আমি সকলকেই স্ব-স্ব শক্তি চরকায় সূতা কাটায় ও তাঁত বোনায় নিয়োগ করিতে আহ্বান করিতেছি। আপনারা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিদেশী-বস্ত্রের 'ইন্‌ডেন্ট' স্থগিত রাখার প্রস্তাব

করিয়াছেন। ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ইহাকে স্বার্থত্যাগ বলে না। আপনাদের এই ঘোষণার পশ্চাতে গুপ্ত অভিসন্ধি আছে বলিয়া আমি সন্দেহ করি। আপনাদের আচরণে সারা পৃথিবীর লোক যেন একথা বলিবার অবকাশ না পায় যে, ভারতে এমন সব ব্যবসায়ী আছে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ভারতকে বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

১৬ই সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছাসেবকগণ রাস্তায় ভিড় করিয়াছে, এই অজুহাতে পুলিশ তাহাদের মধ্যে ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইহার ফলে জনসাধারণ এতই উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, সহরে শান্তিরক্ষা করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তখন পাছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে—পাছে অনুগ্র অসহযোগ-নীতির মূলে কুঠারাঘাত হয়—এই আশঙ্কায় কংগ্রেসের নেতৃগণ বড়বাজার হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণকে ফিরাইয়া লয়েন।

আলি ভ্রাতৃদ্বয় গ্রেপ্তার।

১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধী ও মৌলানা মহম্মদ আলি সদলবলে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই জোর গুজব রটিয়াছিল; এমন কি তিনি বক্তৃতার মুখে অনেকবার নিজেই বলিয়াছিলেন যে, যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি গ্রেপ্তার হইতে পারেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে ওয়াল্টেয়ার ষ্টেশনে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। ওদিকে মৌলানা সওকৎ আলি ও পঞ্জাবের ডাক্তার কিচলু প্রমুখ নেতৃগণ গ্রেপ্তার হন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অপরাধ সম্বন্ধে বোম্বাই গভরমেণ্ট

এই মর্ম্মে এক 'কমিউনিক্' প্রচার করেন যে, ৮ই হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত করাচী সহরে নিখিল ভারতীয় খেলাফৎ কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে তাঁহারা মুসলমানগণকে বৃটিশ সেনাদলে চাকুরী না করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন।

গান্ধীর নূতন বেশ।

২২শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধী মাদুরা হইতে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা জারি করেন যে, পরিত্যক্ত বিদেশী-বস্ত্রের স্থানে পর্য্যাপ্ত খদ্দর সংগ্রহের সঙ্গতি যাহাদের নাই, তাহারা শুধু নগ্নতা নিবারণের জন্য এক-টুকরা খদ্দর কোমরে জড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। এই ত্যাগের নিদর্শন নিজে দেখাইবার জন্য তিনি ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত টুপি ও জামা পরিত্যাগ করিয়া, শুধু এক টুকরা খদ্দর পরিয়া, দিন কাটাইবেন এবং শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজন হইলে এক খানা সামান্য চাদর গায়ে জড়াইবেন বলিয়া সঙ্কল্প জানাইলেন। মহাত্মার এই অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনিয়া সারা ভারত বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিল,—'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ!'

অসহযোগী নেতৃ-গণের ঘোষণা।

অক্টোবর মাসের প্রথমে শ্রীযুক্ত গান্ধী, লালা লাজপৎ রায়, মিঃ আব্দুল বারি, মিঃ আব্দুল কালাম আজাদ, মিঃ পাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত কেলকার, মিঃ ষ্টোকস্, মিঃ চোটানি, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ জন অসহযোগী নেতার স্বাক্ষরযুক্ত এক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়। তাহাতে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তার জন্য

বোম্বাই গভরমেণ্টের প্রদর্শিত কারণ উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষরকারিগণ ব্যক্তিগত অধিকার হিসাবে বলেন যে, গভরমেণ্টের অধীনে সামরিক বা অসামরিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করা বা কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের জন্মগত অধিকার সকলেরই আছে। ঐ সম্বন্ধে স্বাক্ষরকারিগণের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান গভরমেণ্টের অধীনে অসামরিক বিভাগে—বিশেষতঃ সামরিক বিভাগে—চাকুরী করা প্রত্যেক ভারতবাসীর জাতীয় সম্মানের বিরোধী। অতএব স্বাক্ষরকারিগণের মতে ভারতের দেশীয় সৈন্যগণের পক্ষে এবং অসামরিক কর্ম্মচারিগণের পক্ষে গভরমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

নভেম্বর মাসের প্রথমে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও ডাক্তার কিচলু করাচীর জুডিশিয়াল কমিশনারের বিচারে প্রত্যেকে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

৪ঠা নবেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়। এবারের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—শিষ্ট অবাধ্যতা (Civil Disobedience)। কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলেও শিষ্ট অবাধ্যতা-নীতি পূর্ব্বে মঞ্জুর হয় নাই। তাহার হেতু এই যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন, আইন অমান্য জনিত অপরাধের দণ্ড ও নির্য্যাতন নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিবার যোগ্যতা ভারতবাসী জনসাধারণ

শিষ্ট অবাধ্যতা।

এখনও অর্জ্জন করিতে পারে নাই। দিল্লী বৈঠকে এই আইন অমান্যের প্রস্তাব নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া পাশ করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন যে, যিনি আইন অমান্যের ব্রত গ্রহণ করিবেন তাঁহার চরকায় সূতা কাটা বিদ্যায় পরিপক্ক হওয়া চাই এবং যে জেলায় বা যে তহশিলে এই ব্রত গৃহীত হইবে, সে জেলা বা তহশিলে উৎপন্ন চরকার সূতায় তত্রত্য অধিবাসিগণের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা হওয়া চাই। এই দুইটী সর্ত্তের কঠোরতা কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার জন্য কোন কোন নেতা উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, কিন্তু দৃঢ়ব্রত গান্ধী একটুও নরম হন নাই। তিনি বলেন,—"যদি সম্ভব হয় আমিই প্রথমে আমার গুজরাট প্রদেশে ইহা আরম্ভ করিব। আমার কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া আপনারা অন্যান্য প্রদেশে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। আমাদিগকে এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে যে, একবার আরম্ভ করিয়া যেন প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়।"

বোম্বায়ে বিভ্রাট :

১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্ত বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নির্দ্দেশ ক্রমে ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল ঘোষিত হয়। কলিকাতায় সেদিন এমন শান্তভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত দৈনিক কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়াছিল যে, সহরের শ্বেতাঙ্গগণ পর্য্যন্ত চমকিত হন। বোম্বায়ের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। তথায় জনতার লোকেরা ও গুঁণ্ডারা

জোরপূর্ব্বক ট্রামগাড়ী থামাইয়া দেয়, কয়েকখানি ট্রামগাড়ীতে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়, যে সকল সাহেব বা সাহেবী পোষাক পরিহিত দেশীয় ব্যক্তি যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মাথা হইতে টুপি ছিনাইয়া লইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, রাজপথে আলোক-স্তম্ভের কাচ ও জানালার শার্সি সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, মোটর গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে, মদের দোকানে ঢুকিয়া সমস্ত পিপে মাটিতে ঢালিয়া দেয় এবং একখানি চারিতালা বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া ভস্মসাৎ করে। তাহারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে প্রহার করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত গান্ধী, স্থানীয় জননায়ক ও স্বেচ্ছাসেবকগণসহ শত চেষ্টা করিয়াও জনতার এ উন্মত্ততা দমন করিতে পারেন নাই; তিন দিন ধরিয়া বোম্বাই সহরে যেন ভূতের নৃত্য চলিয়াছিল। একদিকে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যদিকে পার্শি ও দেশীয় খৃষ্টান—ইহারা পরস্পরে প্রকাশ্য রাজপথে ঘোরতর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মাতিয়াছিল। দাঙ্গাকারীদের সহিত পুলিশের বহুবার সংঘর্ষ বাধে। কলের মজুরেরা এই হাঙ্গামায় যোগ দিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু একস্থানে গোলযোগের মীমাংসা করিতে গিয়া কয়েকজন পার্শির হাতে প্রহৃতা হন। শেষে গভরমেণ্ট গোরা ফৌজ নিয়োগ করিয়া এবং জনতার উপর গুলি চালাইয়া সহরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই হাঙ্গামায় বহুলোক হতাহত

ও বিপন্ন হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বায়ে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত অনশনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং গুণ্ডাগণকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে আবেদন-পত্র প্রচার করেন ;—

আমি একটা মস্ত ভুল বুঝিয়াছিলাম যে, তোমাদের উপর অসহযোগিগণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা অনুগ্রতার নৈতিক প্রয়োজন না বুঝিলেও উহার রাজনৈতিক মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ—স্বদেশের স্বার্থ বুঝিয়াছ ; কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার ধারণা ভুল।

আমি তোমাদিগকে দোষ দিতেছি না—মাত্র সাবধান করিয়া দিতেছি ; এবং স্বীকার করিতেছি যে, এতদিন তোমাদের প্রতি আমরা যথেষ্ট অবহেলা করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে আমাদের কার্য্য এই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তোমরা কি প্রতিহিংসা গ্রহণের তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করিবে না ? মুষ্টিমেয় পার্শি ও খৃষ্টানের উপর প্রতিশোধ লওয়া হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে কি লজ্জার কথা ! পক্ষান্তরে পার্শি ও খৃষ্টানগণের মনে রাখা উচিত যে, পাশবিক শক্তি দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না। কাজেই বিদেশী গভরমেণ্টের সাহায্য তাঁহাদিগকে লইতে হইবে অর্থাৎ স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হইবে। আশা করি বোম্বায়ের গুণ্ডারা অতঃপর বল প্রয়োগে নিরস্ত হইবে। ভগবান তোমাদের সহায় হউন।

ইহার পর বোম্বায়ে শান্তি সংস্থাপিত হয়। ২২শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধীর গৃহে সহযোগী ও অসহযোগী দলভুক্ত হিন্দু,

মুসলমান, পার্শি, দেশীয় খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রায় একশত প্রতিনিধি সমবেত হইয়া পরস্পরে আবার সোহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন দিনের পর শ্রীযুক্ত গান্ধী উপবাস ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সহিত জলযোগ করেন।

স্বেচ্ছাসেবকদল অবৈধ।

এদিকে ১৮ই নবেম্বর বাঙ্গালা গভরমেণ্ট এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারি করেন যে, এদেশের স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি গুলি ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা গঠিত এবং তাহারা সাধারণ লোককে ভয় দেখাইয়া আইনসঙ্গত কাজে বাধা দেয়; অতএব ঐ সকল সমিতি অবৈধ। বাঙ্গালার জননায়কগণ কর্ত্তৃপক্ষের এ আদেশ মানিবেন না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে এক পাল্টা-ইস্তাহার প্রচার করেন। ফলে, ৬ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশের নেতৃত্বে দলে দলে খদ্দর বিক্রয়ের অছিলায় রাজপথে বাহির হন। পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। ৭ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু দাশের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও অন্যান্য পুরমহিলাগণ বড়বাজার অঞ্চলে খদ্দর বিক্রয় করিতে গিয়া পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এই সংবাদে সমস্ত বাঙ্গালা-দেশ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। সৌভাগ্যবশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ এ ভুল চাল শীঘ্রই শুধরাইয়া ফেলেন—তাঁহারা মহিলাগণকে কয়েক ঘণ্টা পরেই ছাড়িয়া দেন।

১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য কয়েকজন

বাঙ্গালী নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ওদিকে এলাহাবাদের কর্ম্মবীর মতিলাল নেহেরু ও পাঞ্জাবের পুরুষসিংহ লালা লাজপৎ রায় কারাগারে আবদ্ধ হন।

এই সকল দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী সুমেরুর মত ধীর ও স্থিরভাবে ২৪শে ডিসেম্বর হইতে আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের সুব্যবস্থা করেন। এবার কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হাজতে আবদ্ধ থাকায় হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের বৈঠকে চারি দিন যাবৎ বহুল বিচার-বিতর্কের পর স্থিতপ্রজ্ঞ গান্ধীর উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হয়,—

আমেদাবাদ কংগ্রেস।

যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের পর হইতে ভারতবাসিগণ দেখিয়াছে যে, অনুগ্র অসহযোগ-নীতি অবলম্বনের ফলে দেশবাসী জনসাধারণ নির্ভীকতায়, আত্মত্যাগে ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং যেহেতু ইহার ফলে গভরমেণ্টের প্রেষ্টিজ (সম্মান অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে ও দেশ স্বরাজ লাভের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে,তজ্জন্য এই কংগ্রেস কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত এবং নাগপুর কংগ্রেসে পুনঃসমর্থিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন। এই কংগ্রেস অনুগ্র অসহযোগ আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জোরে চালাইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত না ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, পঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্যার সমাধান হয় এবং ভারত গভরমেণ্টের হাত হইতে দেশবাসীর হস্তে শাসনভার আইসে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশ উক্ত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকিবে।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



ভারতবন্ধু 'ভারেণ্ড এণ্ড্রুজ

যেহেতু বড়লাট সম্প্রতি বক্তৃতায় ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারত-গভরমেণ্ট ভলাণ্টিয়ারদল ও সভা-সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কংগ্রেস ও খেলাফতের কাজ বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা আপাততঃ কংগ্রেসের সমস্ত কার্য্য বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিতেছেন এবং দেশবাসী জনসাধারণকে শান্তভাবে স্বেচ্ছা-সেবক দলে যোগ দিয়া জেল বরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ডিক্টেটর গান্ধী।

বিগত কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তিনি অপর কোন ব্যক্তিকে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্য আপন স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন।

কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মতে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে স্বেচ্ছাসেবকগণ অধুনা সভা-সমিতি বন্ধের আদেশ অমান্য করিয়া দলে দলে জেলে যাইতেছেন। এই সঙ্কটকালে গভরমেণ্টের সহিত শ্রীযুক্ত গান্ধীর যাহাতে একটা মিট্‌মাট্ হয় সেজন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু দৃঢ়ব্রত গান্ধী বলিতেছেন যে, ভারতবাসীর আত্মত্যাগের পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং সম্মানপ্রদ মীমাংসার বিলম্ব আছে। তিনি জনসাধারণকে আইন-অমান্যের সাধনায় দীক্ষিত করিবার জন্য গত জানুয়ারীর (১৯২২) শেষে গুজরাটের অন্তর্গত বারদলই তালুকে উপনীত হইয়াছেন। ওদিকে মাদ্রাজের

গণ্টুর জেলায় একশত গ্রাম এখনই শিষ্ট-অবাধ্যতা ঘোষণা করিবে বলিয়া উদ্‌গ্রীবভাবে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই সন্ধিক্ষণে স্থিতধী গান্ধী বড়লাট লর্ড রেডিঙের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, গভরমেণ্ট যদি এক সপ্তাহের মধ্যে দমন-নীতি প্রত্যাহার করেন, অর্থাৎ কারারুদ্ধ অসহযোগিগণকে ছাড়িয়া দেন—সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা অর্পণ করেন এবং অনুগ্র অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিকূলতা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে আইন-অমান্যের আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখা হইবে। ইহার উত্তরে বড়লাট যাহা বলিয়াছেন, তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। কাজেই ভারত আজ উৎসর্গীকৃত বলির ন্যায় মহাপরীক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শঙ্কাকুলচিত্তে মুহুর্মুহু ভাবিতেছে,—'অতঃ কিম্!'

কি গার্হস্থ্য জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, মহাপ্রাণ গান্ধী সর্ব্বত্রই তৃণাদপি সুনীচ—তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তাঁহার হৃদয় কিরূপ অকপট, কতদূর নিরভিমান, ইহার পরিচয় পাঠক নিম্নলিখিত ঘটনায় দেখুন,—

আদর্শ স্বাবলম্বন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গান্ধী পরিজনবর্গসহ বোলপুরে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় পরিদর্শনে গমন করেন। তথায় ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহার নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইলে তিনি বলেন যে, তিন দিনের জন্য বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এ প্রস্তাবে সকলেই সানন্দে সম্মত হইলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই শ্রীযুক্ত গান্ধী আদেশ দিলেন যে, পাচক ও ভৃত্যগণকে এ কয়দিন ছুটী দেওয়া হউক—

জল তোলা, বাটনা বাটা, কুটনা কোটা, বাজার যাওয়া, বাসন মাজা, রন্ধন করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা—এ সকল কাজ ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিজেরাই করিবেন। ইহাতে সকলেই আনন্দ অনুভব করিলেন। পাচক ও ভৃত্যগণ ছুটী পাইল—ছাত্র ও শিক্ষকদল নবোৎসাহে গৃহকার্য্যে মাতিলেন। শেষ দিন শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিলেন,—"দেখুন, এখনও আমরা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারি নাই। একটা কাজের জন্য এখনও অপরের সাহায্য লওয়া হইতেছে। ছাত্র ও শিক্ষকগণ পরস্পরের প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, মহাত্মার উদ্দেশ্য কি। তিনি তখন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"পায়খানা অন্যে পরিষ্কার করিয়া দেয়, ইহাও ঠিক নহে।"

ছাত্র ও শিক্ষকগণের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ বিনীত ভাবে বলিলেন যে, ঐ ঘৃণিত কার্য্যটী ছাড়া আর যে কোন কাজ তাঁহারা করিতে প্রস্তুত আছেন। তখন শ্রীযুক্ত গান্ধী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্র, এই তিন জনে ঐ কার্য্যের ভার লইলাম।" একি কথা! পূজ্যপাদ গান্ধী সকলের মলমূত্র পরিষ্কার করিবেন!! ইহাতেও ঘোর আপত্তি উঠিল। তখন শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিলেন,—"পূর্ণমাত্রায় স্বাবলম্বী না হইলে পূর্ণ সিদ্ধি আসিবেন না।" বোলপুরের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী এ সত্য অবনত শিরে স্বীকার করিলেন।

এরূপ সারল্য, স্বাবলম্বন ও নিরহঙ্কার কি দুর্ল্লভ নহে?

কর্ম্মবীর গান্ধীর প্রত্যেক বিজয় গৌরবে তাঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় একদিকে যেমন সুপরিস্ফুট অন্যদিকে তেমনই একদল উদারহৃদয় ইংরাজের মহত্ব ও মনুষ্যত্ব সুপ্রতিপাদিত।

দৃঢ়ব্রত গান্ধী নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের সাধনা বলে যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, শক্তিশালী ইংরাজও ঠিক ততটা অধিকার ছাড়িয়াছেন।

উপসংহার।

প্রকৃত অধিকারী না হইলে কোন অধিকার পাওয়া যায় না। অনধিকারী অপরের কৃপাদত্ত অধিকার রক্ষা করিতে পারে না। কাজেই অধিকার লাভের পূর্ব্বে যোগ্যতার পরীক্ষা সকলকেই দিতে হয়। প্রতিষ্ঠাবান্ ইংরাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কীর্ত্তিমান্ গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ যে সম্মানপ্রদ অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই প্রশংসাসূচক। ঐ সংঘর্ষের ইতিহাসে স্যার উইলিয়ম হস্‌কেন, লর্ড এম্‌থিল, রেভারেণ্ড মিঃ ডোক্, তাঁহার সহৃদয়া পত্নী, ডার্ব্বাণের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহধর্ম্মিণী, মিঃ পোলাক্, মিঃ ক্যালেনব্যাক্, রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ডরুজ, রেভারেণ্ড মিঃ পিয়ার্সন, লর্ড হার্ডিঞ্জ, মাদ্রাজের লাট পাদরি প্রভৃতি সদাশয় ইংরাজ নরনারীর মহত্ত্ব চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে। তাঁহাদের ন্যায় ন্যায়বান্ ইংরাজেরাই একদিন বিশ্বপ্রেমের প্ররোচনায় সর্ব্বাগ্রে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহানুভূতি ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব বলে ভারতবাসী আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবে —এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। তাই আজ আসমুদ্রহিমাচল কর্ম্মবীর গান্ধীর সম্মুখে নতজানু হইয়া সমস্বরে বলিতেছে,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"



পরিশিষ্ট

রাজভক্তি

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে ব্যবহারাজীবগণের বার্ষিক ভোজ সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ভারতে তিন মাস পরিভ্রমণ কালে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান সময়ে লোকে প্রায়ই আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত যে, আমি আধুনিক সভ্যতার ঘোর বিরোধী হইয়া এবং স্বদেশের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া কিরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার রাজভক্তি অটল রাখিতে পারিয়াছি ; এবং কিরূপেই বা আমি ইহা সঙ্গত মনে করি যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড পরস্পরের মঙ্গলোদ্দেশে একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবে। আজ এই বিশিষ্ট সভায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার রাজভক্তি পুনরায় জ্ঞাপন করিবার সুবিধা পাইয়া, আমি অতীব আনন্দ বোধ করিতেছি।

আমার রাজভক্তি স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীরূপে আমি এই তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছি যে, প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী যে অবস্থায় পতিত হউক না কেন, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ব্রতে তাহার দাবী বজায় রাখিতেই হইবে। আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকটী আদর্শে আমার অনুরক্তি জন্মিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী আদর্শ এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা নিজের শক্তি, সম্মান ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। আমার ধারণা, কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যেই ইহা সম্ভব—অন্য কোন গভরমেণ্টের

অধীনে সম্ভব নহে। আমি কোন গভরমেণ্টই ভালবাসি না, এ কথা বোধ হয় আপনারা শুনিয়াছেন। আমি বহুবার বলিয়াছি, যে গভরমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা কম শাসন করেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শাসন প্রতিষ্ঠিত, ইহা আমি দেখিয়াছি। এই জন্যই আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী।

সত্যগ্রহ

'সত্যগ্রহ' কি, ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত মর্ম্মে বর্ণন করিয়াছেন,—

যে শক্তির কথা আমি এখানে বর্ণন করিতে যাইতেছি, তাহা Passive Resistance (নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ) এই ইংরাজী সংজ্ঞার দ্বারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সত্যগ্রহ অর্থাৎ সত্যবল বলিলে উহার অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যবলই আত্মার বল ; উহা বাহুবলের সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যবল, খাঁটি ধর্ম্মমূলক অস্ত্র। যাঁহাদের চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ, তাঁহারাই উহা সজ্ঞানে প্রয়োগ করিতে পারেন। এই অর্থে প্রহ্লাদ, মীরাবাই প্রভৃতিকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী বলা যায়। মরক্কো যুদ্ধের সময় ফরাসী গোলন্দাজেরা মরক্কোবাসী আরবগণের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে আরবগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া 'আল্লা' 'আল্লা' রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে কামানের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যু পরিহারের কোন উপায়ই তাহাদের হাতে ছিল না। তখন ফরাসী গোলন্দাজেরা আরবগণের উপর আর গোলা বর্ষণ করিতে চাহিল না। তাহারা শূন্যে টুপি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া গেল এবং আনন্দধ্বনি সহকারে সাহসী আরবগণকে আলিঙ্গন করিল। ইহাই

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের বিজয় নিদর্শন। আরবেরা সজ্ঞানে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ব্রত গ্রহণ করে নাই—সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তাহারা মরণ পণ করিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের উণ্মেষণা ছিল না। প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্থান পায় না। সে ক্রোধের উত্তেজনায় মরণকে আলিঙ্গন করে না; পরন্তু নিগ্রহ ভোগের সামর্থ্য তাহার আছে বলিয়াই, সে স্বেচ্ছাচারীর নিকট মস্তক অবনত করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর হৃদয়ে সাহস, ক্ষমা ও প্রেম থাকা প্রয়োজন।

ইমাম হুসেন ও তাহার অল্প সংখ্যক অনুচরদল, তাহাদের চক্ষে অন্যায় বলিয়া প্রতীত আদেশবাণী মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। সে সময়ে তাহারা জানিত যে, তাহাদের অদৃষ্টে মৃত্যু অবধারিত। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ঐ আদেশ মানিয়া লইলে তাহাদের ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব বিধ্বস্ত হইবে। এই জন্য তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। ইমাম হুসেন যে আদেশ অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা মানিয়া লওয়া অপেক্ষা তাহার জন্য তাহারই অস্ত্রে তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যা সাধন এবং শেষে দারুণ তৃষ্ণায় আপনার অশেষ কষ্ট ভোগ, শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল। আমার ধারণা এই যে, মুসলমান ধর্ম্মের উত্থান তরবারি-বলে হয় নাই; পরন্তু মুসলমান ফকিরগণের আত্মনির্যাতনই উহার মূল। তরবারি চালনায় বাহাদুরী কিছু নাই। যে ব্যক্তি তরবারি দ্বারা আঘাত করে, সে যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারে, তখনই তাহার পাপ বোধ জন্মে—সেই সময়ে ঐ ঘটনা হত্যারূপে পরিণত হয়। তখন আঘাতকারী স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সে যদি ভ্রমবশেও উহা করিয়া থাকে, তথাপি তাহার পক্ষে উহা বিজয় লাভ। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ অহিংসার ধর্ম্ম। অতএব

ইহা সর্ব্বত্র সকল সময়ে পালনীয় ও বাঞ্ছনীয়। সকল ধর্ম্মেই হিংসা বর্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। হিংসা প্রথার সমর্থকগণও হিংসা সম্বন্ধে বহুল বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের কিন্তু সেরূপ গণ্ডী কিছু নাই। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর কষ্ট সহনের অক্ষমতাই উহার একমাত্র গণ্ডী।

কাহারও পক্ষে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আইনসঙ্গত কি না, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল সেই ব্যক্তিই দিতে পারে—অপরে দিতে পারে না। কোন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী কার্য্য আরম্ভ করিবার পর, সাধারণ লোকে তাহার সম্বন্ধে কেবল মতামত প্রকাশ করিতে পারে। লোকে অসন্তুষ্ট হইতেছে বলিয়া কোন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। পাটী-গণিতে বাঁধা সূত্রের উপর তাহার কার্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। যে ব্যক্তি লাভ-লোকসান ওজন করিয়া তাহার পর তথাকথিত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আরম্ভ করেন, তাঁহাকে চতুর রাজনীতিক বা বিবেচক লোক বলা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি কোন মতেই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী নহেন। প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী ঐ ব্রত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া উহা গ্রহণ করে।

মনের বল ও বাহুবল এ দুইই স্মরণাতীত যুগ হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থে উভয়েরই যথাযথ সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা যথাক্রমে সৎ ও অসৎ শক্তি নির্দ্দেশ করে। ভারতের বিশ্বাস এই যে, এদেশে এক সময়ে সৎ-শক্তির প্রাধান্য ছিল। আমাদের আদর্শ এখনও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। অসৎ শক্তির প্রাধান্য-নিদর্শন ইউরোপ-খণ্ডে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ কাপুরুষতা অপেক্ষা এ দু'য়ের যে কোনটাই ভাল। এ দু'য়ের মধ্যে একটার আশ্রয় না লইলে আমাদের মধ্যে স্বরাজ আসিবে না—জাগরণ দেখা দিবে না। বিনাকর্ম্মে লব্ধ স্বরাজ

স্বরাজই নহে। উহা জনসাধারণের মনে কোন ধারণা উৎপাদন করিবে না। জনসাধারণ সে ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহাদের জাগরণ সম্ভবপর নহে। তাহারা ও আমরা যদি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রাধান্য যথাযথরূপে জাহির না করি, তাহা হইলে নেতৃগণের অজস্র প্রতিবাদ ও গভরমেণ্টের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বিপ্লববাদ আপনা-আপনি মাথা তুলিয়া উঠিবে। আগাছা যেমন যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন রূপে জন্মায়, ইহারাও সেইরূপ। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের আবাদ করিতে হইলে চেষ্টা ও সাহস উহার সাররূপে ব্যবহার করিতেই হইবে। আগাছা আমূল তুলিয়া না ফেলিলে, তাহা যেমন ফসলকে চাপিয়া মারে, সেইরূপ নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মত্যাগের দ্বারা জমি পরিষ্কার না রাখিলে এবং ইতিপূর্ব্বেই যে বিপ্লববাদের বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা ভালবাসা দ্বারা নিরসন না করিলে, আগাছার মত উহা গজাইয়া উঠিবে।

যে সকল যুবক, তাহাদের চক্ষে গভরমেণ্টের জুলুম বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তজ্জন্য অধীর ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নীতিবলে ভ্রান্তপথ হইতে সুপথে আনিতে পারি। তাহাদের বীরত্ব, তাহাদের সাহসিকতা ও তাহাদের সহনশীলতাকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের পোষকতায় নিয়োজিত করিয়া আমরা সৎ-শক্তির বল বৃদ্ধি করিতে পারি।

অতএব নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের ভাব যত শীঘ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়ে ততই ভাল। ইহা রাজা ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী গভরমেণ্টকে বা অপর কাহাকেও কখনও বিপন্ন করিতে চায় না। সে অবিবেচকের মত কাজ করে না—কাহারও প্রতি উগ্র ব্যবহার করে না। সে 'বয়কট' (বর্জ্জন-নীতি) পরিহার করে;

কিন্তু স্বদেশী-পণ গ্রহণে অগ্রসর হয় ; কারণ উহা তাহার ধর্ম্মের অনুগত। স্বদেশী-সাধনায় সে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। একমাত্র ভগবান্‌কেই সে ভয় করে—অপর কোন শক্তির ভয় তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। রাজ-শক্তির ভয়ে সে কখনও কর্ত্তব্যপথ পরিত্যাগ করে না।

আমাদের অভাব কি ?

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী মাদ্রাজে ওয়াই-এম-সি-এ ভবনে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

আমি সাধারণের কাজে লাগিয়া অবধি বরাবরই অনুভব করিয়াছি যে, একটা জিনিস ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত দরকার। সে জিনিসটা সকল জাতির পক্ষেই প্রয়োজনীয়। তবে এ সময়ে আমাদের পক্ষে উহা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন আর কাহারও পক্ষে নহে। সে জিনিসটার নাম—চরিত্র বল। আপনারা জানেন, পরলোকগত গোখলে প্রায়ই বলিতেন যে, আমাদের দেশে চরিত্রবান্ লোকের হার, ইউরোপীয় জাতিসমূহের তুলনায় অনেক কম। তাঁহার উক্তি সমূলক কিনা, আমি বলিতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, ঐ উক্তির সমর্থনে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহারা অবস্থার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক আমি জীবনের মূলসূত্র এই ধরিয়াছি ;—কোন লোক—যত উচ্চপদস্থই হউন না কেন এবং যে কাজই করুন না কেন—তাঁহার পশ্চাতে যদি ধর্ম্মবল না থাকে, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর ধর্ম্ম-

শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া ধর্ম্মার্জ্জনের কথা আমি কহিতেছি না। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস—মস্তিষ্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। উহা আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না; পরন্তু ভিতর হইতেই বিকসিত হয়। উহা আমাদের মধ্যেই সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কেহ উহার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে; কেহ কেহ তাহা পারে না। তথাপি কিন্তু উহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আমাদের অন্তর্নিহিত এই ধর্ম্মভাব, বহিঃশক্তির প্রভাবে জাগরিত হউক অথবা ভিতর হইতেই বিকসিত হউক—যে ভাবেই হউক—আমরা যদি কোন কাজ ঠিক ভাবে এবং স্থায়ীরূপে করিতেই চাই, তাহা হইলে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত রাখিতেই হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের মূলসূত্র কতকগুলি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

সত্যপালন

শাস্ত্রে পঞ্চবিধ যম * উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সত্যই প্রধান। সত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা সাধারণতঃ ঠিক তাহা নহে; পরন্তু সকল ক্ষতি সহ্য করিয়াও জীবনকে সত্যের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করার নামই সত্যপালন। এই সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি প্রহ্লাদের জীবনী উল্লেখ করিতে পারি। তিনি সত্যপালনের জন্য পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়াছিলেন। যখন কোন কার্য্যে 'না' বলা প্রয়োজন হইবে, তখন ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাহসের সহিত সোজাসুজি 'না' বলাই উচিত।

অহিংসা

দ্বিতীয় অহিংসা। অহিংসা শব্দের অর্থ জীবহত্যা না করা। আমার কাছে কিন্তু অহিংসা শব্দের ব্যাপকতা আরও অধিক। প্রকৃত পক্ষে

* অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

কাহারও বিরক্তি উৎপাদন না করার নাম অহিংসা।* এমন কি যে ব্যক্তি তোমাকে শত্রু বলিয়া মনে করে, তাহার বিরুদ্ধে মনে কুভাব পোষণ না করার নাম অহিংসা। যিনি অহিংসা সাধনা করেন, তাঁহার পক্ষে শত্রুতা সাধন অসম্ভব। ফলে তিনি গুপ্তহত্যা করিতে পারেন না—প্রকাশ্যে কাহাকেও খুন করিতে পারেন না—এমন কি দেশের জন্য বা আপন আত্মীয়-স্বজনের ইজ্জত রক্ষার জন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও করিতে পারেন না। অহিংসা-সাধনের এই নীতি অনুসারে আমরা আমাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আত্মীয়-স্বজনকে অত্যাচারীদের হাতে তুলিয়া দিয়াই তাহাদের ইজ্জত রক্ষা করিতে পারি। ইহাতে অবশ্য মুষ্ট্যাঘাত করা অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক ও মানসিক বলের প্রয়োজন। আপনার গায়ে হয়ত কিছু ক্ষমতা থাকিতে পারে (আমি তাহাকে সাহস বলিতেছি না) এবং সেই ক্ষমতা আপনি প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন কি ঘটে? সে সময়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রোধে ও উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। আপনি তাহাকে আঘাত করিয়া আরও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাজেই সে আপনার বিনাশ সাধন করিয়া তাহার অবশিষ্ট আক্রোশ আপনার প্রতিপাল্যগণের উপর বর্ষণ করিবে। কিন্তু যদি আপনি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া নিজে সকল আঘাত শির পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপাল্যগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে কি হয়? আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সমস্ত অত্যাচার আপনার উপর দিয়া কাটিয়া যাইবে এবং আপনার প্রতিপাল্যগণ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইবেন।

* যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গীতা—১২।১৫

ব্রহ্মচর্য্য

যিনি জাতীয় কর্ত্তব্য সংসাধনে প্রয়াসী অথবা প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের আলোক লাভে সমুৎসুক, তিনি বিবাহিত হউন বা অবিবাহিত হউন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। বিবাহের ফলে এ জগতে নর-নারীগণ এক বিশেষ রকমের বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়। এ জীবনে বা পর জীবনে ঐ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। কিন্তু জীবনের এই স্তরে প্রবৃত্তির পিপাসা যে আত্ম-প্রকাশ করিবেই, ইহা আমি মনে করি না।

রসনা সংযম

অতঃপর রসনা সংযমের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি নিজের পাশব প্রবৃত্তি দমন করিতে চাহে, তাহা হইলে সে স্বতই তাহা অনায়াসে করিতে পারে; রসনার ক্রীতদাস না হইয়া সে রসনা সংযত করিতে সক্ষম হয়। এই ব্রত পালন করা, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। আমি এইমাত্র ভিক্টোরিয়া হোটেল দেখিয়া আসিতেছি। সেখানে এতগুলি রন্ধনশালা যে, আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি! জাতি-বৈষম্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম পালনের নিমিত্ত ঐ সকল রন্ধনশালা সৃষ্ট হয় নাই। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের আগন্তুকগণের রুচিঅনুযায়ী রসনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তা'ছাড়া ব্রাহ্মণগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কামরা আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রুচি অনুযায়ী সুস্বাদু আহার্য্য সরবরাহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি বলি, ইহারই নাম রসনার দাসত্ব। শরীর রক্ষার জন্য ঠিক যে খাদ্য প্রয়োজন, তাহা ভোজন করিয়া যদি আমরা পরিতৃপ্ত না হই, পরন্তু খাদ্যের সহিত কতকগুলা উত্তেজক, উত্তাপবর্দ্ধক ও তীব্র মসলা উদরস্থ করি, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক উত্তেজনা দেখা দিবে, তাহা আমরা দমন করিতে পারিব না। জন্তু-জানোয়ারদের মত আমাদেরও পানেচ্ছা,

আহারেচ্ছা ও প্রবৃত্তির তাড়না আছে ; কিন্তু গরু ঘোড়ারা কি আমাদের মত আহারে অসংযমী ? আপনারা কি মনে করেন যে, আমাদের খাদ্যের তালিকা যথেচ্ছরূপে বাড়াইয়া চলাই সভ্যতার লক্ষণ, বা প্রকৃত জীবনের নিদর্শন ?

অচৌর্য্য

পরবর্ত্তী ব্রত হইতেছে চুরি না করা। আমাদের যাহা এখনই প্রয়োজন নাই, এমন জিনিস যদি গ্রহণ করি এবং তাহা অপর কাহারও প্রয়োজন সত্তেও তাহাকে না দিই, তাহা হইলে আমরা প্রকারান্তরে চোর হইলাম। প্রকৃতির মূল বিধান এই যে, জগজ্জননী আমাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণের নিমিত্ত যথেষ্ট দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিয়া থাকেন। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের নিজের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করে এবং তদতিরিক্ত কিছু না লয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না—অনাহারে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিবে না। যতদিন সংসারে এই অসামঞ্জস্য থাকিবে, ততদিন আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমরা চোর। আমি সমাজতন্ত্রী (Socialist) নহি। ঐশ্বর্য্যশালী লোকের ধনসম্পত্তি আমি কাড়িয়া লইতে চাহি না। তবে আমি এইটুকু বলি যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা আলোকের রাজ্য হইতে অন্ধকার দূর করিতে চান, তাঁহাদিগকে উল্লিখিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। ভারতে ত্রিশ লক্ষ লোক এক বেলা আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। তা'ও আবার কিরূপ? একখানা চাপাটী ও এক চিমটি লুণ হইলেই যথেষ্ট—এতটুকু ঘি বা তৈল পর্য্যন্ত জুটে না।

স্বদেশী

স্বদেশী-পণ গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজন। আমরা যখন প্রতিবেশীদের ছাড়িয়া অপর কোন স্থানের লোকের সাহায্যে স্ব স্ব অভাব পূরণ করি,

তখনই আমাদের একটা জন্মগত পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি বোম্বাই হইতে আসিয়া এখানে জিনিস-পত্র সরবরাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে মাদ্রাজী ব্যবসাদার থাকিতে বম্বেওয়ালার নিকট জিনিস ক্রয় করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। স্বদেশী সম্বন্ধে আমার অভিমত এই। আপনার যে গ্রামে বাস, সেগ্রামে যদি নাপিত থাকে তাহা হইলে তাহারই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত; পরন্তু মাদ্রাজ সহর হইতে আগত সৌখিন নাপিতের নিকট ক্ষৌরী হওয়া অবিধেয়। তবে আপনার গ্রামের নাপিত যাহাতে সহরের নাপিতের মত দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে তালিম দিতে পারেন; কিন্তু সে সুদক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার পক্ষে সহরের নাপিতের নিকট যাওয়া কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহার ফলে যখন দেখিবেন যে, অনেক জিনিস আমরা পাইতে পারি না, তখন সেগুলি না লইয়াই জীবন-যাত্রা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইব। আজ যে সকল জিনিস নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার অনেকগুলি হয়ত বর্জ্জন করিতে হইবে। আপনারা বিশ্বাস করুন, যখন মনের অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইবে, তখন ঘাড়ের উপর হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল বলিয়া বোধ করিবেন।

নির্ভীকতা

আমি সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, এদেশে শিক্ষিত লোকের মনে একটা অসাড়তাগ্রস্থ আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। আমরা প্রকাশ্যভাবে কথা কহিতে পারি না—আমাদের ধ্রুব ধারণাসমূহ জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করিতে সাহসী হই না। আমরা গোপনে ঘরের মধ্যে যে মত প্রকাশ করি, তাহা সাধারণে জানিতে পারে না। আমরা যদি মৌনব্রত গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু আমরা যখন প্রকাশ্যে বক্তৃতা করি, তখন নিজে যাহা বিশ্বাস করি না, তাহাই বলিয়া

থাকি। যাঁহারা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা এইরূপ কিনা জানি না ; তবে আমি বলি, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা যদি প্রকৃতই সত্যপালন করেন, তাহা হইলে আপনাদের হৃদয়ে নির্ভীকতা আসিবেই আসিবে।

অস্পৃশ্য জাতি

অস্পৃশ্য জাতিসমূহের সম্বন্ধে একটী ব্রত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ইহাই একটা দুরপনেয় কলঙ্ক। ইহা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, যে সময়ে আমরা জীবনাবর্ত্তের নিম্নস্তরে পড়িয়াছিলাম, সেই সময়ে সংস্পর্শ বিষয়ক এই নীচ, জঘন্য, দাসত্ববর্দ্ধক ভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়াছিল। তাহার কুফল আজও আমাদের সমাজে রহিয়া গিয়াছে। আমার মতে, ইহা একটা অভিসম্পাত। যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন মনে হইবে যে, উক্ত মহাপাপের ফলে আমরা এই পুণ্যভূমে এত শাস্তি ভোগ করিতেছি। কেহ যে জাতিবৃত্তির জন্য অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহা ধারণাতীত। হে ছাত্রগণ! তোমরা যদি আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াও প্রাগুক্ত পাপে লিপ্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে আদৌ শিক্ষালাভ না করাই ভাল।

রাজনীতি

উল্লিখিত নিয়মসমূহ পালনের পর আপনারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে এবং প্রাণ ভরিয়া উহা আলোচনা করিতে পারেন। ধর্ম্মহীন রাজনীতির সার্থকতা কিছুই নাই। দেশের ছাত্রগণ যদি রাজনীতিক-মঞ্চে সমবেত হয়, তাহা হইলে তাহা জাতীয় উন্নতির সহায়ক হইবেই, ইহা আমি মনে করি না। পক্ষান্তরে এ কথাও বলা চলে না যে, ছাত্রজীবনে

রাজনীতি শিক্ষা করা উচিত নহে। রাজনীতি আমাদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বালোচনা করিতে চাই; আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কিরূপে হইতেছে, তাহাও বুঝা উচিত। আজ কাল ছোট ছোট ছেলেরা লেখা পড়া ছাড়িলেই ঘোর অন্ধকারে গিয়া পড়ে। তাহারা সামান্য সামান্য চাকুরি খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের উপার্জ্জন অকিঞ্চিৎকর; ভগবানের তত্ত্ব তাহারা রাখে না। এমন কি বিশুদ্ধ বাতাস ও পরিষ্কার আলোক তাহারা পায় না। প্রাগুক্ত বিধানগুলি মানিয়া চলিলে প্রাণে যে অকৃত্রিম তেজস্বিতা ও স্বাধীনতার উদ্রেক হয়, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত।

উপসংহার

আজ আপনাদের সম্মুখে যে কয়টী বিধান উল্লেখ করিলাম, তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি ধরিয়া আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। অথবা যদি আপনারা মনে করেন যে, এ সকল উক্তি বাতুলের প্রলাপ মাত্র, তাহা হইলে স্পষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; কারণ আপনাদের মন্তব্য আমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়াও গ্রহণ করিব।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

অনেক মুসলমান পত্র-লেখককে শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটী ভাষায় যে চিঠি লিখেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ এইরূপ,—

হিন্দু-মুসলমানে আমি কোন বৈষম্য দেখি না। আমার মতে, উভয়েই ভারত-জননীর সন্তান। আমি জানি হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক অধিক; তাঁহারা জ্ঞানে ও শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া

বোধ হয়। অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে সানন্দে অধিকতর স্বার্থ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সত্যাশ্রয়ীরূপে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসনা সম্পূরণের নিমিত্ত হিন্দুগণের আত্মবিসর্জ্জন করা উচিত এবং তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ বোধ করা কর্ত্তব্য। পরস্পরের প্রতি এইরূপ উদারতা প্রদর্শিত হইলে, তবে একতা আসিবে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর শোণিতসম্পর্কযুক্ত ভাইর মত আচরণ করিলে, ভারতে অরুণোদয়ের সম্ভাবনা।

প্রাচীন শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা

এলাহাবাদে মুন্সী রাম প্রসাদের উদ্যান-বাটিকায় আহূত এক বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

আমি আজ সলজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে, হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ইহাই একটা মহৎ দোষ। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের একাংশও তাই। ইংরাজীতে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ বটে, তথাপি আমি হিন্দী ভাষায় আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থানুসারে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষা লাভ ১৬।১৭ বৎসর বয়সে, কলেজে প্রবেশ করিবার পর, আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে স্কুলে লব্ধ শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ছাত্রেরা ইংলণ্ডের ভৌগলিক বিবরণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে, কিন্তু স্বদেশের ভৌগলিক জ্ঞান প্রচুররূপে অর্জ্জন করে না। ভারতের যে ইতিহাস তাহারা পাঠ করে, তাহা অনেকটা বিকৃত। সরকারী চাকুরী লাভ করাই তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ,

তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য! এদেশের বালকেরা পৈত্রিক পেশা ছাড়িয়াছে—মাতৃভাষা বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহারা ইংরাজী ভাষা, ইউরোপীয় আদর্শ ও ইউরোপীয় সাজসজ্জা ধরিয়াছে! তাহারা ইংরাজীতে চিন্তা করে, সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরাজীতে চালায় এবং মনে করে যে, ইংরাজী ভাষা ছাড়িলে কিছুতেই চলিবে না। তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইংরাজী ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দানের ফলে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ, এই উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখা দিয়াছে! ইহারই ফলে গৃহাশ্রমেও বিচ্ছেদ-বীজ উপ্ত হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা ও আদর্শ তাহার পরিজনভুক্ত মহিলাগণের মনোবৃত্তির অনুরূপ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির শেষ লক্ষ্য—সরকারী চাকুরি লাভ অথবা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে সমাজে এমন বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাহা আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। ঐ ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি, দেশের কোন উপকার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, ইংরাজী-শিক্ষিত নেতৃগণ জনসাধারণের জন্য দুঃখ বোধ করেন না। বরং আমি স্বীকার করি যে, তাঁহারাই এদেশে কংগ্রেস ও অন্যান্য জনহিতকর আন্দোলন পরিচালন করিতেছেন। তথাপি আমার ধারণা এই যে, তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা ইতিমধ্যে আরও অধিক উন্নতি সাধিত হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেতৃগণের মনে এই ভাব জাগিয়াছে যে, তাঁহাদের অনুসৃত পথ ছাড়া উন্নতির অন্য উপায় নাই। তাঁহারা যেন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন! কিন্তু নিজেদের অসহায় বোধ করা, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

এখন প্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক। সেকালে গ্রাম্য পাঠশালে গুরুমহাশয়েরা ছাত্রগণকে এমন শিক্ষা দিতেন, যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগিত। তদুপরি উচ্চশিক্ষা যাহারা লাভ করিত তাহারা অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিত। শিক্ষার পথে বাধা কিছু ছিল না। রাজশক্তি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না—ব্রাহ্মণেরাই জনসাধারণের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার গতি-প্রকৃতি বাঁধিয়া দিতেন। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সেকালে শিক্ষার ভিত্তি ছিল। ঐরূপ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজ ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বর্ষের বিপ্লব ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়াও সজীব; আর গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা অতীতের অন্ধকারে অন্তর্হিত। অধুনা ভারতের উপর দিয়া নূতন সভ্যতার তরঙ্গ ছুটিয়াছে; কিন্তু ইহা অস্থায়ী। আমার স্থির বিশ্বাস, এ তরঙ্গ অচিরে তিরোহিত হইবে—ভারতীয় সভ্যতা আবার ভাস্বর হইয়া উঠিবে। পুরাকালে জীবনের মূলভিত্তি ছিল—সংযম; এখন ভোগ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে, লোকে অধুনা শক্তিহীন, কাপুরুষ ও সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক সভ্যতার অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় হয়ত আমাদের সভ্যতাকে কোন কোন বিষয়ে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে; কিন্তু যে সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সমীচীন নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদানভূত জড়শক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে সেই সভ্যতানুকূল পদ্ধতি ও উপকরণ অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার আদিভূত আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট জড়শক্তি কিছুই নহে। সকল দেশের তুলনায় এই ভারতবর্ষই ধর্ম্মভূমি ছিল। সেই ভাব রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রেম ও পরম

কর্ত্তব্য। আত্মার শক্তি অর্থাৎ ভগবানের শক্তি হইতে তাঁহারা শক্তি লাভ করিবেন। এই পথ যদি তাঁহারা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ স্বতই তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীর দুর্দ্দশা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গান্ধী রাঁচি হইতে সংবাদ-পত্রসমূহে এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান,—

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া অবধি আমি আড়াই বৎসরের উপর ভারতে রহিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রায় আট মাস কাল আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতীয় রেলপথসমূহের তৃতীয় শ্রেণীতে পরিভ্রমণ করিয়াছি। উত্তরে লাহোর হইতে দক্ষিণে ট্রাঙ্কুবার পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে করাচি হইতে পূর্ব্বে কলিকাতা পর্য্যন্ত, কোথাও বেড়াইতে আমার বাকী নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কিরূপ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ করে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই, আমার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি যতদূর পারিয়াছি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কয়মাসে আমি এদেশের অধিকাংশ রেলপথেই বিচরণ করিয়াছি, এবং যখন যেখানে যে ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়াছি, তখনই তাহা সেখানকার রেলকর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইয়াছি। আমার মনে হয়, দীর্ঘকাল হইতে যাত্রীরা যে সব অসুবিধা ভোগ করিরা আসিতেছে—যদিও ইহার মধ্যে অধিকাংশই সহজ-প্রতিকারসাধ্য—তাহা দূর করিবার জন্য দেশের সংবাদ-পত্রসমূহকে এবং জনসাধারণকে একযোগে যত্নপর হইতে আহ্বান করিবার সময় আসিয়াছে।

আমি গত ১২ই তারিখে বোম্বাই হইতে মেল ট্রেণে মাদ্রাজ যাইবার জন্য ১৩॥৴০ টাকা দিয়া টিকিট ক্রয় করি। যে কামরায় আমি উঠিয়া-

ছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল—২২জন যাত্রী বসিবে। ইহাতে কেবল বসিবার আসন মাত্র ছিল; বাঙ্ক (Bunk) ছিল না যে, কেহ একটু আরাম করিয়া স্বচ্ছন্দে শুইবে। মাদ্রাজে পৌছিবার পূর্ব্বে ঐ ট্রেণে দুইটী রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। ট্রেণ পুণায় পৌছিবার পূর্ব্বেই যদি আমাদের কামরায় ২২ জনের অধিক যাত্রী না উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেবল বলবান আরোহীদের প্রতিরোধের ফলে। দুইজন কি তিনজন নাছোড়-বান্দা আরোহী ব্যতীত আর সকলকেই সারা রাত্রি বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতে হইয়াছিল। রায়চরে ট্রেণ পৌছিলে, ভিড় অসহনীয় হইয়া উঠে। কিছুতেই যাত্রীদের ঠেল সাম্‌লাইতে পারা যায় নাই। আমাদের কামরায় যে সকল যাত্রী বাহির হইতে কাহাকেও উঠিতে না দিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের পক্ষেও আর আটকাইয়া রাখা সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। ট্রেণের গার্ড বা অন্যান্য রেল কর্ম্মচারীরা আসিয়া আরও কতকগুলি যাত্রীকে ভিতরে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন।

বাক্সে মাছ বোঝাই করার মত এই কামরাটীতে যে মানুষ বোঝাই করা হইতেছিল, ইহার প্রতিবাদ বোম্বাই অঞ্চলের একজন বোেখা মুসল-মান বণিক্ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ট্রেণে তাঁহার চারি রাত্রি কাটিয়াছে, ইহা পঞ্চম রাত্রি; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। গার্ড তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বলিলেন, শেষ ঠিকানায় গিয়া, তিনি যেন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঐ রাত্রিতে অধিকাংশ সময়ই অন্যূন ৩৫ জন আরোহী আমাদের গাড়ীতে ছিল। অনেককে ময়লার মধ্যে মেঝের উপর বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল; অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতেও হইয়া-ছিল। একবার দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম ঘটিয়াছিল; কেবল কয়েকজন প্রাচীন বয়স্ক—যাঁহারা ঔদ্ধত্য দেখাইয়া অস্বস্তি আর বাড়াইতে চাহেন না—এমন আরোহীর জন্যই তাহা হইতে পারে নাই।

পথে আরোহীরা তৈয়ারী চা আনিলেন। কিন্তু সে ত চা নহে—খানিকটা চা-ধোয়া জল। একটু ময়লা চিনি, আর দুধ বলিয়া কথিত একটু সাদা রঙের তরল পদার্থের মিশ্রণে ঐ জলটা ঘোলা দেখাইতেছিল। উহার চেহারা সম্বন্ধে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; স্বাদের সম্বন্ধে যাত্রীদের কথাই প্রামাণ্য।

এতখানি পথের মধ্যে একটীবারও আমাদের কামরায় ঝাড়ু পড়ে নাই—কেহ তাহা পরিষ্কার করিয়াও দেয় নাই। ফলে, মেঝের উপর দিয়া যাইতে হইলেই—মেঝের উপর উপবিষ্ট যাত্রীদেব ভিড় ঠেলিয়া এক পা অগ্রসর হইতে হইলেই—ময়লার উপর দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পায়খানাটী একবারও পরিষ্কার করা হয় নাই। তা'ছাড়া ট্যাঙ্কেও জল ছিল না।

যাত্রীদের জন্য যে খাবার বিক্রয় হইতেছিল, তাহাও অপরিষ্কার। যে লোকটী খাবার দিতেছিল, তাহার হাতখানি আরও অপরিষ্কার। যে পাত্রটী হইতে খাবার দেওয়া হইতেছিল; তাহাও ময়লায় পরিপূর্ণ। যাহাতে করিয়া ওজন করা হইতেছিল, তাহা ততোধিক ময়লা। উহাতে আবার লাখ লাখ মাছি পড়িয়াছিল। এই সকল খাবার লইবার জন্য যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকেই খাবারের সম্বন্ধে চোখা চোখা কথা শুনাইয়া দিলেন; তবে ইহাও বলিলেন যে, উহা না খাইয়া আর উপায় কি?

ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, গাড়োয়ানেরা যে ভাড়া চাইতেছে, তাহা না পাইলে তাহারা আমাকে লইবে না। আমি মৃদুভাবে বলিলাম যে, তাহাদিগকে আমি নির্দ্ধারিত হারে ভাড়া দিব। এখানে আমাকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ পন্থাবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম,—আমি কিছুতেই গাড়ী হইতে নামিব না; হয়

আমাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে, নতুবা পুলিশ ডাকিতে হইবে।

পুনর্যাত্রাও ইহাপেক্ষা ভাল অবস্থায় হয় নাই। গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীপূর্ণ হইয়াছিল। একজন বন্ধুর সাহায্য না পাইলে, আমি হয়ত বসিবার স্থানই পাইতাম না। সেই কামরায় যতজনের বসিবার কথা, তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি আমি তাহাতে প্রবেশ করিলাম। উহাতে ৯ জন লোকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু লোক বসিয়াছিল ১২ জন। একস্থানে একজন বিশিষ্ট রেল-কর্ম্মচারী একটা লোককে অনেক চেষ্টা করিয়া গাড়ীর ভিতর পূরিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং একজন আরোহী বাধা দিতেছিল বলিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন; অধিকন্তু প্রহারের ভয়ও দেখাইলেন। এই কামরায় একটী পায়খানা ছিল; কিন্তু সেটা কেবল নামে মাত্র। উহা ইউরোপীয় ধরণে ব্যবহারোপযোগী পায়খানা; কিন্তু সেভাবে ব্যবহৃত হইত না। উহার ভিতর জলের নল ছিল; কিন্তু তাহাতে জল ছিল না। তা'ছাড়া উহা এত অপরিষ্কার যে, পীড়াজনক। এই কামরাটাই অতি কুদৃশ্য। কাঠের উপর ময়লা জমিয়া পুরু হইয়াছিল; কখনও যে সেখানে সাবান বা জল পড়িয়াছে, এমন মনে হয় না।

এই কামরায় নানা শ্রেণীর নানা রকমের লোক ছিল, তিনজন দীর্ঘকায় পাঞ্জাবী মুসলমান, দুইজন শিক্ষিত তামিল এবং শেষে আসিয়াছিলেন দুইজন মুসলমান বণিক্। বণিকেরা স্বচ্ছন্দে যাইবার জন্য কিরূপে ঘুষ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। পাঞ্জাবীদের মধ্যে একজন তিন রাত্রি ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি তিনি একটু শুইতে পান নাই। তিনি বলিলেন, টিকিট কিনিবার জন্য যাত্রীরা কিরূপ ঘুষ দিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি সারাদিন

সেণ্ট্রাল রেল ষ্টেশনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন,—টিকিট কিনিবার জন্য এবং বসিবার স্থান পাইবার জন্য তিনি নিজেই পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়াছেন। এই তিনজন যাত্রী লুধিয়ানা যাইতেছিলেন; কাজেই তাঁহাদের রাত্রি জাগরণ এইখানেই শেষ হয় নাই।

আমি যাহা বর্ণন করিলাম, ইহা অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক নহে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি রায়চর, ধোন্দ, শোণপুর, চক্রধরপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল এবং অন্যান্য জংশন-ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টেশন-সংলগ্ন মুসাফির-খানা সমূহ পরিদর্শন করিয়াছি। ঐ স্থানগুলি অতি কদর্য্য—শান্তি-শৃঙ্খলা বর্জ্জিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নামমাত্র সেখানে নাই—আছে কেবল গণ্ডগোল আর হৈ-চৈ। তথায় বসিবার বেঞ্চি নাই অথবা বসিবার উপযুক্ত স্থানও নাই। সকলকেই ময়লা মেঝের উপর বসিয়া, ময়লা খাদ্য আহার করিতে হয়। সকলেই যেখানে-সেখানে খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ নিক্ষেপ করে, থুথু ফেলে, তামাক খাইয়া গুল প্রভৃতি ঢালে। ঐ সকল স্থানের পায়খানার কথা আর বলিতে হইবে না। শ্লীল ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া উহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। সংক্রামকতা নিবারণের জন্য ছাই বা অন্য কোন বস্তু ঐখানে দেওয়া হয় না। মাছিগুলা ভন্ ভন্ করিয়া ঐ সকল স্থান ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আর কোন উপায়-নাই! এই সব স্থানে যাওয়া আর যমের বাড়ী যাওয়া সমান হইলেও, যাত্রীরা অনুযোগ করিতে চাহে না। আমি জানি, অনেক যাত্রী শুধু ট্রেণের কষ্ট কমাইবার জন্য উপবাস করিয়া থাকেন। শোণপুরে মাছিরা কিছু করিতে না পারায় বোল্‌তা পর্য্যন্ত আসিয়া যাত্রীদিগকে এবং কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ভারতের রাজধানীতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরটি অন্ধকূপ বিশেষ; উহা ভাঙ্গিয়া ফেলাই উচিত।

ভারতে যে প্লেগ সংক্রামক হইয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? যেখানে যাত্রীরা কোথাও যাইলেই, কিছু-না-কিছু ময়লা বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ফিরিবার সময় ততোধিক ময়লা লইয়া আইসে, সেখানে ঐরূপ না হওয়াই অসম্ভব। কেবল ভারতীয় রেলসমূহের যাত্রীরাই সকল গাড়ীতে—এমন কি স্ত্রীলোকের সম্মুখে—তামাক সিগারেট প্রভৃতি অবাধে খাইয়া থাকে; যাহারা ধূমপানে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের নিষেধও মানে না। ধূমপানে অনভ্যস্ত যাত্রীরা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় থাকিলে, তাহাদের বিনানুমতিতে সেখানে ধূমপান করা, রেল আইন অনুসারে নিষিদ্ধ; তথাপি ধূমপানকারীরা ঐরূপ করিয়া সাজা পায় না।

এই সব অপরিচ্ছন্নতা অপসারণের পক্ষে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ কোনরূপেই পরিপন্থী হইতে পারে না। যুদ্ধের জন্য যে ট্রেণে অস্বাভাবিক ভিড় ও ময়লা সহ্য করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। এরূপ স্থলে বরং ট্রেণে লোক যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইতে পারে; তথাপি যাহাতে উল্লিখিতরূপে লোকের স্বাস্থ্য ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ ব্যবস্থা চলিতে দেওয়া আদৌ উচিত নহে।

এইবার প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের সহিত তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের অদৃষ্ট তুলনা করা যাউক। মাদ্রাজের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার পাঁচগুণের কিছু অধিক। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা যে আরাম উপভোগ করে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ এমন কি দশ ভাগের এক ভাগ—আরাম ভোগ করিতে পায়? যে যেমন পয়সা দেয়, সে তেমন সুবিধা ভোগ করিবে—ইহা ত ন্যায়সঙ্গত দাবী।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পয়সা হইতে যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চির বর্দ্ধমান বিলাস-ব্যসনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ইহা

সুবিদিত সত্য। জীবন রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাহা অবশ্যই দাবী করিতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপেক্ষা করার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রজাকে শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে, স্বাস্থ্যনীতি পালন বিষয়ে এবং সুরুচি পোষণ বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ নষ্ট হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা রেলপথে ভ্রমণকালে এমন অবস্থায় কাল কাটাইতে বাধ্য হয় যে, তাহার ফলে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভের পরিবর্ত্তে তাহাদের ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাগুক্ত কুপ্রথাবলীর উচ্ছেদকল্পে অনেক প্রকার ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমার মতে প্রথমে এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক,—বড়লাট, জঙ্গীলাট, রাজ-মহারাজগণ, বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা, পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, মাঝে মাঝে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থার কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব এবং অভিযোগ-বিমুখ প্রজাবর্গ সাধারণ জীবের যোগ্য আরামে রেলে যাতায়াত করিবার আশায় সে পয়সা ব্যয় করে, তাহার কতকাংশ উশুল হইল বলিয়া মনে করিতে পারিবে।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর আদর্শ

দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী তামিলগণকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

মনে রাখিও, আমরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের পবিত্র আদর্শ প্রহ্লাদ ও সুধন্বার বংশধর। তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের নাম ত্যাগ করিতে বলায়, তাঁহারা পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়াছিলেন।

সহস্র নির্যাতন সহ্য করিয়াও তাঁহারা নির্যাতনকারীর উপর প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হয় নাই। ট্রান্সভালে আমাদিগকে ভগবানের নাম ত্যাগ করিতে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিতে, প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে এবং জাতির অপমান শির পাতিয়া লইতে বলা হইতেছে। এ সঙ্কটে আমরা কি পিতৃপুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীনতার পরিচয় দিব?

আর্থিক উন্নতি বনাম নৈতিক উন্নতি

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মিয়োর সেণ্ট্রাল কলেজের অর্থনীতি সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

আর্থিক উন্নতি কি প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী? আর্থিক উন্নতি বলিলে আমরা অসীম ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির কথা বুঝি। প্রকৃত উন্নতির অর্থ নৈতিক উন্নতি; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে স্থায়ী উপাদান আছে, তাহার পরিপুষ্টি। বিষয়টী ঘুরাইয়া এইরূপে বলা যাইতে পারে,—মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি নৈতিক উন্নতি হয় না? এ সমস্যাটী অবশ্য আলোচ্য সমস্যা অপেক্ষা বৃহত্তর; কিন্তু আমার ধারণা এই যে ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা কালেও আমরা প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমরা ইহা বেশ অনুভব করিতে পারি যে, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বা স্থিতি বলিয়া কোন জিনিস নাই। অতএব আর্থিক উন্নতি যদি নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী না হয়, তবে উহার পরিপোষক হইবেই। যাঁহারা বৃহত্তর প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারেন না, তাঁহারা সময়ে সময়ে আলোচ্য বিষয়টী এরূপ জটিল ভাবে উত্থাপন করেন যে, আমরা কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টারের সেই উক্তি—অর্থাৎ ভারতের তিন কোটী লোক দৈনিক একাহারে জীবণ ধারণ করে—এই দৃষ্টান্ত দ্বারা

তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহারা বলেন যে, দেশবাসী জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির কথা ভাবিবার পূর্ব্বে, তাহাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণ করিতে হইবে। এই অজুহাতে তাঁহারা নৈতিক উন্নতির পরিবর্ত্তে অগ্রে আর্থিক উন্নতির পক্ষপাতী।

উক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই তাঁহারা এক লাফে বলিয়া উঠেন,—'তিন কোটী লোকের জন্য যাহা দরকার, সারা বিশ্বের জন্যও তাহাই দরকার।' তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বর্জ্জিত-দৃষ্টান্ত হইতেই যত কুনিয়মের সৃষ্টি। প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত যে কতদূর হাস্যকর ও অসঙ্গত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য একথা কেহ বলে না যে, দারুণ দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে নৈতিক অবনতি ছাড়া আর কিছু হইতে পারে। মানুষ মাত্রেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং নিজের জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য, পরিধেয় ও গৃহাদি সংস্থানে সকলেই অধিকারী। কিন্তু সেজন্য অর্থনীতির বা অর্থনীতিবিদের সাহায্য প্রয়োজন হয় না।

'কল্যকার জন্য ভাবিও না' ইহাই পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন। সুশৃঙ্খল সমাজে লোকের জীবনোপায় সংগ্রহ, অতি সহজ হওয়া উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। কোন্ দেশ কতটা সুশৃঙ্খল, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, সে দেশে কয়জন লক্ষপতি আছেন দেখিলে চলিবে না; পরন্তু দেখিতে হইবে যে, সে দেশের জনসাধারণ অন্নকষ্ট হইতে কতটা মুক্ত। শুধু এই সিদ্ধান্তটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সম্পদ বৃদ্ধি বলিলে নৈতিক উন্নতি বুঝায়—ইহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করা যায় কি না।

কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। রোমরাজ্য সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া নৈতিক বল হারাইয়াছিল। মিশরের অবস্থাও ঠিক তাই। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিস্ফুট। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয়গণ অর্থসম্পদে গা ঢালিয়া

অধঃপাতে গিয়াছিলেন। আধুনিক ধনকুবের রক্‌ফেলার বা কর্ণেগির বংশধরেরা যে, সাধারণ হিসাবে নৈতিক-বলসম্পন্ন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না ; কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র বিচার কালে আমরা স্বভাবতঃ অনেকটা কোমল হই। অর্থাৎ তাঁহারা যে জীবনে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ রক্ষা করিবেন, এমন আশা আমরা করি না। তাঁহারা অর্থসম্পদ লাভ করিয়াছেন বলিয়াই যে, নৈতিক সম্পদের অধিকারী হইবেন, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার স্বদেশবাসিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সৌভাগ্য-সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আমি দেখিয়াছি, যাঁহার ধন-সম্পদ যত অধিক, তাঁহার নৈতিক জঘন্যতাও তত বেশী। সেখানে আমাদের স্বদেশীয় দরিদ্র লোকেরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নৈতিক যুদ্ধে যেরূপ একাগ্রভাবে যোগ দিয়াছিল, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সেরূপ ভাবে অগ্রসর হয় নাই। দরিদ্রগণের আত্মসম্মানে যেমন ঘা লাগিয়াছিল, ধনাঢ্যগণের সেরূপ লাগে নাই। যদি বিপদে পড়িবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এদেশের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতাম যে, লোকে অর্থশালী হইয়াছে বলিয়াই প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা জন্মিয়াছে। আমার মতে অর্থনীতি সম্বন্ধে অধুনা প্রকাশিত পুস্তকাবলী অপেক্ষা পৃথিবীর শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও দোষহীন। আজ যে প্রশ্ন আমরা এই সভায় উত্থাপন করিয়াছি, ইহা নূতন নহে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যিশুকে লোকে ঠিক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেণ্ট মার্ক সে দৃশ্য জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। যিশু তখন ভাবমগ্ন—একান্ত অকপট। তিনি অমরত্ব লাভের কথা কহিতেছিলেন। সংসারের গতি-প্রকৃতি তাঁহার অবিদিত নহে। সে সময়ে তাঁহার মত অর্থনীতিবিদ্ আর কেহই ছিল না। স্থান ও কালের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। একজন লোক তাঁহার

সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া নতজানু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সৎ প্রভু! অমরত্ব লাভের জন্য কি করিতে হইবে?" প্রত্যুত্তরে যিশু বলিলেন,—"আমাকে সৎ বলিতেছ কেন? জগতে এক ভগবান্ ব্যতীত সৎ বস্তু আর কিছুই নাই। তুমি ত দশটী অনুশাসন জান। পরস্ত্রী গমন করিও না, হত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, জাল-জুয়াচুরি করিও না, পিতামাতাকে সম্মান করিও।" আগন্তুকটী যিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"প্রভু, আমি শৈশব হইতে ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি।" যিশু আগন্তুকের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিলেন,—"একটা বিষয়ে তোমার গলতি আছে। যাও, তোমার বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান কর; স্বর্গে তুমি অনন্ত রত্নের অধিকারী হইবে। এস, ক্রশ গ্রহণ কর; আমার অনুবর্ত্তী হও।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কারণ তাহার ধনসম্পদ যে যথেষ্ট! যিশু চারিদিকে শিষ্যদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন,—'যাহাদের ধনসম্পত্তি আছে তাহাদের পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!' শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। যিশু পুনরায় বলিলেন,—'বৎসগণ, অর্থই যাহাদের সর্ব্বস্ব তাহাদের পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা বড়ই দুষ্কর। ছুঁচের ছিদ্র দিয়া উটের যাতায়াত বরং সম্ভব, তথাপি ধনাঢ্য ব্যক্তির ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।" জীবনের সনাতন নীতি ইহাপেক্ষা যোগ্যতর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যিশুর শিষ্যগণ আমাদেরই মত মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাস জানাইলেন। আমরা যেমন আজকাল বলি, তাঁহারাও সেইরূপ যিশুকে বলিলেন,—"দেখুন আপনার নীতি কাজে লাগাইতে গেলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমরা যদি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলি, তবে খাইব কি? অর্থ চাই; নচেৎ নৈতিক জীবন

ধারণ করা, আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।" শিষ্যগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—'তবে আর কে রক্ষা পাইবে?' যিশু তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"মানুষের পক্ষে উহা অসম্ভব; কিন্তু ভগবানের পক্ষে নহে। কারণ ভগবানের পক্ষে সকলই সম্ভব।" প্রত্যুত্তরে পিটার বলিলেন,—'দেখুন আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করিতেছি।' যিশু বলিলেন,—"আমি ঠিক জানাইতেছি যে, আমার জন্য বা আমার উপদেশের জন্য কেহ ঘরবাড়ী, ভাইভগ্নী, মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র বা জমিজরাত ত্যাগ করিয়া আসে নাই। কিন্তু তাহারা এখন ধর্ম্মের জন্য নির্যাতন সহ্য করিয়া শত শত ঘরবাড়ী, ভাইভগ্নী মাতাপুত্র ও জমিজরাত পাইবে এবং পর জীবনে অমরত্ব লাভ করিবে। তবে যাহারা অগ্রে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে অগ্রগণ্য হইবে।"

আপনারা এখানে দেখিতে পাইবেন যে, নিয়মানুবর্ত্তনের ফল বা পুরস্কার কি। অন্যান্য অ-হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ উদাহরণ আমি আর উদ্ধৃত করিতে চাহি না, এবং আমাদের ঋষিগণের লিখিত গ্রন্থ হইতেও যিশুর উক্তির সমর্থনে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে অবজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে বাইবেল অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে আমরা এবিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ পাইতে পারি। যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ—ইহাঁদের প্রভাব সংসারে হাজার হাজার লোকের চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাঁদের আগমনে জগৎ আজ উন্নত; অথচ ইহাঁরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

অধুনা জড়-জগতের উন্নতিকে যেমন আমরা জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া বোধ করিতেছি, তেমনই আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা

পড়িতেছে, এই বিশ্বাস যদি আমার না থাকিত তাহা হইলে আমার বক্তব্য এত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতাম না। আমার ধারণা, আর্থিক উন্নতি প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী। এই জন্যই পুরাকালে ধনার্জ্জনের একটা সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে অবশ্য ধনার্জ্জন লিপ্সা একবারে তিরোহিত হইত না। আমাদের মধ্যে এমন একদল লোক বরাবরই আছে ও থাকিবে,যাহারা ধনার্জ্জনকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে কিন্তু তাহারা যে আদর্শ হইতে অধঃপতিত ইহা আমরা বেশ জানি। পক্ষান্তরে একথাটি অতি সুন্দর যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য তাঁহারাও স্বেচ্ছায় দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করা, উন্নতিলাভের উপায় বলিয়া বোধ করেন। টাকা ও ভগবান্, এ দু'য়ের পূজা এক সঙ্গে চলে না—ইহা ধ্রুব সত্য। এখন দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটীকে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জড়বাদ-দৈত্যের নিষ্পেষণে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহারা টাকা-আনা-পাই দিয়া উন্নতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে। মার্কিণ-বিত্ত তাহাদের চক্ষে চরমোন্নতির মানদণ্ড। অন্যান্য জাতিসমূহ মার্কিণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় ফাটিয়া মরে। আমাদের দেশেও অনেকের মুখে একথা শুনিয়াছি যে, আমরা মার্কিণের মত ঐশ্বর্য্য-শালী হইব, অথচ উহার প্রণালী পরিগ্রহ করিব না। আমার মতে ঐরূপ চেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। একই সময়ে জ্ঞানী, সংযমী অথচ ক্রোধোন্মত্ত হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা যাহাতে নৈতিক বলে জগতে গুরুর আসন অধিকার করিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষা নেতৃগণ আমাদের দিন। শুনিয়াছি,—আমাদের এদেশে পূর্ব্বে দেবতারা বাস করিতেন। যে দেশ কল-কারখানার চিম্‌নি-নির্গত ধূমপুঞ্জে ও অশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দে বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে—যে দেশের রাজপথসমূহে ইঞ্জিন-চালিত বেগমান্ বাষ্পীয় রথ নিয়ত শত শত গাড়ী টানিয়া ছুটিয়াছে—গাড়ীর

যাত্রিগণ জানে না যে তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, বরং তাহারা প্রায়ই অন্যমনস্ক, ঝাঁকার মাছের মত ঠাসাঠাসি ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহারা চির অস্বস্তি ভোগ করিতেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এমন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছে যে, সুযোগ পাইলেই তাহারা উহাদের উচ্ছেদ করিবে অথবা উহারা তাহাদের উচ্ছেদ করিবে—এমন দেশে দেবতার বাস সম্ভবপর নহে। দেশের এইরূপ অবস্থা ধনসম্পদ বৃদ্ধির নিদর্শন বলিয়াই, আমি এ কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহাতে কিন্তু আমাদের সুখ বৃদ্ধি এতটুকুও হয় না। এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আদিম যুগের ইতিহাস যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, সে কালে লোকের ন্যায়নিষ্ঠা, নৈতিক আদর্শ ও চরিত্র বল আজকালের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? দ্রুত ধন বৃদ্ধি, এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধির ফলে, আমাদের স্থূল সভ্যতার আড়ম্বর অত্যন্ত বাড়িয়াছে, খৃষ্টানীয় বাহ্যিক জাঁকজমক ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দুশ্চরিত্রতা এত সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। সমাজের এমন দুরবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। নরনারী ও বালক-বালিকার রক্ত শোষণ করিয়া কলকারখানাগুলি চারিদিকে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। দেশের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ নৈতিক অধঃপাতের মুখে ছুটিয়াছে। আয়ুক্ষয়কর ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, ব্যভিচার, উৎকোচ, জুয়াখেলা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। দেশের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের পথ কলুষিত হইয়াছে, অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে মৃত্যু ও আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে, অকালপ্রসূত বিকলাঙ্গ সন্তানের হার উত্তরোত্তর অধিক হইয়া পড়িয়াছে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ডাইভোর্স (বিবাহ-বিচ্ছেদ) আদালতের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধনবত্তার ও অবসর-বাহুল্যের আর একটা দিক্ ধরা পড়ে। আমার জনৈক বন্ধু বহুদিন লণ্ডন সমাজে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে নিশ্চয়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, তথায় কি সহরে কি পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই সময়ে সময়ে এরূপ নৈশ আমোদ-প্রমোদের আড্ডা বসিয়া থাকে যে, সেকালে নিতান্ত স্খলিতচরিত্র সম্রাটদের সময়েও সেরূপ দেখা যাইত না। যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই না। রোম রাজ্যের উত্থান অবধি পৃথিবীতে যুদ্ধ ত লাগিয়াই আছে। এখন সভ্য লোকেরা অবশ্য যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন। তথাপি রাজশক্তিসমূহের ভাণ্ডারে যুদ্ধের জন্য যে প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্র সুজ্জিত রহিয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে (তাঁহারা শান্তির পক্ষে মুখে যতই কেন সাধুতা ঘোষণা করুন না) ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে নৈতিক বলের প্রভাব প্রায় নাই।"

বৃটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস বৃটেনের অন্তর্নিহিত নৈতিক শিক্ষা হইতে আমরা কিছুই লাভবান হইব না ; বরং আমরা যদি সাবধান না হই, তাহা হইলে সেদেশের অধিবাসিগণ জড়বাদরূপ ব্যাধির আক্রমণে যে গুরুতর পাপে নিমজ্জিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে গিয়া পড়িব। আমরা যদি আমাদের সভ্যতা ও আমাদের নীতি ঠিক অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যদি অতীত গৌরবের জন্য বৃথা আস্ফালন না করিয়া, আমাদের জীবনে প্রাচীন নৈতিক মহত্ব ফুটাইয়া তুলি এবং আমাদের জীবন অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ গঠন করি,তাহা হইলেই বৃটিশ সংস্রবে আমরা লাভবান হইতে পারিব। ঐরূপ পন্থাবলম্বন করিলে আমরা বৃটেনের উপকার করিতে পারি এবং নিজেরাও লাভবান হইব। পক্ষান্তরে এদেশের শাসক সম্প্রদায় বৃটেন হইতে আসেন বলিয়া যদি আমরা সে দেশের অনুকরণ

করি, তাহা হইলে তাঁহারা ও আমরা উভয়েই অধঃপাতে যাইব। আদর্শ দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। তাহা কার্য্যে পরিণত করাও নিতান্ত দুরূহ নহে। সুবর্ণ অপেক্ষা সত্য যখন আমাদের অধিক আয়ত্ত হইবে, ক্ষমতা ও ধনের আড়ম্বর অপেক্ষা নির্ভীকতার সমাদর যখন আমরা শিখিব, স্বার্থপরতা অপেক্ষা ত্যাগের মহিমায় যখন আমরা গৌরব বোধ করিব, তখন আমরাই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলিয়া জগতে পরিগণিত হইব। আমরা যদি আবাস-গৃহ হইতে রাজপ্রাসাদ হইতে—দেব-দেউল হইতে—বৈভব-ভূষা মুছিয়া তাহার স্থানে নৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া সৈন্য পোষণের বিপুল ব্যয় বহন না করিয়াও যে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিব। আসুন, আমরা অগ্রে ভগবানের রাজ্য খুঁজিয়া লই—তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা অনুসরণ করি। তাহা হইলে তাঁহারই অখণ্ডনীয় অঙ্গীকার অনুসারে আমরা সকল সম্পদ লাভ করিব। ইহাই প্রকৃত অর্থনীতি। আমরা যেন ইহা আয়ত্ত করিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করিতে পারি।

কায়িক বল বনাম মনের বল

মানুষের কায়িক বল অপেক্ষা মনের বল কত অধিক শক্তিশালী, শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত কয়েকটী কথায় তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ যেন সর্ব্বদিকশাণিত তরবারির মত কার্য্যকরী। যে কোনরূপে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যিনি ইহা ব্যবহার করেন তাঁহার যেরূপ মঙ্গল লাভ হয়, যাঁহার বিরুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হন, তিনিও সেইরূপ মঙ্গল লাভ করেন; অথচ ইহার ফলে এক বিন্দু রক্তপাত পর্য্যন্ত হয় না। ইহার ফল বহুদূরগামী। ইহাতে মাড়িচা ধরে না;

কেহ ইহা চুরি করিতেও পারে না। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রতি-যোগিতায় কোন পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধরূপ কৃপাণ রক্ষার নিমিত্ত পিধানের প্রয়োজন নাই; কেহ উহা জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেও পারে না।

স্বদেশী-পণ

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতের জনসাধারণকে 'স্বদেশী'-ব্রত গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে উপদেশ প্রদান করেন,—

ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া আমি শপথপূর্ব্বক ঘোষণা করিতেছি যে, অদ্য হইতে আমার নিজের জন্য যে বস্ত্র প্রয়োজন হইবে, তাহা ভারতীয় তূলা, রেশম বা পশম দ্বারা ভারতে নির্ম্মিত বসনেই পূরণ করিব—বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিরত থাকিব এবং আমার নিকট যে সকল বিদেশী বস্ত্র আছে, তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

শপথ পালনের উপায়

এই শপথ নিখুঁতভাবে পালন করিতে হইলে, হাতে কাটা সূতা দ্বারা যে কাপড় হাতে বোনা হয়, সেই কাপড় ব্যবহার করাই প্রয়োজন। ভারতীয় তূলা হইতে বিদেশে সূতা প্রস্তুত হইয়া, সেই সূতা যদি এদেশে আমদানি হয় এবং তাহা দ্বারা যদি এদেশেই বস্ত্র বয়ন করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্ত্র স্বদেশী বস্ত্র নহে। আমাদের দেশের চরকায় যদি এদেশ-জাত তূলা হইতে এদেশেই সূতা কাটা হয় এবং সেই সূতায় এদেশের হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র বয়ন করা হয়, তবেই আমরা প্রকৃত স্বদেশী-বস্ত্র পাইতে পারি এবং সেই অবস্থায় আমাদের স্বদেশী, খাঁটী স্বদেশী বলিয়া:

পরিগণিত হইবে। কিন্তু উপরে যে শপথের কথা লিখিত হইল, তাহা রক্ষার নিমিত্ত এতটা কড়াকড়ি না করিলেও চলিবে। বিদেশ হইতে আনীত কলে ভারতীয় তূলায় স্থতা কাটিয়া, সেই স্থতা দ্বারা ঐরূপ কলে যে কাপড় বয়ন করা হয়, তাহা ব্যবহার করিলেই আমাদের শপথ রক্ষিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বদেশী-পণ গ্রহণকারিগণ শুধু স্বদেশী-বস্ত্র ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; তাঁহারা অন্যান্য জিনিসের সম্বন্ধেও এই পণ যথাসম্ভব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন।

ইংরাজ মালিকের কাপড়ের কল

শুনিয়াছি যে, ভারতে এমন কতকগুলি কাপড়ের কল আছে, যাহাদের মালিকেরা ইংরাজ; ঐ সকল কলে ভারতীয় অংশীদারদের লওয়া হয় না। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার মতে ঐ সকল কলে নির্ম্মিত বস্ত্র, বিদেশী বলিয়াই গণ্য হইবে। বিশেষতঃ ঐরূপ বস্ত্র, বিদ্বেষের কলঙ্কে অনুলিপ্ত। ঐরূপ বস্ত্র যতই সুনির্ম্মিত হউক না কেন, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ লোকই চিন্তা করিয়া দেখে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে দেশের হিত বা অহিত সাধিত হইতেছে কিনা, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত—যাঁহারা চিন্তাশীল—যাঁহাদের বিচার-শক্তি পরিপক্ক হইয়াছে—যাঁহারা স্বদেশসেবায় ব্রতী হইতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাদের পক্ষে আপনার প্রত্যেক কার্য্য (তাহা ব্যক্তিগতই হউক বা জাতিগতই হউক) উল্লিখিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পরে যে সকল আদর্শ জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যাহার শুভ ফল ব্যবহারলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা সুপ্রতিপাদিত হইবে, তাহা জনসাধারণের

সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত; কারণ গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

এ পর্য্যন্ত দেশের চিন্তাশীল নরনারীগণ এই ভাবে আত্মপরীক্ষায় ব্রতী হন নাই। এই অবহেলার জন্যই এ জাতি অনেক দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। ধর্ম্মের অনুভূতি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে, তবে ঐরূপ আত্মপরীক্ষা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।

ভ্রান্ত ধারণা

এদেশের হাজার হাজার লোকের বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় কলসমূহে নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলেই স্বদেশী-পণ রক্ষিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ মিহি কাপড়, ভারতের বাহিরে বিদেশী তুলায় উৎপাদিত মিহি সূতা দ্বারা বয়ন করা হয়। সুতরাং ঐরূপ বস্ত্রের বয়ন ব্যতীত অপর কোন কাজই ভারতে হয় না। এমন কি হস্তচালিত তাঁতেও বিদেশী সূতা দ্বারা মিহি কাপড় বয়ন করা হইয়া থাকে। ঐরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিলে স্বদেশী-পণ রক্ষা করা হয় না, পরন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা করা হয়। স্বদেশী ব্যাপারেও সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সত্যপালন প্রয়োজন। পুরুষগণ যখন বলিবে,—'কেবল কোমরে জড়াইবার মত কাপড়টুকু পাইলেই হইল, তথাপি আমরা খাঁটী স্বদেশী পালন করিব' এবং স্ত্রীলোকগণ যখন বলিবে,—'লজ্জাশীলতা রক্ষা করিতে পারা যায়, এইরূপ কাপড় পাইলেই আমাদের যথেষ্ট, তথাপি আমরা খাঁটী স্বদেশী পালন করিব'—সেই সময়েই স্বদেশীর মহাপণ পালনে আমরা কৃতকার্য্য হইব। কয়েক সহস্র মাত্র নরনারী যদি এইভাবে স্বদেশী-পণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর সকলে যতটা সম্ভব তাহাদের অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। ক্রমে তাহারা

তাহাদের গৃহস্থালীর তাবৎ পরিচ্ছদ স্বদেশী কি না, ইহা পরীক্ষা করিতে থাকিবে। যাহারা বিলাসব্যসনে মত্ত নহে, তাহারা এদেশে স্বদেশী-সাধনা অনেকটা জাগাইয়া তুলিতে পারে, ইহা আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

আর্থিক দুর্গতির প্রতিকার

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতে এমন গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে তন্তুবায় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষক, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার,সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি কারুজীবিগণ বসবাস করিতেছে। এখন কিন্তু কৃষকেরা নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। জোলা-তাঁতীর কাপড় গরীব লোকেরাই পরে। আমরা যদি ভারতীয় তুলায় ভারতে-কাটা সূতা তাহাদিগকে যোগাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারাই আমাদের বস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারে। প্রথম প্রথম কিছু দিন তাহা মোটা হইতে পারে, কিন্তু অনবরত চেষ্টা করিলে আমাদের এই সব গ্রাম্য তন্তুবায় মিহি সূতা দ্বারা মিহি কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে। ইহাতে আমাদের তাঁতী ও জোলাদের অবস্থা উন্নত হইবে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই, আমরা বিপদ্‌-সাগর সহজেই অতিক্রম করিতে পারিব। আমরা অনায়াসেই আমাদের সন্তানসন্ততিদের সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখাইতে পারি। ইহাতে আপন গৃহে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, তাহাপেক্ষা বিশুদ্ধ বস্ত্র আর কি হইতে পারে? আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে আমি বলিতে পারি যে, এই ভাবে কার্য্য করিলে আমরা অনেক দুর্দ্দশা এড়াইতে পারিব এবং অনেক অনাবশ্যক জিনিসের অভাব হইতে মুক্তিলাভ করিব। তখন আমাদের জীবন আনন্দময় ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইবে। আমার কাণে সর্ব্বদাই এই দৈববাণী হয় যে, এক সময়ে ভারতে লোকের জীবন প্রকৃতই ঐরূপ

ছিল। ভারতের এই অবস্থার কথা যদি কবি-হৃদয়ের আশার স্বপ্নও হয়, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। এখন ভারতবর্ষকে ঐরূপে গড়িয়া তোলা কি প্রয়োজন নহে? আমাদের পুরুষার্থ কি উহাতেই নিবদ্ধ নহে? আমি সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি। দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন আর আমি সহ্য করিতে পারি না। বালক বৃদ্ধ সকলেরই মুখে এক কথা,—'আমরা সুলভে বস্ত্র পাই না, বেশী দাম দিয়া কাপড় কিনিবার শক্তি আমাদের নাই। খাদ্যদ্রব্য, কাপড় প্রভৃতি সকল জিনিসই অগ্নিমূল্য, এখন আমরা কি করি?' তাহাদের মুখমণ্ডল নৈরাশ্যের অবসাদে মলিন। এই সকল লোককে একটা সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। প্রত্যেক দেশসেবকেরই এই উত্তর দেওয়া উচিত; কিন্তু আমি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের সমস্ত কাঁচা মাল ইউরোপে রপ্তানি হইবে এবং তজ্জন্য আমাদিগকে উচ্চ মূল্য দিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর পক্ষেই তাহা অসহনীয় হইয়া উঠে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র পন্থা—স্বদেশী। কাহারও নিকট আমাদের দেশের তূলা বিক্রয় করিতে আমরা বাধ্য নহি। সারা হিন্দুস্থান যখন স্বদেশী-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে, তখন তূলা উৎপাদনকারী কোন কৃষকই বিদেশে জিনিস প্রস্তুতের জন্য তূলা বিক্রয় করিবে না। স্বদেশী-মন্ত্রে দেশ যখন সমাচ্ছন্ন হইবে তখন সকলেরই মনে এই চিন্তা জাগিবে যে—যে দেশে তূলা জন্মে সেই দেশেই উহা পরিষ্কৃত, সূত্রাকারে পরিবর্ত্তিত ও বস্ত্র রূপে নির্ম্মিত না হইবে কেন? স্বদেশী-মন্ত্র যখন সকলের কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিবে, তখন লক্ষ লক্ষ লোক ভারতের আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবে। ইহার নিমিত্ত হাজার হাজার বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হইবে না। ধর্ম্মের ভাব যখন জাগিয়া উঠিবে, তখন একমুহূর্ত্তের মধ্যে লোকের চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ছুটিবে। ঐ জন্য কেবল

নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এই আত্মত্যাগের ভাব ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই শুভ মূহুর্ত্তে যদি আমারা স্বদেশী প্রচারে অসমর্থ হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে মহা নৈরাশ্যে হাত গুটাইতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি, খৃষ্টান, ইহুদী—যিনি আপনাকে এদেশের অধিবাসী বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহাকেই আমি স্বদেশী-পণ গ্রহণ করিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আমি তাঁহাদের নিকট আরও অনুনয় করিতেছি যে, তাঁহারা আপনাদের আত্মীয়-স্বজনগণকেও এই স্বদেশী-পণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করুন। আমার বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি আমাদের দেশের জন্য এই সামান্য কার্য্যটুকু করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের এদেশে জন্ম বৃথা। যাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ স্বদেশীর মধ্যেই খাঁটী অর্থনীতি নিহিত রহিয়াছে। আশা করি প্রত্যেক নরনারী আমার এই বিনীত প্রস্তাব নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিবেন। ইংরাজের অর্থনীতির অনুকরণ করিতে গেলে, আমরা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত হইব।

স্বদেশী ও বয়কট্

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল দিল্লী রওনা হইবার পুর্ব্বে শ্রীযুক্ত গান্ধী স্বদেশবাসীকে নূতন উদ্যমে স্বদেশী-পণ গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করেন। তৎকালে তিনি স্বদেশী ও বয়কটের পার্থক্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলেন,—

স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন এক নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বদেশীর ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধানে সকলেরই যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। উৎসাহের অভাবে অনেক স্বদেশী

শিল্প প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, তাঁহাদের যুক্তি আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না; কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল কয়েক লক্ষ মাত্র লোক স্বদেশীপণ গ্রহণ করিলে, তাহারই চাহিদা স্বদেশজাত দ্রব্যে পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি বিলাতী জিনিস 'বয়কটে'র বিরোধী; কারণ উহার মধ্যে অশান্তি ও বিরক্তির ভাব বিদ্যমান। আমলাতন্ত্রের (Bureaucrats) সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কুভাব আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। এজন্য আমি 'বয়কট্' নীতির সমর্থন করিতে অপারগ। স্বদেশীর অর্থ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই আত্মত্যাগ। অতএব স্বদেশী দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই স্বদেশহিতৈষীরূপে সততায় ও ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। যাঁহারা স্বদেশী-পণ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বিদেশী দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে দগ্ধ করিতে হইবে। এই পণ গ্রহণে দু'দিন বিলম্ব করিলে কোন ক্ষতি নাই; তবে বর্ত্তমান আন্দোলনের সাফল্য লাভকল্পে পণগ্রহণকারীর সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল।

ভারতীয় শাসন-সংস্কার

ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্স-ফোর্ডের প্রস্তাবিত 'স্কিম্' প্রকাশিত হইবার পর, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত গান্ধী মাদ্রাজের জননায়ক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখেন,—

সম্প্রতি প্রকাশিত শাসন-সংস্কার 'স্কিম্' সম্বন্ধে আমার অভিমত সাধারণকে জানাইবার জন্য আপনি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। 'কংগ্রেস' ও 'লিগ্' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নে আমি বিশেষ

উৎসাহ বোধ করি নাই, তাহা আপনি জানেন। দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ভিতর আমি নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি নাই। কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া আমি ইহাও জানাইতেছি যে, উৎসাহী ও তিক্ষ্ণধী রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে প্রস্তাবিত স্কিম্‌টী যেমন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য, আমি এখনও সেরূপভাবে উহা পাঠ করিতে পারি নাই।

আমার মতে, এই সংস্কার স্কিম্‌টী রচনা-কৌশলে 'কংগ্রেস' ও 'লিগ্‌' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব হইতে শ্রেষ্ঠতর। আমি ইহা স্বীকার করি যে, মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌সফোর্ড উভয়েই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ২০শে আগষ্টের মহাঘোষণা পরিপূরণে ও ভারতের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত জটিল ও দুরূহ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁহারা বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমি ইহা না বলিয়াই পারি না যে, আমরা নির্ব্বিচারে অবিলম্বে ঐ সংস্কার স্কিম্‌টী বর্জ্জন করিলে উহা ভারতের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আমার মতে এই সংস্কার স্কিম্‌টাকে সরাসরি নস্যাৎ না করিয়া, সহৃদয়তার সহিত উহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ উহা নানা রকমে সংশোধন করিয়া, সংস্কারগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। মোটামুটি 'কংগ্রেস' ও 'লিগ্‌' প্রণীত সংস্কার-প্রস্তাবই আমাদের মাপকাঠি। 'কংগ্রেস' ও 'লিগ্‌' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব যতই স্থূল হউক না কেন, তদন্তর্গত যাবতীয় প্রার্থিত অধিকারগুলি এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ চেষ্টা করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে, শাসন-ব্যাপারে বাটোয়ারা-নীতি বর্জ্জন করা হউক। প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে দ্বৈত (Dual) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রাথমিক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ আদৌ ঘটিবে কিনা, ইহাই আমার আশঙ্কা; অথচ আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ঐ সাফল্যের উপরই নির্ভর

করিতেছে। অতএব কোন কোন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব, সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে একচেটিয়া করিয়া রাখার কল্পনা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। আলোচ্য স্কিমে একটা শোচনীয় সন্দেহ পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আমরা যেন খাঁটী বৃটিশ স্বার্থ ও খাঁটী ভারতীয় স্বার্থ—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য করিব। এই সন্দেহের নিদর্শন, সংরক্ষিত বিষয়সমূহের (Reserved Subjects) সুদীর্ঘ তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে। আমার মতে ঐ সকল স্বার্থ সম্বন্ধে সরলভাবে নিঃসঙ্কোচে স্পষ্টাপষ্টি বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। বৃটিশ রাজনীতিকগণ পৃথক্‌ভাবে অথবা বৃটিশ ও ভারতীয় রাজনীতিকগণ সম্মিলিত হইয়া যত বড় স্কিমই প্রস্তুত করুন না কেন, ঐরূপ বোঝাপড়া হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। একান্ত শিষ্টভাবে অথচ অতীব দৃঢ়তার সহিত ইহাই বলিতে চাই যে, ঐ সকল স্বার্থের আলোচনাকালে সারা ভারতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে রাখিতে হইবে। সুতরাং যে স্বার্থ ভারতের উন্নতির যতটুকু প্রতিকূল তাহা ততটুকু খর্ব্ব করিতেই হইবে।

অতএব আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি এদেশের সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতাম। আমাদের স্বদেশজাত যে সকল দ্রব্যকে বৈদেশিক জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, আমার সাধ্য থাকিলে, সেই সকল শিল্প রক্ষার জন্য বিদেশাগত দ্রব্যজাতের উপর গুরু করভার নির্দ্দেশ করিতাম। আমি সরকারী কার্য্য হইতে বৃটিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিতাম—কেবল উপদেশ দান ও কার্য্য পরিচালনার জন্য যতগুলি দরকার ততগুলি রাখিতাম।

বিজেতার দাবী ব্যতীত অপর কোন দাবী তাঁহাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে

আমরা যেমন প্রনষ্ট শক্তি লাভ করিতে থাকিব, তেমনই তাঁহাদের দাবীও খর্ব্ব হইতে থাকিবে। অবশ্য ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার কথা যে, তাঁহারা বিজেতা বলিয়া কোন দাবী উত্থাপন করেন নাই।

শাসন-সংস্কার রিপোর্টে ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের কর্ত্তব্য সাধনে নিষ্ঠা ও দক্ষতা সম্বন্ধে যে সুখ্যাতি করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমরা একমত না হইয়া পারি না। আর্থিক হিসাবে ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যোগ্যতার অতিরিক্ত বেতন ও পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের গুণাবলী আয়ত্ত করাই আমাদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। এদেশে শাসন কার্য্যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য যে অত্যধিক ব্যয় হইতেছে, তাহা ধ্বংসকর। যে শাসন-সংস্কার ঐ ব্যয়ভার লাঘব না করিবে, তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। আইন, সুশাসন ও শান্তি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবার জিনিস। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ ভীষণতম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছে। অতএব সংস্কারকগণকে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এদেশের জনসাধারণ যে গুরু করভারে প্রপীড়িত হইতেছে, তাহা যেন লঘু হয়—কর যেন আর কিছুতেই বর্দ্ধিত না হয়। এই মূল নীতিটী যদি কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বলিতে পারি যে, অন্যান্য বিষয়ে বৃটিশ স্বার্থ তাঁহাদের নিজেদের হাতে যেমন সুরক্ষিত, ভারতীয়গণের হাতেও ঠিক তেমনই সুরক্ষিত রহিবে।

কংগ্রেস ও মোসলেম লিগ, সিভিল-সার্ভিসের উচ্চ পদগুলির শতকরা পঞ্চাশটী দেশীয়গণের জন্য এখনই দাবী করিয়াছেন। আমরা সম্মান সহকারে, দৃঢ়তার সহিত, ঐরূপ দাবীই করিব।

জাতীয় ভাষা

ভারতের জাতীয় ভাষা (Lingua franca) কি হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

এদেশের জাতীয় ভাষা এমন হওয়া চাই, যাহা দ্বারা নিম্নলিখিত পাঁচটী সর্ত্ত পূরণ হইতে পারে,—

(১) রাজপুরুষগণ যেন তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন।

( ) জনসাধারণ যেন তাহা দ্বারা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে পরস্পরের মনোভাব সহজে আদান-প্রদান করিতে পারে।

(৩) অধিকাংশ লোক যেন সেই ভাবায় কথাবার্ত্তা কহে।

(৪) সাধারণ লোকে যেন সহজে সেই ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(৫) ঐ ভাষা কেবল সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য অস্থায়ী-ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া যেন বিবেচিত না হয়।

উল্লিখিত পাঁচটী সর্ত্তের কোনটীই ইংরাজী ভাষার দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র হিন্দী ভাষা, এই কয়টী সর্ত্ত পূরণে সক্ষম। মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দী এদেশের জাতীয় ভাষা ছিল। মুসলমান বাদসাহগণ হিন্দীর পরিবর্ত্তে আরবী বা ফারসী ভাষা প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই।

উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমানগণ হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। ঐ ভাষা দেবনাগরী ও আরবী, এই দুইরূপ অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দী, ঠিক সংস্কৃত নহে—আরবী নহে—ফারসীও নহে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের ভাষা। উহার মধ্যে আমি যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, তাহা লক্ষ্ণৌর ফারসী-মিশ্রিত ভাষায় বা প্রয়াগের

পণ্ডিতমণ্ডলীর কথিত সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় দেখিতে পাই না। আশা করি হিন্দী ও উর্দ্দূ পরস্পর মিলিত হইয়া অনন্তকাল প্রচলিত থাকিবে; মুসলমানেরা ফারসী ও হিন্দুগণ দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার করিবেন। উভয়বিধ অক্ষরই জাতীয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। মুসলমানেরা উর্দ্দূকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন যদি হিন্দী-উর্দ্দূ বিতণ্ডা মিটিয়া যায়, তাহা হইলে জাতীয় ভাষার সমস্যা সহজেই সমাধান হইবে। আমাদিগকে যদি ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দী-উর্দ্দূ বিতণ্ডা বন্ধ করিতেই হইবে। আমি ইংরাজী ভাষার বিরোধী নহি; তবে মনে করি যে, কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইংরাজীর সাহায্যে অর্জ্জিত হইতে পারে।

মাতৃভাষার উপযোগিতা

ডাক্তার মেটার লিখিত "স্বায়ত্ত-শাসন সিরিজ" নামক পুস্তকাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা জাতীয়তার হিসাবে নিতান্ত প্রয়োজন। মাতৃভাষা উপেক্ষা করিলে জাতির আত্মহত্যা ঘটে। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দানের সমর্থনকারী অনেক মাতব্বর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়গণ এদেশে দেশহিতকর ও জনহিতকর তাবৎ অনুষ্ঠানের পরিচালক; সুতরাং ইংরাজী না শিখিলে কিছুতেই চলিবে না। বস্তুতঃ এদেশে সমস্ত শিক্ষাই ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে আমরা শিক্ষার জন্য যতটা সময় ক্ষেপণ করি, তদনুরূপ ফল পাই না। জনসাধারণের উপর আমাদের কোন হাত নাই।

এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বড়লাট যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি ঐ সমস্যার সমাধান কিছু করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপযোগিতা বিশেষ-ভাবে অনুভব করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপে ইহুদীগণ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ও ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত একটী সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ইহুদী ভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুস্তকরাজি ইহুদী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহুদীরা বহু বৈদিশিক ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও, তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা তাহাতে মিটে নাই। উচ্চশিক্ষিত ইহুদীগণ সাধারণ ইহুদীদের বৈদেশিক ভাষা শিখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না। ফলে, যে ইহুদীভাষা এক সময়ে শুধু মৌখিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল—ইহুদী সন্তানগণ যাহা জননীর মুখে শুনিয়া শিখিত—তাহাই আজ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে। ইহা সত্য সত্যই অদ্ভুত। এক পুরুষের মধ্যেই এতটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেকালে ওয়েব্‌ষ্টার অভিধানে এই ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন মৌখিক ভাষা—নানা দেশের ইহুদীরা ইহা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'এখন কিন্তু ইহুদী ভাষার সংজ্ঞা ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের ইহুদীগণ অসম্মান বোধ করিবেন। ইহুদী পণ্ডিতেরা যদি এক পুরুষের মধ্যে তাঁহদের সম্প্রদায়ের সকলকে এমন একটা গৌরবজনক উন্নত ভাষার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারেন, তবে আমাদের সুমার্জ্জিত মাতৃভাষার উন্নতি সাধন কি তাহাপেক্ষা সহজ নহে?

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসেও এই শিক্ষা পরিস্ফুট। তথায় 'তাল' (ওলন্দাজ ভাষার অশুদ্ধ সংস্করণ) ও ইংরাজী ভাষার মধ্যে সংঘর্ষ

চলিয়াছিল। বুয়র জনক-জননী, সন্তান-সন্ততিগণের সহিত যে 'তাল' ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিলে ছেলে-পুলেরা উহার চাপে মুস্‌ড়াইয়া যাইবে, ইহা অনুধাবন করিয়া বুয়রগণ কিছুতেই ইংরাজী চালাইতে সম্মত হন নাই। সেখানেও ইংরাজী চালাইবার পক্ষে অনেক মাতব্বর ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে বুয়রগণের স্বদেশ-হিতৈষণার নিকট ইংরাজীর পরাজয় হইয়াছিল। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বুয়রগণ উচ্চ-অঙ্গের ওলন্দাজী ভাষাও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ওলন্দাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহারা সহজ 'তাল' ভাষা শিখাইতে বাধ্য হইলেন। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, সেই 'তাল' ভাষায় অধুনা অনেক সুন্দর সাহিত্য রচিত হইতেছে।

এদিকে আমরা আত্মবিশ্বাসের অভাব হেতু মাতৃভাষার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহা ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ। মাতৃভাষার উপর যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার যতই উদারতা ও সহৃদয়তার সহিত প্রদত্ত হউক না কেন, আমরা কিছুতেই স্বায়ত্ত-শাসনশীল জাতিতে পরিণত হইতে পারিব না।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের কুফল

বোম্বাই—বরোচে 'গুজরাট শিক্ষা সম্মেলনে'র সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ছাত্রগণকে কোন্ ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে দুই রকম মত শুনিতে পাওয়া যায়ঃ একদল

বলেন, মাতৃভাষায় (গুজরাটী) শিক্ষাদান করা উচিত; আর একদল ইংরাজীর পক্ষপাতী। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য সৎ। উভয় দলের লোকেরাই দেশের মঙ্গল কামনা করেন; কিন্তু সঙ্কল্প সাধু হইলেই ত ইপ্সিত সুফল লাভ হয় না। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্য সৎ হইলেও লোকে অনেক সময়ে অসৎ পথে গিয়া পড়ে। অতএব উভয় মতের ভালমন্দ বিচার করিয়া দেখা যাউক। এই জটিল সমস্যাটি সারা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য। তবে প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বসাধারণের একতার অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী মীমাংসাও করিতে পারেন।

এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকটা সহজ হইবে। বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাসায় শিক্ষাদানে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অনেক টাকা ঢালিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহাদের চেষ্টা বিফল প্রতিপন্ন হয়। আমার মতে ঐ কার্য্যের ব্যবস্থাপকগণ ও শিক্ষকগণ নিজেদের উপর বিশ্বাসবান ছিলেন না বলিয়াই, তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরাজী ভাষার মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালীরা ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষার সৌকর্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি বলি যে, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত সুললিত বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার ইংরাজী জ্ঞানের ফল নহে। ভারতের আব্‌হাওয়ায় তিনি ঐ ভাব-সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছেন। উহা উপনিষদের দান। মহাত্মা মুন্সীরাম ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দী ভাষার যে উন্নতি-বিধান করিয়াছেন, তাহা ইংরাজী শিক্ষার ফলে নহে। তুকারাম ও রামদাস প্রমুখ যে সকল লেখক মারাঠী ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজীর নিকট আদৌ ঋণী নহেন। কবি প্রেমানন্দ ও শ্যামল ভাট হইতে আরম্ভ করিয়া দলপৎরাম পর্য্যন্ত যে সকল সুধী সাহিত্যিক গুজরাটী ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ইংরাজী ভাষার দাবী কিছুই নাই।

ভাষার গঠন কিরূপে হয়? আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক জাতির চরিত্র অনুসারে তাহার ভাষা সংগঠিত হইয়া থাকে। যে জাতির প্রকৃতি ও কার্য্য-কলাপ যেরূপ, তাহার ভাষাও সেইরূপ। আমরা যে সাতিশয় সুমার্জ্জিত ও ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করি, ইহাতে বুঝা যায় যে, এ জাতি বহু পুরুষ যাবৎ পরাধীন রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় বহু নাবিক (nautical) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটী ভাষায় তাহা আনয়ন করা যায় না; তবে যদি আমরা কখনও জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে নাবিক-শব্দ আপনা-আপনি আমাদের ভাষায় দেখা দিবে।

আর্য্য সমাজের নেতৃগণ গুরুকুল বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া প্রভূত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের অভিমত এই যে, যে বিষয় ইংরাজী ভাষায় আয়ত্ত করিতে ছাত্রগণের ষোল বৎসর লাগে, তাহা তাহারা মাতৃভাষায় দশ বৎসরে শিখিয়া ফেলে। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে এদেশে হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষাকাল যদি ছয় বৎসর বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা জাতির পক্ষে বড় কম লাভ নহে। বিদেশী ভাষার মারফতে শিক্ষালাভ করিতে হয় বলিয়া আমাদের দেশের যুবকেরা দিন দিন শক্তিহীন, উৎসাহহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা বিবর্ণ—চিররুগ্ন—পরানুকরণে অভ্যস্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম, মৌলিকতা, সাহসিকতা, বিচারশক্তি

ও নির্ভীকতা সঙ্কুচিত হয়। তাহারা যাহা আরম্ভ করে, তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে দু'একজন যদি বা উৎসাহের পরিচয় দেয়, তাহারা অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ যেমন সংযমী তেমনই সবলকায়। আমাদের মত বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সমাজিক কুপ্রথা তাহাদের ভিতর নাই। কিন্তু সেখানে ওলন্দাজী ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হওয়ায় তাহারাও আমাদের মত দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তাহারা এখন পাশ্চাত্য রীতি-নীতির বিফল অনুকরণে নিবিষ্ট। মাতৃভাষা হারাইয়া তাহারা সমস্ত উত্তম ও মৌলিকতা বিসর্জ্জন দিয়াছে।

ইংরাজী-শিক্ষিত আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। জনসাধারণের উপর আমাদের প্রভাব কতটুকু, ইহা ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতির পরিমাণ কতকটা ধরা পড়ে। আমাদের মধ্যে জনৈক 'বসু' বা জনৈক 'রায়' জন্মিয়াছেন বলিয়া আমরা গর্ব্ব প্রকাশ করি। কিন্তু আমি জোরপূর্ব্বক বলিতেছি যে, গত পঞ্চাশ বৎসর যদি আমরা দেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এত 'বসু' বা এত 'রায়' জন্মিতেন যে, তাঁহাদের নামে আর বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইত না। জাপানীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে বলিয়াই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। শিক্ষা-বলে তাহারা নূতন প্রাণ পাইয়াছে—তাই সারা পৃথিবী তাহাদের কার্য্য-কলাপে অবাক্! বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষালাভের কুফল অনেক। মাতৃ-স্তন্যের সঙ্গে যে শিক্ষা-দীক্ষা আমরা পাই, তাহার সহিত বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকা চাই। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে, এ সামঞ্জস্য থাকে না। যিনি এই সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যতই সৎ হউক, তিনি দেশের শত্রু। ইহার কুফল কেবল এইটুকু

নহে। বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে, এ দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যবধান জন্মিয়াছে।

বিপ্লববাদ

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় কলেজ স্কয়ারে 'ষ্টুডেন্টস হল' ভবনে বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের তৎকালীন সদস্য অনারেবল মিঃ লায়নের সভাপতিত্বে আহূত সভায়, শ্রীযুক্ত গান্ধী ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলেন,—

যদিও আমার পরলোকগত গুরু মিঃ গোখেল আদেশ করিয়াছিলেন যে, এখানে অবস্থানকালে আমি শুধু সকল কথা শুনিয়া যাইব, পরন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিব না, তথাপি এই সভায় বক্তৃতা করিবার প্রলোভন আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলিতেন যে, ছাত্রগণের পক্ষে রাজনীতি-চর্চ্চা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নহে। আমারও অভিমত তাই। ছাত্রগণ কেন রাজনীতি অধ্যয়ন করিবে না এবং কেনই বা তাহারা রাজনীতির সংস্রবে থাকিবে না, ইহার হেতু আমি বুঝিতে পারি না। আমার মতে রাজনীতি ধর্ম্মবর্জ্জিত হওয়া উচিত নহে। ছাত্রগণ! আশা করি তোমরা আমার সহিত, তোমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সহিত এবং সম্মানভাজন সভাপতির সহিত এ বিষয়ে একমত হইবে যে, সাহিত্য-শিক্ষার ফলে যদি তোমাদের চরিত্র গঠিত না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষার মূল্য কিছুই নাই। ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ছাত্রগণ ও জননায়কগণ সম্পূর্ণ নির্ভয়? আমি এতদিন বিদেশে ছিলাম বটে, কিন্তু এই প্রশ্নই সর্ব্বদা আমার মনে জাগিত। রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড কি, আমি বুঝি। এই বিষয়টী আমি বিশেষ প্রণিধান সহকারে চিন্তা করিয়াছি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এদেশের কতকগুলি ছাত্র

প্রবল স্বদেশ-প্রেমে ও অতুল উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তাহারা জানে না যে, দেশ-হিতৈষণার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি। আমার বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি নীচ উপায় অবলম্বন করিয়াছে; কারণ ভগবানের ভয় তাহারা রাখে না—পরন্তু মানুষের ভয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। আমি যদি রাজদ্রোহের পক্ষপাতী হইতাম, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতাম এবং তাহার ফল নিজেই শির পাতিয়া লইতাম। এরূপ করিলে ভণ্ডামির কলঙ্ক গায়ে লাগে না। ছাত্রগণ ভারতের আশাস্থল—বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভরসাস্থল। তাহারা যদি ভগবানের ভয় না রাখে, পরন্তু মানুষের ভয়ে—কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে অর্থাৎ গভরমেণ্টের ভয়ে (গভরমেণ্টের প্রতিনিধিগণ বৃটনবাসী হউন বা এদেশবাসীই হউন) পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

ছাত্রগণ! তোমরা ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মন সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিও। যে সকল যুবক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা বিপথে ছুটিয়াছে। তাহাদের সহিত কোন সংস্রব রাখা উচিত নহে। তাহারা নিজের শত্রু—দেশের শত্রু; তবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। গভরমেণ্টের উপর আমার বিশ্বাস নাই—কোন গভরমেণ্টই আমি চাহি না। আমার মতে যে গভরমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা কম শাসন করেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার ব্যক্তিগত অভিমত যাহাই হউক, আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, বিপথচালিত যুবকেরা উন্মাদনার বশে ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা করিয়া কোন উপকার করিতে পারিবে না। ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ নহে। ঐ ভাব বিদেশ হইতে আসিয়াছে। উহা এদেশে স্থায়ী হইবে না। ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে যে, অহিতকারীকেও ঘৃণা করিতে নাই; তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গুপ্তহত্যা পাশ্চাত্যভাবের ফল। তোমরা

সাবধান হও—পাশ্চাত্য কুভাব অনুকরণ করিও না। ঐ ভাব সে দেশে কি ক্ষতিই না করিয়াছে! যুবকগণ যদি মনে করিয়া থাকে যে, ঐ ভাব অনুকরণ করিয়া তাঁহারা ভারতের বিন্দুমাত্র মঙ্গল-সাধন করিবে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

ভারতের পক্ষে কোন্ গভরমেণ্ট—বৃটিশ গভরমেণ্ট, না পূর্ব্বতন গভরমেণ্ট—ভাল, ইহা আমি আলোচনা করিব না। তবে আমার ধারণা এই যে, বৃটিশ গভরমেণ্টের বহুল উন্নতি হওয়া এখনও প্রয়োজন।

হে নবীন বন্ধুগণ! তোমরা জীবনে নির্ভয় হইও, মনে মুখে এক রাখিও এবং সতত ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলিও। দেশের প্রতি যদি তোমাদের কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিও। ধর্ম্ম ও নীতি তোমাদের পথ প্রদর্শক হউক। ঐ দুইটী জিনিস বজায় রাখিবার জন্য যদি তোমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হও, আমিও তোমাদের সহযাত্রী হইব। তখন তোমাদের উপদেশ আমি মানিয়া চলিব। কিন্তু তোমরা যদি বিপ্লব উৎপাদন করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।

জননায়কের পুরস্কার কি?

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে মহীশূর—বাঙ্গালোরে নাগরিকগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

লোকে আমার সম্মানার্থ গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে, ইহা আমি পছন্দ করি না। পছন্দ না করিবার একটা কারণ আছে। জনসাধারণ যদি নেতৃগণকে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নেতৃগণের পক্ষে নীরবে কর্ম্ম করাই ভাল। তাঁহারা লোকের নিকট সম্মানিত হইবার আশায় কাজে

লাগিবেন, এই ভাব বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। বরং তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, লোকে হয়ত তাঁহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িবে, অবজ্ঞা করিবে, তথাপি দেশকে ভালবাসিতে হইবে—কারণ স্বদেশ-সেবাই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার।

আমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উঠিয়াছে যে, জাতি হিসাবে আমরা বড়ই আড়ম্বরপ্রিয়; কর্ম্মোপযোগী সংযমশীলতা আমাদের নাই। আমরা এ দোষ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেছি। এখন আমরা আধুনিক কর্ম্ম-প্রবণতার অনুকরণ করিব, না এত দিনের প্রচণ্ড সংঘর্ষেও যে প্রাচীন সভ্যতা জীবিত রহিয়াছে তাহার অনুসরণ করিব? আসুন আমরা আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে রাজনীতি-মঞ্চে কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হই; তাহা হইলে আমরা বিজেতাকেও জয় করিতে পারিব। আমরা যখন আপনাদিগকে ইংরাজের সমকক্ষ নাগরিক বলিয়া মনে করিতে সক্ষম হইব, তখনই অরুণোদয় হইবে। সে দিন শীঘ্রই আসিবে; কিন্তু কবে আসিবে, নির্দ্দেশ করা দুরূহ। সৌভাগ্যক্রমে আমি অনেক চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ইংরাজের সহিত মিলামিশার সুবিধা পাইয়াছিলাম। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়রূপে জানাইতেছি যে, আধুনিক কর্ম্ম-প্রবণতার তরঙ্গ কাটিয়া যাইতেছে; শীঘ্রই জগতে এক অভিনব মহত্তর সভ্যতা আবির্ভূত হইবে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্গত বৃহৎ দেশ; তাহার মধ্যে মহীশূর একটী প্রধান দেশীয় রাজ্য। আপনারা যে দিন বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট ও বৃটিশ রাজ-নীতিকগণের নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করিতে পারিবেন যে, মহীশূরে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আপনারা বশিষ্ঠের মত সর্ব্বজনমানিত মন্ত্রী পাইয়াছেন, সেই দিন বিজেতার নিকট আপনাদের দাবী উত্থাপনের সময় আসিবে।

অহিংসা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'মডারণ রিভিউ' পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর লিখিত একখানি চিঠী এই মর্ম্মে প্রকাশিত হয়,—

অতিরিক্ত অহিংসা অভ্যাসের ফলে আমাদের পুরুষোচিত গুণ নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আমরা জাতি হিসাবে প্রভূত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু গৃহ-বিচ্ছেদে আমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। ফলে এখন স্বদেশপ্রীতির পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে; অর্থাৎ আমরা ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অধর্ম্মের পথে ছুটিয়াছি।

জৈনগণের বিরুদ্ধে পুরুষত্বহীনতার অভিযোগ কতদুর আরোপিত হইতে পারে, আমি বলিতে পারি না। তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। বৈষ্ণবের গৃহে আমার জন্ম—কাজেই বাল্যকাল হইতে অহিংসাচরণে আমি শিক্ষিত হইয়াছি। আমার ধর্ম্মজ্ঞান, জৈনশাস্ত্র পাঠ করিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া অনেকটা গঠিত হইয়াছে। পরলোকগত জৈন দার্শনিক রাজচাঁদ কবির সংসর্গে বাস করিয়া অনেকটা লাভবান হইয়াছি। পৃথিবীর নানা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আমার মনে অহিংসা সম্বন্ধে যে ধারণা গঠিত হইয়াছে, তাহার পোষকতার নিমিত্ত আর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করি না। উহা যেন আমার জীবনের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। সহসা যদি কোন শাস্ত্রগ্রন্থে আমার ধারণার বিপরীত কথা দেখি, তাহা হইলেও অহিংসা সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অটুট রহিবে। ইহার কারণ কি, পরে বলিতেছি,—

আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি কায়মনবাক্যে অহিংসা সাধনা করেন, তাঁহার পদতলে সারা পৃথিবী লুঠাইয়া পড়ে। তাঁহার

চারিদিকে এমনই একটা প্রভাব বিচ্ছুরিত হয় যে, সর্পাদি হিংস্র জন্তুও তাঁহার কোন অপকার করে না। শুনা যায়, আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস এ বিষয়ে একজন ভুক্তভোগী।

অহিংসা শব্দের পরোক্ষার্থ এই যে, কোন জীবের দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ উৎপাদন না করা। অতএব প্রকৃত অহিংসা-সাধক, অন্যায়কারীর শরীরে আঘাত করিতে কিম্বা তাহার প্রতি কুভাব পোষণ করিয়া মনে কষ্ট দিতে পারেন না। কিন্তু যদি কুভাবে উদ্বুদ্ধ না হইয়া শুধু স্বাভাবিক কার্য্য সম্পাদন কালে আমি কোন অন্যায়কারীর ক্লেশ উৎপাদন করি, তাহা হইলে তাহা হিংসা পদবাচ্য হইবে না। ধরুন কোন ব্যক্তি যদি এক বালককে মারিতে উদ্যত হয়, তবে সেই আততায়ীর সম্মুখ হইতে বালককে সরাইয়া লইলে আমি অহিংসা-ভ্রষ্ট হইব না। বরং যে কোন রূপেই হউক, আমি ঐ বালকটীর অভিভাবক হইলে, তাহাকে আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করাই আমার পক্ষে অহিংসা-সাধনের প্রকৃত পন্থা। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকার নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণ 'ইউ-নিয়ন্' গভরমেণ্টের সঙ্কল্পিত অনিষ্টাচারণে বাধা দিয়া ন্যায়সঙ্গত কাজই করিয়াছিলেন। 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তাঁহারা গভরমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। গভরমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়াই তাঁহারা বাধা দিয়াছিলেন; ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। অহিংসা সাধনা করিতে হইলে স্বেচ্ছায় আত্মনিগ্রহ ভোগ করিতে হয়—অনিষ্টকারীর ক্ষতি ইচ্ছাপূর্ব্বক করা চলে না।

অহিংসা শব্দের প্রত্যক্ষার্থ—বিশ্বপ্রেম বা শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ। অহিংসা-সাধক হইতে হইলে শত্রুকেও ভালবাসিতে হয়। অপকারী পিতা বা পুত্রের প্রতি যে নীতি অবলম্বনীয়, অনিষ্টকারী শত্রু বা অপরিচিতের

প্রতিও ঠিক সেই নীতিই প্রযোজ্য। এই কার্য্যকরী অহিংসার মধ্যে সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা বিরাজমান। মানুষ ভালবাসার পাত্রকে কখনও ঠকাইতে পারে না, তাহাকে ভয় করে না, বা ভয় দেখায় না। জীবন দানের তুল্য দান জগতে আর নাই। যে জীবন দান করে, তাহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ থাকে না; তাহার সহিত সকলের সখ্য সহজেই জন্মে। ভয়শূন্য না হইলে কেহ জীবন দান করিতে পারে না। কাজেই কাহারও পক্ষে কাপুরুষ ও অহিংসা-সাধক একসঙ্গে হওয়া সম্ভবপর নহে। অহিংসা সাধনা করিতে হইলে অসীম সাহসের প্রয়োজন। সৈনিকজীবনের তাবৎ বীরত্বের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ বীরত্ব।

জেনারেল গর্ডনের একটী বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তির হাতে মাত্র একগাছি ছড়ি আমরা দেখিতে পাই। ইহা অহিংসার পথে অনেকটা অগ্রগমনের নিদর্শন বটে, তবে যে সৈনিক ছড়ির সাহায্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রকৃত সৈনিকের আদর্শ হইতে ঐটুকু কম। যিনি জানেন, কিরূপে মরিতে হয় এবং কিরূপেই বা অজস্র গুলিবৃষ্টির মধ্যে নিজের কোট অটল ভাবে বজায় রাখিতে হয়, তিনিই আদর্শ সৈনিক। রাজা অম্বরীষ এই শ্রেণীর সৈনিক। তিনি দুর্ব্বাসার দারুণ কোপে পড়িয়াও অবিচলিত চিত্তে নিজের কোট রক্ষা করিয়াছিলেন। ফরাসী গোলন্দাজদের গোলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াও মুরগণ যখন 'আল্লা' 'আল্লা' রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে দলে দলে কামানমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তাহারাও ঐরূপ সাহস দেখাইয়াছিল; তবে তাহাদের সাহস হতাশা-সম্ভূত, আর অম্বরীষের সাহস ভালবাসা-সঞ্জাত। মুরগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উন্মুখ হইয়া যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার ফলে গোলন্দাজেরা হার মানিল। তাহারা বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া টুপি নাড়িতে নাড়িতে কামান দাগা বন্ধ করিল এবং অরাতিদলকে

বন্ধুভাবে কোল দিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরূপ হাজার হাজার নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী সামান্য ব্যক্তিগত সচ্ছন্দতার বিনিময়ে আত্মসম্মান বিক্রয় করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল। ইহাই অহিংসার কার্য্যকরী মূর্ত্তি। ইহা আত্মসম্মান বিক্রয়ের ঘোর বিরোধী। কেহ যদি কোন অসহায়া যুবতীকে কেবল অস্ত্রবলে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার নিকট যতটা নিরাপত্তার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অধিকতর সুনিশ্চিত নিরাপত্তা অহিংসা-সাধকের নিকট পাওয়া সম্ভব। শেষোক্ত স্থলে আশ্রয়দাতাকে নিধন না করিয়া আততায়ী কিছুতেই তরুণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতাকে জয় করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রথম স্থলে আশ্রয়দাতা দৈহিক বলে যথাশক্তি যুঝিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে; কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা আততায়ীর দৈহিক বলের বিরুদ্ধে আপনার আত্মাকে নিয়োগ করেন; কাজেই আততায়ীর আত্মাও জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা খুব অধিক। সুতরাং যুবতীর ইজ্জত রক্ষার পক্ষে অন্য যে কোন উপায় অপেক্ষা, ইহাতেই অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা। অবশ্য যুবতীর নিজের সাহসের নিকট অপর যে কোন উপায়ই নিষ্প্রভ।

আজ যদি আমরা পুরুষোচিত শৌর্য্যহীন হইয়া থাকি, তবে তাহার হেতু—অপরকে আঘাত করিতে না জানা নহে; পরন্তু মরণকে ভয় করাই তাহার কারণ। যে ব্যক্তি মরণাশঙ্কায় প্রকৃত বা কাল্পনিক বিপদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করে এবং ভাবে যে, অপর কোনব্যক্তি সেই বিপদের উৎপাদককে হনন করিয়া বিপদ নাশ করিবে, সে জৈনাবতার মহাবীরের উপাসক নহে—বুদ্ধের বা বেদের আদেশও সে অনুসরণ করে না। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলিয়া কাহাকেও তিল তিল করিয়া

মারিয়া ফেলে, অথবা বাহুবলে কসাইকে বিনাশ করিয়া কয়েকটী গবীর উদ্ধার সাধন করে, কিম্বা দেশ-হিতৈষণার উত্তেজনায় জনকয়েক রাজ-কর্ম্মচারীকে হত্যা করিতে ছুটে, তাহা হইলে তাহাকে অহিংসা-সাধক বলা চলে না। এই সকল কার্য্য ভয়, বিদ্বেষ ও কাপুরুষতার ফল। এখানে দেশের প্রতি বা গবীর প্রতি ভালবাসা কিছুই নহে; পরন্তু উহা নিজের আত্মম্ভরিতা পোষণের উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার বিনীত অভিমত এই যে, অহিংসা শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে পার্থিব ও অপার্থিব সর্ব্ববিধ বিপদের প্রতিকার, আমাদের মুঠার মধ্যে আসিবে। এ জগতে অতিরিক্ত অহিংসা-সাধন কখনই সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা অহিংসা-সাধন আদৌ করি না। অহিংসা-সাধনে ব্রতী হইলে অন্যান্য সাধন পণ্ড হয় না; পরন্তু অহিংসার মূল সূত্রগুলি অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বেই অন্যান্য সাধন আরও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। মহাবীর, বুদ্ধ ও টলষ্টয়—ইঁহারা তিনজনেই যোদ্ধা। তবে ইঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে যোদ্ধার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সত্য সত্যই সুখময় সম্মানপ্রদ দেবতুল্য জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যদি ঐ সকল উপদেষ্টার গুণভাগী হইতে পারি, তাহা হইলে এদেশ আবার দেবতার বাসভূমিতে পরিণত হইবে।

যুদ্ধ ও অস্ত্র-আইন

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বায়ে সৈন্য সংগ্রহ কালে নিম্নলিখিত নয়টি উপদেশ স্বদেশবাসীকে প্রদান করেন,—

(১) তোমার দেশ ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এখনই সৈন্যদলে প্রবেশ কর।

(২) মনে করিও না যে, যুদ্ধের পর অস্ত্র-আইনের বলে তোমাকে অস্ত্রহীন করা যাইবে।

(৩) স্মরণ রাখিও, তুমি অস্ত্রপরিচালনে অভ্যস্ত হইলে জগতের কোন শক্তি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন করিতে পারিবে না।

(৪) গভরমেণ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। গভরমেণ্ট এত নির্ব্বোধ নহেন যে, তুমি অস্ত্র ব্যবহারে একবার শিক্ষিত হইলে তোমাকে অস্ত্রহীন করিতে আর প্রয়াসী হইবেন। সেরূপ নির্ব্বোধ হইলে গভরমেণ্ট দেশ শাসন করিতে পারিতেন না।

(৫) সত্যাগ্রহরূপ মহাস্ত্র তোমার সঙ্গে সতত রহিয়াছে, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ কর।

(৬) স্মরণ রাখিও, যে মরিতে ভয় করে, সে সত্যাগ্রহী হইতে পারিবে না।

(৭) শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জ্জন করিও। সত্যাগ্রহের প্রকৃত গুণ অবধারণের নিমিত্ত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন।

(৮) অহিংসা অভ্যাস করিও।

(৯) ভুলিওনা যে, কেবল সেই ব্যক্তিই অহিংসা অভ্যাস করিতে পারে—যে বধ করিতে জানে; অর্থাৎ হিংসা কি তাহা অবগত আছে।

কারা-কাহিনী

ট্রান্সভালে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত গান্ধী তিনবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দ্বিতীয় বারের কারাবাস-কাহিনী তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কয়েদিগণকে স্ব স্ব বিছানা গুটাইয়া যথাস্থানে রক্ষা করিতে হয়। ৬টার মধ্যে শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক

কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বিধেয় ; ঘণ্টা বাজিলেই কাজে রওনা হইতে হইবে। ৭টার সময় কাজ আরম্ভ হয়। নানা রকমের কাজে কয়েদীদের নিয়োগ করা হইয়া থাকে। আমাদিগকে যে জমি খুঁড়িতে দেওয়া হইত, তাহা অত্যন্ত শক্ত। কোদালের দ্বারা তাহা খনন করা নিতান্ত কষ্টকর। সে সময়টা দারুণ গরম। আমাদিগকে জেল হইতে দেড় মাইল দূরে লইয়া গিয়া কাজে লাগান হইত। প্রথমে আমরা সকলেই খুব উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ কর্ম্মে অভ্যস্ত না থাকায়, সকলেই অল্পক্ষণ মধ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই কাজটা আরও কঠোর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদের ওয়ার্ডারটী খুব কড়া মেজাজের লোক। সে যখন-তখন চীৎকার করিয়া বলিত,—'চালাও চালাও।' ইহাতে ভারতীয়গণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িত। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিতেছে। একজনের পদতল ফুলিয়াছিল। এই সকল দৃশ্যে আমার প্রাণ জ্বলিতেছিল ; তবুও আমি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলাম। বলিলাম—'ওয়ার্ডারের কথায় বিচলিত না হইয়া সরল অন্তঃকরণে যতটা পার কাজ করিয়া যাও।' আমি নিজেও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার হাতে অনেকগুলি ফোস্কা উঠিয়াছিল; সেগুলি গলিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। আমি আর কোদাল তুলিতে পারিতেছিলাম না—মনে হইতেছিল, সেটা যেন এক মণ ভারি! তখন ভগবানের নিকট মনে মনে এই প্রার্থনা জানাইলাম,—'লজ্জানিবারণ! আমার মান বজায় রাখ—হাত পা যেন অবশ হইয়া না যায়—নির্দ্দিষ্টকর্ম্ম সমাপনের উপযোগী বল আমাকে দাও।' ভগবানের উপর স্থির বিশ্বাস রাখিয়া আমি আপন কাজ করিতে লাগিলাম। শ্রান্তি মোচনের জন্য মাঝে মাঝে একটু থামিলেই ওয়ার্ডার আমাকে ধমক্ দিতে সুরু করিল। আমি

তাহাকে বলিলাম যে, আমাকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না—আমার শক্তিতে যতটা কুলায় ততটা কাজ আমি করিব।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত ঝিনাভাই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে করিতে ভাবিলাম,—'অধিকাংশ ভারতবাসী আমার কথায় নির্ভর করিয়া জেলে আসিয়াছে। আমার উপদেশ যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ভগবানের চক্ষে আমি কতটা দোষী হইব! শুধু আমার উপদেশে ইহারা এত কষ্ট সহ্য করিতেছে!' মনে মনে এইরূপ অলোচনা করিয়া আমি একটী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া আর একবার ঐ বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম যে, ঠিক পথেই চলিয়াছি। আমি ইহা বেশ অনুভব করিলাম যে, ভারতীয়গণকে যে পরামর্শ দিয়াছি তাহা ছাড়া অপর কোন পরামর্শ বর্ত্তমান অবস্থায় প্রদত্ত হইতে পারে না। ভবিষ্যতে সুখ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ অপরিহার্য্য—সেজন্য দুঃখিত হইলে চলিবে না। 'ইনি না হয় এখন অজ্ঞান হইয়াছেন; কিন্তু যদি ইহাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহা হইলে ভারতীয়গণের প্রতি আমার উপদেশ, কিরূপে পরিবর্ত্তন করিব।' এই প্রশ্নের মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল—চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া থাকা অপেক্ষা এমন মৃত্যু গৌরবজনক।

এক সময়ে একজন ওয়ার্ডার আমার নিকট আসিয়া দুইজন লোক চাহিল। তাহাদিগকে পায়খানা পরিষ্কার করিতে হইবে। আমি নিজে ঐ কাজে যাইব বলিলাম। ঐরূপ কর্ম্মে আমার আপত্তি কিছুই ছিল না; বরং উহাতে অভ্যস্ত হইয়া থাকা আমি প্রয়োজন মনে করি।

কাফ্রী রোগীদের ওয়ার্ডে আমার শুইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে সমস্ত রাত্রি অতি কষ্টে ও ভয়ে কাটাইয়াছিলাম। তখন জানিতাম

না যে, পরদিন আমাকে ভারতীয় কয়েদীদের ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইবে। বিকটাকার কাফ্রীদের সঙ্গে একত্রে আবদ্ধ রহিবার আশঙ্কায় আমি ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। তথাপি মনকে দৃঢ়ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, যেরূপ যন্ত্রণাই আসুক না কেন, তাহা সহ্য করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থার উপযোগী কয়েকটী শ্লোক ভগবদ্গীতা হইতে পাঠ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা অনুধ্যান করিলাম। ফলে, মন স্থির হইল। প্রাগুক্ত কক্ষে কয়েকজন খুনে, অসভ্য, কদাচার কাফ্রী ও চীনা কয়েদী আটক ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি ত্রস্ত ও ভীত হইয়াছিলাম। তাহাদের ভাষা আমি বুঝি না। তাহাদের মধ্যে একজন কাফ্রী আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। ভাবভঙ্গীতে বুঝিলাম, লোকটা আমাকে কুৎসিত রকমের বিদ্রূপ করিতেছে। তাহার প্রশ্ন আমি বুঝিতে পারি নাই, কাজেই কোন উত্তর দিলাম না। তখন সে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমাকে এখানে আনিয়াছে কেন?' আমি স্বল্প কথায় ইহার উত্তর দিলাম; তাহার পর নীরব রহিলাম।

অতঃপর একজন চীনা আমাকে উত্যক্ত করিতে আসিল। এ লোকটা আরও খারাপ। সে আমার বিছানার নিকট আসিয়া একদৃষ্টে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি কথা কহিলাম না। সে তখন উক্ত কাফ্রীর শয্যাভিমুখে ফিরিয়া গেল। তাহারা পরস্পর কুৎসিত ভাবে রঙ্গভঙ্গ করিতে লাগিল এবং শরীরের অশ্লীলাংশ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। সম্ভবতঃ এই উভয় কয়েদীই হত্যা বা ডাকাতি অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই সকল বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিয়া কি আমার আর ঘুম আইসে!

একবার আমি প্রস্রাব করিবার জন্য পায়খানার নিকট বসিয়াছি, এমন সময়ে একজন গুণ্ডা-গোছের অসভ্য কাফ্রী আসিয়া দেখা দিল। সে আমাকে সরিয়া যাইতে বলিল ও গালাগালি দিতে লাগিল। আমি

বলিলাম,—'আমার বেশী দেরি হইবে না।' লোকটা আমাকে কোল-পাঁজা করিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমি একটা কপাট ধরিয়া ফেলিলাম; নচেৎ হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া যাইত। এবার কিন্তু তেমন ভীত হই নাই। আমি হাসিমুখে সেস্থান হইতে সহজভাবে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু যে দু'একজন ভারতীয় কয়েদী সে দৃশ্য দেখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চক্ষু বহিয়া দরবিগলিত ধারা ছুটিল।

গো-রক্ষা

গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী গো-রক্ষা প্রসঙ্গে বলেন,—

ভারতে গো-রক্ষা একটী প্রধান সমস্যা। প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে গো-রক্ষা প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। দেশের অবস্থানুরূপ প্রয়োজন সাধনের জন্য এই প্রথার সৃষ্টি। যে দেশে শতকরা ৭৩ জন লোক কৃষি কর্ম্মের দ্বারা জীবনোপায় সংগ্রহ করে এবং যেখানে কৃষিকার্য্যের জন্য গো-ধনই একমাত্র অবলম্বন, সে দেশে গো-জাতির রক্ষা-বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এমন দেশে মাংসাহারী ব্যক্তিগণের পক্ষে গো-মাংস ত্যাগ করাই বিধেয়। উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণগুলি ভারতে গো-হত্যা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু এই সমস্যার সমাধানকালে আমরা একটা অভিনব অবস্থার ভতর গিয়া পড়ি। গো-রক্ষার প্রধান অর্থ সাধারণতঃ এই মনে হয় যে গরুগুলি যেন মুসলমান ভ্রাতাদের হাতে না যায় এবং তাঁহারা যেন উহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন। ওদিকে শাসক সম্প্রদায়ের জন্য গো-মাংস দরকার। তাঁহাদের প্রয়োজনে প্রত্যহ হাজার হাজার গরু নিহত হইতেছে। ইহার প্রতিরোধ কল্পে আমরা কোন চেষ্টাই করি

না। কলিকাতার কোন কোন গোয়ালা গাভীদের উপর অবর্ণনীয় প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইবার জন্য যে নির্ম্মম অত্যাচার করে, তাহার প্রতিবিধান-কল্পে আমরা আদৌ উদ্‌-যোগী নহি। গুজরাটে হিন্দু গাড়োয়ানেরা লোহার কাঁটাযুক্ত যষ্টি দ্বারা গরু হাঁকাইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপারে আমরা নীরব। আজকাল সহরে যে সকল বলদ আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বস্তুতঃ গো-জাতির রক্ষা-সমস্যা বড়ই গুরুতর। আমরা মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া এ বিষয়টীকে যেন মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত বিবাদের একটা ছুতা করিয়া তুলিয়াছি। এই রেষারেষির ফলে গো-হত্যার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন মুসলমান ভ্রাতা যদি গো-কোরবাণি ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করা ধর্ম্মের লক্ষণ নহে; পরন্তু উহা অধর্ম্মমূলক। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত যদি আমরা ঐ বিষয়ে ভালবাসার ভাবে কথাবার্ত্তা কহি, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের বিশেষ অবস্থা উপলব্ধি করিবেন এবং গো-রক্ষা কার্য্যে আমাদের সহযোগী হইবেন। শুধু ভদ্রতার খাতিরে বা সত্যগ্রহের অজুহাতে তাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্রতী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু এদেশে গো-রক্ষার ফলাফল কি, ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই তাঁহারা আমাদের মতানুবর্ত্তী হইবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা নিজেরাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া বিধেয়। গরুর প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে পারিলে এবং তাহাদের জন্য প্রাণে অকৃত্রিম ভালবাসা জাগিলে, আমরা ঐ কার্য্যে সক্ষম হইব। এই একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তখন হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বসবাস করিবে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইবে এবং আমাদের দেশের গো-ধন অন্যান্য

দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। প্রকৃত তপস্যাচরণ দ্বারা আমরা ইংরাজের, মুসলমানের ও হিন্দুর গো-হত্যা বন্ধ করিতে পারি। এই এক কার্য্যের ফলে স্বরাজ আমাদের অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িবে।

ধর্ম্মঘট

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ মাদ্রাজ সহরে ট্রামের ধর্ম্মঘটকারী কর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

আপনাদের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত বিবরণ আমি কতক কতক শুনিয়াছি। আপনাদের দাবী কি, তাহাও আমি মোটামুটি জানি; কিন্তু সমস্ত সমস্যাটী আগাগোড়া প্রণিধান সহকারে আলোচনা করি নাই। পক্ষান্তরে আপনাদের নিয়োগকারী কোম্পানীর তরফের কথাও আমি অবগত নহি। কাজেই আপনাদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কিনা, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্মঘট ঘোষণা দ্বারা আপনারা অন্যায় কিছু করেন নাই।

শ্রমিকগণ যেখানে নিয়োগকর্ত্তাদের নিকট আপনাদের অভাব-অভিযোগের কথা পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াও কোন প্রতিকার পায় না, সেখানে ধর্ম্মঘটই একমাত্র অস্ত্র। সুতরাং ধর্ম্মঘটে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উহার মূলহেতু ন্যায়সঙ্গত ও অকৃত্রিম হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মঘটকারিগণ যেন কখনও অত্যাচার-অনাচারে প্রবৃত্ত না হন। অর্থাৎ আপনারা নিয়োগকর্ত্তাদিগকে অথবা যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিবেন না। যে কোন কষ্ট আসুক না কেন, আপনারা কখনও সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। ধর্ম্মঘটের সময়

সহস্র যাতনা শির পাতিয়া লইতে—এমন কি অনশনে দিনপাত করিতেও আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন। ধর্ম্মঘট ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং উহার জয় অবশ্যম্ভাবী। আশাকরি আপনাদের ধর্ম্মঘটও ঠিক ঐ ধরণের। আপনাদের মধ্যে আর কেহই কাজে নিযুক্ত নাই, এই অপূর্ব্ব একতা লক্ষ্য করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। তা'ছাড়া আপনারা শান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলিয়াছেন, ইহাও আনন্দের কথা। আপনারা যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আশা করি দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট ছাড়িবেন না।

তবে একটা কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাহা এই যে, আপনাদের দাবী কি তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া ধর্ম্মঘটকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানাইয়া দিবেন এবং মীমাংসার সময় আসিলে দাবীর পরিমাণ আর বাড়াইবেন না। দাবীর মাত্রা যদি মাঝে মাঝে চড়াইয়া দেন বা পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে তাহা ন্যায্য হইবে না। ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য যদি মধ্যস্থতার কথা উঠে এবং মধ্যস্থগণ যদি বিশ্বাসযোগ্য লোক হন, তাহা হইলে সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কারণ মধ্যস্থগণ আপনাদিগকে, নিয়োগকর্ত্তাগণকে এবং সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পারিবেন যে, আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত কিনা।

আপনাদের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং উল্লিখিত সর্ত্তগুলি যদি আপনারা পূরণ করেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট চলিলে কি করিবেন? আপনাদের সকলের হাতে অবশ্য এত টাকা নাই যে, অনন্তকাল ধর্ম্মঘট চলিলেও সহিয়া থাকিতে পারিবেন। আপনারা সকলেই শ্রমজীবী—আপনাদের শরীর সুস্থ ও সবল। এরূপ স্থলে আপনারা সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় নির্ভর করিবেন না, ইহাই আমার পরামর্শ। যাঁহাদের হাত-পা কার্য্যক্ষম তাঁহাদের পক্ষে সাধারণের চাঁদায় জীবন ধারণ করা নীচতার

পরিচায়ক। অতএব আপনারা সকলে অস্থায়ীভাবের কোন কাজকর্ম্ম সন্ধান করুন। পৃথিবীতে যে কোন বৃত্তি দ্বারা সদুপায়ে অর্থার্জ্জন করা নিন্দনীয় নহে। আপনাদের অবস্থায় পড়িলে আমি কোদাল পাড়িতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না; তথাপি ধর্ম্মঘট বজায় রাখিতাম। আমেদাবাদের ধর্ম্মঘট-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিবার অবসর আমার নাই—সেখানে তেইশ দিন ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। বন্ধুবান্ধবের নিকট আপনারা ঐ ঘটনার বিবরণ অবগত হইবেন; তবে আমি এইটুকু জানাইতে চাই যে, সেখানে চল্লিশ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও ধর্ম্মঘটের সময় কোদাল পাড়িতে এবং দ্বারে দ্বারে মাটি বহিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এইরূপে দৈনিক চারি আনা উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহারা সংসার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ফলে, দশ হাজার লোক সেই ধর্ম্মঘটে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আশা করি, আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত। আপনারা যদি উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সাফল্য লাভ হইবেই হইবে।

বণিক্‌গণের প্রতি

বোম্বাই—বরোচে বণিক্‌গণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

নূতন পন্থাবলম্বনের উপযোগী সাহস, বুদ্ধি ও ধন সাধারণতঃ বণিক্ সম্প্রদায়ের ভিতরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুণ না থাকিলে কেহ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে না। এখন কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণার উদ্বোধ হওয়া দরকার। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্যও স্বদেশ-হিতৈষণা প্রয়োজন। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যদি স্বদেশ-প্রেম পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে সেই ভাব অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা বিস্তার করিবে। অতএব বণিক্ সম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক।

অধুনা বণিক্‌গণ সাধারণের কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মিলামিশা করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণাবশে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে স্বরাজ অনেকটা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সবিস্ময়ে মনে করিতেছেন যে, স্বরাজ আসিবে কিরূপে? আমি বুকে হাত দিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি যে, বণিক্‌গণ স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইলে, স্বরাজ আমাদের সহজলভ্য হইবে। তখন উহা আপনা-আপনি হাতে আসিয়া পড়িবে।

স্বদেশী-পণ গ্রহণ স্বরাজ লাভের একটী প্রধান পন্থা। বণিক্‌গণ স্বদেশী-পণ গ্রহণে দেশবাসীকে বাধ্য করিতে পারেন! আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সাহসের সহিত ঐ কাজে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে দেখিবেন, কি অদ্ভুত কার্য্য আপনাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে।

আমি সদুঃখে জানাইতেছি, বণিক্ সম্প্রদায় স্বদেশীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অধুনা বাঙ্গালায় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুযোগ উঠিয়াছে। তাঁহাদের একটী অনুযোগ, গুজরাটের বিরুদ্ধে খাটে। বাঙ্গালায় ধুতির দর অসম্ভব চড়িয়াছে। ঐ ধুতি গুজরাট হইতে সরবরাহ হয়। আপনাদিগকে অর্থার্জ্জন করিতে কেহ নিষেধ করিবে না; কিন্তু সৎপথে থাকিয়া ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। বণিক্‌গণ অসৎ উপায়ে অর্থার্জ্জন যেন না করেন।

ভারতের শক্তি বণিক্‌গণের উপর যতটা নির্ভর করিতেছে, সৈনিকগণের উপর ততটা নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যই যুদ্ধের হেতু; যুদ্ধের মূলসূত্র বণিক্ সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত। বণিক্‌গণ অর্থ সরবরাহ করিলে, তবে তদ্দ্বারা সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীর ক্ষমতা, বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার পক্ষে বণিক্‌গণের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ, সৌভাগ্যের নিদর্শন মনে করিতেছি।" ভবিষ্যতে

যখনই বরোচের কথা স্মরণ হইবে, তখনই জানিতে চেষ্টা করিব যে, আজ যে বণিক্‌গণ আমাকে অভিনন্দিত করিলেন—তাঁহারা যথার্থ ধর্ম্ম-প্রবণ ও স্বদেশহিতৈষী কিনা? তখন যদি ঐরূপ প্রমাণ না পাই, তবে মনে করিব যে, সে সময়ে ভারতে অভিনন্দন-দানের একটা হুজুগ আসিয়াছিল মাত্র; তাহারই অংশভাক্ আমি হইয়াছিলাম।

ছাত্রগণের প্রতি—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল মাদ্রাজে 'ইয়ং মেন্‌স ক্রিশ্চান এসোসিয়েশন' ভবনে তত্রত্য ছাত্রগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত—'বন্দে মাতরম্' গানে, কবি মাতৃভূমির বর্ণনায় বহুল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ স্তোত্র গান করিবার অধিকার কি আমাদের আছে? কবি আমাদের সম্মুখে কেবল একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ-ভরসা তোমাদিগকে সে আদর্শ লাভ করিতে হইবে। তোমরা কি সেই শিক্ষা লাভ করিতেছ, যাহাতে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে পারিবে—যাহাতে তোমাদের সদ্‌গুণরাজি ফুটিয়া উঠিবে? অথবা তোমাদের শিক্ষা-মন্দিরগুলি সরকারী কর্ম্মচারী গঠনের বা সওদাগরী অফিসের কেরাণী গঠনের কারখানা মাত্র? তোমরা কি কেবল চাকুরী লাভের আশায় লেখাপড়া শিখিতেছ? তোমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমাদের দ্বারা কবির আদর্শ পূরণ হইবে না—ইহাই আমার আশঙ্কা।

হয়ত তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি আধুনিক সভ্যতার ঘোর বিরোধী। আজকাল ইউরোপে কি ভীষণ বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়াছে, চাহিয়া দেখ। উহা আধুনিক সভ্যতার ফল বলিয়া যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে এদেশে

ঐ সভ্যতা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে দুইবার চিন্তা করিয়া দেখা তোমাদের ও তোমাদের অভিভাবকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন,—'রাজপক্ষ উহা এদেশে আনিয়াছেন; সুতরাং আমরা বাধা দিব কিরূপে?' তোমরা গ্রহণ না করিলে রাজপক্ষ ঐ সভ্যতা তোমাদের ভিতর চালাইয়া দিবেন, ইহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করি না। আমার মতে, ঐ সভ্যতা বর্জ্জনের শক্তি আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা রাজপক্ষকে বর্জ্জন না করিয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জন করিতে পারিব।

কৃষি-শিল্প শিক্ষা

কনখল গুরুকুল বিদ্যালয়ের বর্ষিক উৎসবে পঠিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী ছাত্রগণের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বলেন,—

গুরুকুলের ছাত্রগণকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাশী জন অধিবাসী কৃষিজীবী এবং শতকরা দশজন লোক কৃষকদলের অভাব মোচনে নিযুক্ত। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে কৃষি ও বয়ন বিদ্যা মোটামুটি অর্জ্জন করিতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহারা যদি যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক ব্যবহার করিতে পারে, সোজাসুজি তক্তা চিরিতে পারে, মজবুত দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক সংসার-সংগ্রামে কখনও নিজেকে অসহায় বোধ করিবে না; কারণ তাহার কাজের ভাবনা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম ও বিদেশ-যাত্রা

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

আমরা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া অনেকটা আত্মসম্মান হারাইয়াছি। আমরা এখন ইংরাজীতে চিন্তা করি—ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহি। তাহার ফলে আমাদের মাতৃভাষার দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়—আমরা দেশবাসী জনসাধারণের মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মাতৃভূমির কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা নিতান্ত অপরিহার্য্য নহে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় প্রভূত শক্তি নিহিত রহিয়াছে—উহাই হিন্দুত্বের গুপ্ত রহস্য।

বর্ত্তমান সভ্যতা ইউরোপে তথা ভারতে অভিসম্পাতের মত কুফল প্রসব করিয়াছে। যুদ্ধ বর্ত্তমান সভ্যতার মুখ্য ফল। পৃথিবীর সকল রাজশক্তি এ যাবৎ যুদ্ধের আয়োজনে ব্রতী ছিল।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নৈতিক বল বড় সামান্য নহে। ইহা দুর্ব্বল ও সবল সকলকেই রক্ষা করে। আত্মিক-বল কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করে না। আমাদের আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে; নচেৎ তাহার সার্থকতা কি? বর্ত্তমান সভ্যতা পশুবলের নামান্তর মাত্র।

কামিনী, কাঞ্চন ও ভূসম্পত্তি—এই তিনটী অনর্থের মূল। বিলাস-ব্যসনের নিমিত্ত কামিনী, কাঞ্চন ও ভূসম্পত্তি আমি চাহি না। অপরে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমিও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না।

আদর্শ রক্ষায় সচেষ্ট হইলে কুপ্রবৃত্তি আমাদের ভিতর তেমন মাথা তুলিতে পারিবে না। দেশহিতকর কার্য্যে জনসাধারণের আগ্রহ উৎপাদন করিতে হইবে।

জড় জগতের ঈর্ষামুলক কর্ম্মশীলতা আদৌ মঙ্গলপ্রদ নহে। উহার ফলে

লোকের বিলাসিতার উপকরণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আধুনিক কর্ম্মপ্রবণতার দারুণ চাপ আরোপ করা উচিত নহে—হিন্দু আদর্শে উহা পুনর্গঠন করিতে হইবে। এদেশে পুণ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অন্য দেশের লোকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। দশরথ পত্নীর নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করায়, অন্য দেশের লোকে তাঁহাকে মূর্খ বলে। কিন্তু ভারত-বাসীর ধারণা—প্রতিজ্ঞা সর্ব্বত্রই পালনীয়। এ আদর্শ অতি উচ্চ। জড় জগতের কর্ম্মপ্রবণতা বিদ্বেষোৎপাদক। সত্যের জয় শেষে হইবেই।

বিদেশে উপনিবেশিক প্রেরণের ফলে কোন দেশ কখনও লাভবান হয় নাই। উপনিবেশিকগণ যখন স্বদেশে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহাদের চরিত্র পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখা যায় না। তাই সমগ্র ব্যবস্থাটী হিন্দু-নীতির বরুদ্ধ। বিদেশে মন্দিরাদি সমৃদ্ধিলাভ করে না,—উৎসবাদিও তেমন জাঁকজমকের সহিত সম্পাদনের সুবিধা নাই। পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর—যদিবা পাওয়া যায়, তাহারা নিতান্ত বাজে লোক। উপনিবেশিকগণ অনেক অনাচার করে—তাহাদের দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়। উহা নূতন পথ প্রদর্শনের সৎসাহস নহে। তাহারা বিদেশে গিয়া স্বল্পায়াসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে, অর্থাৎ বিশেষ পরিশ্রম করিতে তাহারা নারাজ এবং অর্থার্জ্জন ব্যাপারে সাধুসম্মত উপায় অবলম্বন করিতেও প্রস্তুত নহে। উপনিবেশিকগণ সাধারণের অপেক্ষা সুখী নহে—বরং তাহাদের পার্থিব অভাব অনেক অধিক।

স্বরাজ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর 'গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে'র সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

যাঁহারা বলেন,স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের লেখাপড়া শেখা দরকার, তাঁহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ। নিজেদের কাজকর্ম্ম নিজেরাই চালান উচিত, এই জ্ঞান লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুস্তকগত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন নাই—মূল ভাবটী লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই হইল। তাহাদের মনে স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই যথেষ্ট। এদেশে এমন অনেক নৃপতি সুচারু ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা লেখাপড়ার ধার আদৌ ধারিতেন না।

কোন কোন ইংরাজ সমালোচক বলেন যে, স্বরাজ লাভের অধিকার ভারতবাসীর নাই ; কারণ যাঁহারা স্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে অপারগ। উক্ত সমালোচকগণ জিজ্ঞাসা করেন,—'ভারত রক্ষার ভার কি ইংরাজের হাতে দিয়া, আপনারা শুধু শাসন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবেন ?' এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসি পায়, দুঃখও আইসে। হাসির কারণ এই যে, আমাদের ইংরাজ বন্ধুরা মনে করেন, তাঁহারা যেন আমাদের মধ্যে নহেন। আমরা কিন্তু বৃটিশ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই স্বরাজ লাভ করিতে চাহি। যে সকল ইংরাজ এখানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বরং তাঁহারা আমাদের অর্জ্জিত স্বরাজের সরিক হইবেন। এরূপ অবস্থায় দেশের রক্ষাভার যদি তাঁহাদের উপর পড়ে, তাহা হইলে অসন্তোষের কারণ কি ? তাঁহারা তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, তখন হয়ত আমরা দেশরক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইব না।

বস্তুতঃ ভারতের জনসাধারণ যখন অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে, তখন তাহারা সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। অপরকে আঘাত করিতে হইলে মনোবৃত্তি একটু কঠিন করা প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে মনকে কঠোর করিয়া তুলিতে বেশী দিন লাগিবে না। আগাছার মত উহা সহজেই মানস-ক্ষেত্রে বাড়িয়া উঠিবে।

এই সমস্যার আর একটা দিক্ আছে। তাহা এই যে, গভরমেণ্ট আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত সামরিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি এদেশবাসী জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে আজ বহু সৈন্য সংগৃহীত হইত। এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে যুদ্ধে নামেন নাই, সেজন্য গভরমেণ্টই বেশীর ভাগ দোষী। গভরমেণ্ট যদি প্রথম হইতে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের হাতে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া কাজ নাই। যে সময়ে বৃটিশ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে এদেশের কোটী কোটী অধিবাসীকে শাসনে রাখিবার জন্য তাহাদের সামরিক-শিক্ষা বন্ধ করা গভরমেণ্ট যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন সে মত সংশোধনের সময় আসিয়াছে। সে ভুল শাসক ও শাসিত, উভয়কেই অবিলম্বে সারিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ কালে আমি আধুনিক লোকমত সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু আমার মতে ঐ মত একেবারে অভ্রান্ত নহে। আমাদের আন্দোলন পাশ্চাত্য আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে স্বরাজ চাই, তাহাও পাশ্চাত্য ধরণের। উহার ফলে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে। অনেকের মতে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না।

আমি ইহা বিস্মৃত হইতে পারি না যে, ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে—জাপান নহে—চীন নহে। 'পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি আর সব দেশ ভোগভূমি' এই পবিত্র বাণী আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। আমার ধারণা ভারতের কর্ত্তব্য অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র। সারা পৃথিবীর উপর ধর্ম্মাধিপত্য স্থাপন করিতে ভারতবাসীই উপযুক্ত।

এদেশের অধিবাসিগণ স্বেচ্ছায় যেরূপ শুদ্ধি-ক্রিয়ার ক্লেশ সহিয়াছে, সেরূপ আর কোন দেশের লোকে সহে নাই। এদেশ রক্ষার নিমিত্ত লৌহাস্ত্রের প্রয়োজন তেমন নাই। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক-অস্ত্রে চিরকাল যুঝিয়াছে আজও যুঝিতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি পাশব বলের পক্ষপাতী। অধুনা ইউরোপ খণ্ডে যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা এই সত্যের নিদর্শন। ভারতবাসী আত্মিক-বলে (Soul-force) জগৎ জয় করিতে পারে। আত্মিক-বলের নিকট পশুবল যে কিছুই নহে, ইহার শত শত উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবিরা একথা মুক্তকণ্ঠে গান করিয়াছেন—সর্ব্বদর্শী ঋষিরা এ সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অসুরোপম বীর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার নিকট মেষ শাবকের মত নিরীহ। ইহাই প্রেমের শক্তি। প্রেমই আত্মা—আত্মার ধর্ম্ম প্রেম। আমাদের মনে যদি অটল বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সারা পৃথিবীর উপর আমরা এই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব। অধুনা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আমরা নঙ্গরহীন তরীর ন্যায় নব্য সভ্যতার ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি। এ বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা আমার ব্যক্তিগত মত হইলেও, আমি এদেশে স্বরাজ আন্দোলনের পক্ষপাতী ; কারণ পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে ভারতবর্ষ এখন শাসিত হইতেছে। এমন কি গভরমেণ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঐ শাসন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এদেশে

পার্লামেণ্টের অনুরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদের অস্তিত্বই থাকিবে না।

ভারতে দারিদ্র্য দিন দিন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যে দেশ নিজের কাঁচা মাল বিদেশে চালান দিয়া তজ্জাত শিল্পসম্ভার পুনরায় আমদানি করে—যে দেশে তুলা উৎপন্ন হইলেও বিদেশাগত বস্ত্রের জন্য কোটী কোটী টাকা দিতে হয়—সে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ দরিদ্র দেশের অধিবাসিগণ বিবাহাদি উৎসবে অপরিমিত অর্থব্যয় করে! যে দেশের লোকেরা প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দমনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যোন্নতি খাতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয় করিতে অপারগ, তাহারা কত দরিদ্র! দেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন বাবদ বিপুল অর্থ যতদিন বিদেশে চলিয়া যাইবে, ততদিন এদেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়িবেই বাড়িবে। ভারতের অধিবাসিগণ যে শীতকালে শরীরের উত্তাপ রক্ষার নিমিত্ত পশমী বস্ত্রের অভাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী মূল্যবান সার (গোময়) জ্বালাইতে বাধ্য হয়—ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের দারিদ্র্য কিরূপ ভীষণ! সারা ভারত ভ্রমণ কালে আমি একটীও আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখি নাই। মধ্যবিত্ত লোকেরা কঠোর দারিদ্র্যের চাপে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের ত আশা নাই। তাহাদের জীবনে সচ্ছলতা লাভ, আশার স্বপ্নমাত্র। ভারতের ধনরাশি মাটীর নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে, অথবা অলঙ্কাররূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা গল্পের ন্যায় অলীক। যদি কিছু ধন ঐরূপে সঞ্চিত থাকে, তাহা অতি তুচ্ছ। অধুনা এ জাতির ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু আয় তদনুপাতে বাড়ে নাই। দেশের এ অবস্থা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, ইহাই আমার ধারণা। তাঁহারা 'সত্য-সত্যই

বিশ্বাস করেন যে, ভারতের উন্নতি উত্তরোত্তর সাধিত হইতেছে। সরকারী 'ব্লু-বুকে' তাঁহাদের বিশ্বাস অটল। একথাও খুব সত্য যে, সরকারী হিসাব-পত্র হইতে যে কোন সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হইতে পারে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ হিসাব-পত্র দেখাইয়া ভারতের উন্নতি সপ্রমাণ করিতেছেন। কিন্তু আমার মত যাঁহারা লোকমতের অনুসৃত পন্থায় হিসাবের তালিকা পরীক্ষা করেন, তাঁহারা ঘাড় নাড়িয়া 'ব্লু-বুকে'র হিসাবে সন্দেহ জানাই-বেন। স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যদি বলেন যে, 'ব্লু-বুকে'র হিসাব অভ্রান্ত, তাহা হইলেও আমি মুক্তকণ্ঠে কহিব,—ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় আমরা পার্লামেণ্ট পাইলে লাভ কি? পার্লামেণ্ট পাইলে এই লাভ হইবে যে, আমরা যেমন ভুল করিব তেমনই তাহা সংশোধনের অধিকার আমাদেরই হাতে আসিবে। প্রথম প্রথম কোন কোন বিষয়ে আমাদের ভুল হইবেই। কিন্তু আমরা এদেশের বাসিন্দা; সুতরাং ভুল শুধরাইতে আমাদের বিলম্ব ঘটিবে না। তখন নিজেদের অভাব মোচনের জন্য আমরা ল্যাঙ্কসায়ারের মুখাপেক্ষী হইব না; দিল্লীতে রাজধানী নির্ম্মাণের নিমিত্ত অপরিমিত অর্থব্যয়েও বাধ্য থাকিব না। তখন কৃষকের কুটীরের সহিত দিল্লীর সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে—আমাদের পার্লামেণ্ট-গৃহও কুটীরের তুলনায় স্বর্ণসৌধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অধুনা এ জাতি নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে—ভুল করিবারও অধিকার ইহার নাই! যাহার ভুল করিবার অধিকার নাই সে কখনও অগ্রসর হইতে পারে না। পার্লামেণ্টের কমন্স সভার ইতিহাস শত শত ভুল-চালের ইতিবৃত্তে পরিপূর্ণ। একটী আরবী প্রবাদ-বাক্যের মর্ম্ম এই যে, মানব ভ্রমের প্রতিমূর্ত্তি। ভুল করিবার স্বাধীনতা ও তাহা সংশোধনের অধিকার লইয়াই ত স্বরাজ। পার্লামেণ্ট এই স্বরাজের উদ্ভবক্ষেত্রে। তাই আজ আমরা পার্লামেণ্ট চাহিতেছি—

আজ আমরা উহা লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আমরা উহা চাহিলেই পাইব।

এখন 'আজ' কথাটীর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আমাদিগকেই করিতে হইবে। বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের নিকট আবেদন করিলে স্বরাজ লাভ হইবে না; কারণ আমাদের আবেদন ইংরাজ জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা স্বরাজ লাভের জন্য বাহিরের কাহারও সাহায্য প্রার্থী কখনও হই নাই; নিজেদের যোগ্যতা বলে আমরা উহা লাভ করিয়াছি। আপনারা অযোগ্য বলিয়াই উহা লাভ করিতে পারেন নাই। আপনারা যোগ্য হইলে কেহ আপনাদিগকে স্বরাজে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না।" তবে আমরা কিরূপে স্বরাজ লাভের উপযুক্ত হইব? আমাদিগকে জনসাধারণের নিকট হইতে স্বরাজ চাহিতে হইবে। জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন দাখিল করিতে হইবে। এ-দেশের কৃষকেরা যখন বুঝিবে যে স্বরাজ কি, তখন সে দাবী চাপিয়া রাখা চলিবে না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন যে, বৃটিশ-শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করাই সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। শিক্ষিত ভারতীয়গণ যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের শেষ লক্ষ্য এতদিনে পূরণ হইতই; অধিকন্তু যে-ভাবে তাহা মঞ্জুর হইত তাহা অতুলনীয়। আমরা একথা প্রায়ই বলি যে, হিন্দুস্থানের বহু সিপাহী ফ্রান্স ও মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। ঐ জন্য এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এতটুকু সুখ্যাতি দাবী করিতে পারেন না। সিপাহীরা ত স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যায় নাই। স্বরাজ কি, তাহারা জানে না। যুদ্ধাবসানে তাহারা স্বরাজ-প্রার্থী হইবে না। তাহারা নিমকের মান রাখিবার জন্য যুদ্ধে গিয়াছে। সুতরাং স্বরাজ চাহিবার সময় আমরা

সিপাহীদের কর্ম্ম-কুশলতার কথা উত্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু এইটুকু বলিতে পারি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অসি-সঞ্চালনে অক্ষমতার অপরাধ আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে।

যুদ্ধের হাঙ্গামার সময় আমরা রাজভক্ত ছিলাম, ইহাও স্বরাজ লাভের উপযুক্ততার পরিচায়ক নহে। রাজভক্তি একটা যোগ্যতা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই নাগরিক পদবাচ্য হইতে হইলে রাজভক্ত হওয়া দরকার। রাজভক্তি গুণে স্বরাজ মিলিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমরা এখন নির্ব্বান্ধাতিশয় সহকারে স্বরাজ চাহিতেছি, এবং এদেশে আমলাতন্ত্র সদুদ্দেশ্যে কাজ করিলেও তাঁহাদের যুগ যে কাটিয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছি—ইহাতেই আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে। এই-রূপ যোগ্যতাই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। স্বরাজ ব্যতীত ভারতে আপাতত শান্তি স্থাপনের আশা বৃথা। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য আমরা যদি শুধু সভা-সমিতি আর বক্তৃতা করি, তাহা হইলে জাতির অপচয় ঘটিবে। সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান এবং কাল স্বতন্ত্র। উহার ফলে কোন জাতি গঠিত হয় না।

স্বরাজ লাভে উদ্বুদ্ধ জাতির সকল বিভাগে জাগরণের সাড়া পরিস্ফুট হইবেই। সর্ব্ব প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে উহার স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। "একের পক্ষে যা' বিশ্বের পক্ষেও তা" --এই মহাসত্য সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। আমরা যদি আত্মকলহে ছিন্ন-ভিন্ন হই—বরাবরই বিপথে চলিতে থাকি এবং নিজেদের প্রবৃত্তি দমন না করিয়া তাহার বশে পরিচালিত হই, তাহা হইলে স্বরাজ আমাদের নিকট নিরর্থক হইবে। স্বরাজ-বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা আত্ম-শাসন।

তাহার পর পরিবার-পরিজনের কথা। আমাদের সংসারে যদি পরস্পরের মতৈক্য না থাকে— ভাইয়ে ভাইয়ে যদি লাঠালাঠি চলে—গৃহ-

বিবাদের ফলে একপরিবারভুক্ত সংসার-সভ্য যদি স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা ছাড়িয়া পৃথকান্ন হয়—এবং আমরা যদি ঐরূপ সীমাবদ্ধ স্বরাজের অনুপযুক্ত হই, তাহা হইলে বৃহত্তর স্বরাজের উপযুক্ত বলিয়া কিরূপে প্রতিপন্ন হইব?

অতঃপর জাতির কথা। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে—জাতিসমূহ যদি নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করিতে না পারে—উচ্চতর জাতিরা যদি সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের মুঠার মধ্যে রাখিতে উদ্যত হয়—জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ যদি এমনই স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠে যে, তাহাদিগকে লইয়া জাতিগত স্বায়ত্ত-শাসন নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্ত-শাসন চলিবে কিরূপে?

জাতির পর নাগরিক জীবনের কথা উল্লেখযোগ্য। আমরা যদি সহরের কাজকর্ম্ম নিজেরা চালাইতে না পারি—রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে—বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়ে—রাজপথ বাঁকাচোরা হয়—সহরের কার্য্য-প্রণালী পরিচালনের নিমিত্ত কোন স্বার্থত্যাগী নাগরিকের সহায়তা না পাই—পরন্তু যাঁহাদের হাতে ঐ ভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা যদি স্বার্থপর বা অমনোযোগী হন, তাহা হইলে অধিকতর ক্ষমতা লাভের দাবী আমরা কিরূপে করিতে পারি? সহরের কাজকর্ম্ম পরিচালনের যোগ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয়-জীবন গঠিত হইবে। অতএব এ বিষয়ে আরও কিছু বলা প্রয়োজন।

প্লেগ ভারতে মৌরসি-পাট্টা লইয়াছে। কলেরার ত কথাই নাই। ম্যালেরিয়ায় হাজার হাজার ভারতবাসী প্রতিবর্ষে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ওদিকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে প্লেগ একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। গ্লাসগো সহরে প্লেগ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিতাড়িত হয়। জোহানেস্

বার্গে একবার মাত্র প্লেগ দেখা দিয়াছিল। তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তারা প্রভূত চেষ্টায় এক মাসের মধ্যে ঐ রোগ নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। এখানে কিন্তু আমরা কিছুতেই প্লেগ নিবারণ করিতে পারিতেছি না। এজন্য গভর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া চলে না। আমাদের দারিদ্র্যও ইহার হেতু নহে। প্লেগের প্রতিষেধকল্পে আমরা যে কোন উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। আমেদাবাদের অধিবাসিগণ দারিদ্র্যের অজুহাতে কর্ত্তব্যের দায় হইতে রেহাই পাইবেন না। আমার ধারণা, প্লেগ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বই আমাদের উপর বর্ত্তিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্লেগের প্রকোপে যখন পল্লীগ্রামসমূহ উৎসন্ন যাইতেছিল, সে সময়ে গোরা-বারিকে একজনও প্লেগাক্রান্ত হয় নাই। ইহার হেতু সুপ্রত্যক্ষ। গোরা-বারিকের বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ, গৃহাবলী ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন এবং অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য-নীতি সংক্রান্ত অভ্যাস অতি উত্তম। পক্ষান্তরে আমাদের আব্‌হাওয়া, ঘরবাড়ী, রাজ-পথ প্রভৃতি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। আমাদের পায়খানাগুলি অত্যন্ত জঘন্য ও অপরিষ্কার। এদেশে শতকরা ৯০জন লোক পাদুকা ব্যবহার করে না। তাহারা যেখানে-সেখানে থুথু ফেলে—যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে; কাজেই ঐরূপ ময়লা পথে যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্লেগ যে এদেশে বাসা লইয়াছে, ইহা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

আমরা যদি সহরের অবস্থা পরিবর্ত্তন না করি—অপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ছাড়িয়া না দিই—এবং নিজেদের মধ্যে জাতি-সংস্কারে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে শুধু স্বরাজ লাভ করিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না।

এখানে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর হিতৈষী লোককে অস্পৃশ্য

বলিয়া ঘৃণা করার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা তাহাদিগকে শৌচাগারের একটা অংশ মাত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছি। উহার বাকী অংশটী ধর্ম্মের অজুহাতে নিজেরাও পরিষ্কার করি না—পরিষ্কার করিলে পাছে অপবিত্র হই! সুতরাং ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্ব-স্ব আবাস-গৃহের একটা অংশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ময়লা করিয়া রাখি। ইহার ফলে রোগাণু-পরিপ্লুত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা পরিবর্দ্ধিত হই! যতদিন পল্লী অঞ্চলে বাস করিতাম, ততদিন নিরাপদ ছিলাম; কিন্তু সহরে আসিয়া নিজেদের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসবশে নিয়ত আত্মহত্যা করিতেছি।

যেখানে বহুলোকের অকাল মৃত্যু ঘটে, সেখানকার অধিবাসিগণ খুব সম্ভবতঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট—আচারভ্রষ্ট। এদেশ হইতে প্লেগ দূর করা, আমাদের সাধ্যাতীত না হওয়াই উচিত—ইহাই আমার ধারণা। ঐ কার্য্যে সক্ষম হইলে আমাদের পক্ষে স্বরাজ লাভের যে যোগ্যতা বাড়িত, তাহা অতি-বড় আন্দোলনেও পূরণ হইবে না। এ বিষয়টি ডাক্তার-বৈদ্যদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ভগবান্ ডাকোরজীর মন্দির আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই অবস্থিত। ঐ তীর্থ আমি পরিদর্শন করিয়াছি। তথায় অবিশুদ্ধতার অন্ত নাই। আমি নিজে একজন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। সুতরাং ডাকোরজী মন্দিরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার আমার আছে। ঐ স্থানটী এতই অস্বাস্থ্যকর যে, স্বাস্থ্যকর স্থানে যাঁহারা চলাফেরা করেন তাঁহাদের পক্ষে তথায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইবার কষ্টও অসহনীয়! তীর্থযাত্রিগণকে পথ ও পুষ্করিণী যথেচ্ছ অপরিষ্কার করিতে দেওয়া হয়। মন্দিরের পাণ্ডারা পরস্পর বিবাদনিরত। কাজেই ডাকোরজীর অলঙ্কারাদি বহুমূল্য বেশভূষা রক্ষার জন্য একজন রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা যেমন ক্ষতিকর তেমনই

অপমানজনক। এ দোষ আমাদিগকে শুধরাইতেই হইবে। আমরা যদি নিজের ঘর সাফ্ রাখিতে না পারি, তাহা হইলে স্বরাজ চাহিব কিরূপে?

সহরে শিক্ষার অবস্থা দেখিয়াও হতাশ হইতে হয়। বে-সরকারী চেষ্টায় জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্টের দিকে তাকাইয়া আছি; এদিকে আমাদের ছেলেপুলেরা শিক্ষাভাবে শুকাইয়া মরিতেছে।

সহরে মদ্যপান দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। চা'র দোকান গলিতে গলিতে দেখা দিতেছে। নানা স্থানে জুয়াখেলার আড্ডা বসিতেছে! এই সকল কুপ্রথা যদি আমরা দমন করিতে না পারি, তাহা হইলে স্বরাজ পাইব কিরূপে? স্বরাজের অর্থ ত আত্মশাসন। দিনকাল এমন পড়িয়াছে যে, দুধ মিলা দুষ্কর। গুজরাটে গোশালাগুলি আমাদের প্রভূত অপকার করিতেছে। তাহারা প্রায় সমস্ত দুধ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তজ্জাত মাখম, পানীর প্রভৃতি বিদেশে বিক্রয় করে। যে জাতির দুধই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য, তাহারা ইহা সহ্য করিবে কিরূপে? জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত উল্লিখিত উপায়ে দুধের অপব্যবহার করা কি ভাল? দুধ ও তজ্জাত খাদ্যচয় আমাদের পক্ষে এমনই অপরিহার্য্য যে, তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে পক্ষে আমরা কি করিতেছি?

সম্প্রতি এক বকরিদ হাঙ্গামার ঘটনাস্থলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, অতি তুচ্ছ কারণে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধিয়াছে। দুষ্ট লোকে সেই সুবিধায় আগুন জ্বালাইতে ত্রুটি করে নাই। ফলে, আমরা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলাম। শেষে গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া

গত্যন্তর দেখিলাম না। এই ঘটনায় আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের প্রকৃত অবস্থা কি!

প্রাগুক্ত সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিকাংশই মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীন। সুতরাং বলিতে পারি যে, সহরের কার্য্যপ্রণালী পরিচালন করিতে পারিলে, তবে আমরা জাতীয় গভরমেণ্ট লাভে অধিকারী হইব।

একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, স্বদেশী আন্দোলন এখনও অজ্ঞান অবস্থায় নিপতিত। স্বরাজ যে স্বদেশীর ভিতর দিয়াই প্রায় সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যাইবে, ইহা আমরা আজও অনুভব করি না। আমরা যদি মাতৃভাষার প্রতি আস্থাবান না হই—নিজেদের কাপড়-চোপড় অপছন্দ করি—জাতীয় পরিচ্ছদে বীতশ্রদ্ধ হই—সুপবিত্র শিখা ধারণে লজ্জাবোধ করি – এবং মনে করি যে, আমাদের দেশীয় খাদ্য তেমন রুচিকর নহে, স্বদেশের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ নহে, স্বদেশবাসী জনসাধারণ অসভ্য ও মিলামিশার অনুপযুক্ত, আমাদের সভ্যতা দোষান্বিত এবং বৈদেশিক সভ্যতা চিত্তাকর্ষক—মোটের উপর দেশের সকল জিনিসই মন্দ আর বিদেশের সব জিনিসই ভাল—এই ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তাহা হইলে স্বরাজ বলিতে আমরা কি বুঝিব, বলিতে পারি না। বিদেশের সকল জিনিস যদি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশীর শিক্ষাধীনে বহুদিন থাকিতে হইবে; কারণ জনসাধারণের মধ্যে বৈদেশিক সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই। আমার মতে স্বরাজের মর্ম্ম অনুধাবনের পূর্ব্বে আমাদিগকে স্বদেশের প্রতি মমতা—শুধু মমতা নহে—অনুরাগ পোষণ করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে স্বদেশীর ছাপ থাকা চাই। যাহা জাতীয় পদবাচ্য তাহার অধিকাংশই দোষহীন, এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, তবে তাহার উপর স্বরাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই অভিমত অভ্রান্ত হইলে স্বদেশী-আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে

চালান উচিত। যে কোন দেশ স্বরাজ-আন্দোলন চালাইয়াছে, তাহারাই স্বদেশীর মর্ম্ম অগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

স্কচ্ হাইল্যাণ্ডারেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও ফতুয়া ব্যবহার বজায় রাখিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে রহস্য করিয়া 'ফতুয়া পল্টন' বলি। কিন্তু তাহাদের ফতুয়ার পশ্চাতে যে এক বিরাট শক্তি জাগ্রত রহিয়াছে, তাহা সারা পৃথিবী স্বীকার করে। ঐরূপ ফতুয়া পরিধান করা অসুবিধাজনক এবং উহা শত্রুর পক্ষে বন্দুকের লক্ষ্য নির্দ্দেশের সহায়ক জানিয়াও স্কটল্যাণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারেরা উহা ত্যাগ করে নাই।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আমি একথা বলিতেছি না যে, আমাদের দোষগুলি সব বজায় রাখিতেই হইবে। তবে যাহা জাতীয় পদবাচ্য তাহা একটু-আধটু অসুবিধাজনক হইলেও বর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় নহে—বিদেশী জিনিস তদপেক্ষা মনোরম হইলেও পরিত্যাজ্য। আমাদের যাহা ত্রুটী, তাহা নিজেদের চেষ্টা দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। আশা করি, এই সভার প্রত্যেক সদস্য স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং বহুল বিপদ ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও স্বদেশী-ব্রত পালনে অবহিত হইবেন। তাহা হইলে স্বরাজ সহজে আয়ত্ত হইবে।

হিন্দু-মুসলমানে আহার-বিহার

আহারে বিহারে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে এই মর্ম্মে লিখেন,—

কিছুদিন পূর্ব্বে একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হিন্দুমুসলমানের সম্মিলন সম্বন্ধে আপনি যাহা বলেন তাহাই যদি অন্তরের কথা হয়, তবে মুসলমানের সহিত খানাপিনা করিতে বা কোন মুসলমান যুবকের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারেন কি?" সম্প্রতি

এই প্রশ্নটী আরও কয়েকজন বন্ধু আমাকে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একত্র পানাহার বা পরস্পরে বৈবাহিক আদান-প্রদান না হইলে কি সম্মিলন সম্ভবপর নহে? প্রশ্নকর্ত্তারা বলেন যে, সম্মিলনের জন্য এ দু'টা জিনিস একান্ত দরকার; কাজেই উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত সম্মিলন কোন কালেই হইবে না—সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী কোটী কোটী লোক মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, একত্রে খানাপিনা করিতেও কখনও সম্মত হইবে না।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যাঁহারা ক্ষতিকর মনে করেন, আমি তাঁহাদের দলভুক্ত নহি। যে সময়ে উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সময়ে উহার দ্বারা প্রভূত জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আমার মতে হিন্দু-মুসলমানে খানাপিনা বা বিবাহ না হইলে জাতীয় উন্নতি হইবে না—এই কুসংস্কার পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছে। জীবন রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যনীতি পালন করার ন্যায় আহার করাও একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ। মানুষ যদি আহার ব্যাপারকে ভোগ-বিলাসের অঙ্গ করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে তাহারা জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যেমন গোপনে সম্পাদন করে, আহারও সেইরূপ গোপনে সম্পাদন করিত। বস্তুত আহার-ব্যাপারে হিন্দুরা এই শ্রেষ্ঠ নীতি মানিয়াই চলে। এখনও এদেশে এমন হাজার হাজার হিন্দু আছেন, যাঁহারা অপর কাহারও সম্মুখে ভোজন করেন না। আমি এমন অনেক শিক্ষিত নর-নারীর নাম করিতে পারি, যাঁহারা একান্ত গোপনে ভোজন করিতেন অথচ কাহারও প্রতি তাঁহারা বিদ্বেষাপন্ন ছিলেন না—সকলের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল।

বৈবাহিক আদান-প্রদানের সমস্যা আরও গুরুতর।' সহোদর

ভাই-ভগ্নীর মধ্যে পরিণয়ের কথা না ভাবিয়াও তাহারা যেমন পরস্পরে সদ্ভাবসম্পন্ন থাকে, সেইরূপ সদ্ভাব প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি দেখান আমার কন্যার পক্ষে দুরূহ নহে। ধর্ম্ম ও বিবাহ সম্বন্ধে আমার অভিমত অতি কঠোর। আমার মতে কি ভোজনে, কি পরিণয়ে, ভোগের প্রবৃত্তিকে যতই সংযত করিতে পারিব, ততই আমাদের ধর্ম্মোন্নতি হইবে। সংসারে সকলের সহিত আমি মিলামিশা করি বলিয়া যদি যে-কোন যুবকের পক্ষে আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হওয়া সঙ্গত হয়, অথবা যে-কোন ব্যক্তির সহিত পানাহার করা যদি আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রাখাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সারা পৃথিবীর সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ রহিব, ইহাই আমার দাবী। আমি কোন মুসলমান বা খৃষ্টানের সহিত কখনও বিবাদ করি নাই; কিন্তু বহুদিন যাবৎ খৃষ্টান বা মুসলমানের বাড়ীতে ফল ছাড়া আর কিছুই খাই নাই। নিজের ছেলের সহিত রাঁধা-জিনিস একপাতে খাইতে অথবা সে যে পাত্র হইতে চুমুক দিয়া জল খাইয়াছে, তাহা না মাজিয়া তাহাতে জল খাইতে আমি কিছুতেই সম্মত নহি। এ বিষয়ে যে বিধি-নিষেধ আমি পালন করিয়া আসিতেছি, তাহার ফলে কোন খৃষ্টান বা মুসলমান বন্ধুর সহিত অথবা আমার পুত্রগণের সহিত আমার সৌহার্দ্দ-বন্ধন এতটুকুও শিথিল হয় নাই।

পক্ষান্তরে একত্রে পানভোজন বা পরস্পরে পরিণয় হইলেই যে ঝগড়া-বিবাদ সব মিটিয়া যায় তাহা নহে। পাণ্ডব ও কৌরবেরা এক সঙ্গে খানাপিনা করিত, তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও ছিল, অথচ তাহারা পরস্পরে কাটাকাটি মারামারি করিত। ইংরাজ ও জর্ম্মণদের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই!

প্রকৃত কথা এই যে, একত্র পানাহার বা পরস্পরে বৈবাহিক আদান-প্রদান অনেক স্থলে সম্মিলনের নিদর্শন হইলেও, উহা বন্ধুত্ব বা মিলনের অপরিহার্য্য উপাদান নহে। এই দুইটীর মধ্যে কোন একটীর জন্য নিতান্ত জেদ্ ধরিলে হিন্দু-মুসলমানের একতা অসম্ভব হইয়া পড়ে; বস্তুতঃ আজকাল তাহাই হইতেছে। আমরা যদি এরূপ মনে করি যে, হিন্দু-মুসলমানে একত্রে পানাহার বা পরস্পরে বৈবাহিক আদান-প্রদান না ঘটিলে তাহারা কিছুতেই একতাবদ্ধ হইতে পারিবে না, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এমন একটা কৃত্রিম ব্যবধান গড়িয়া তোলা হইবে যে, তাহা সরাইয়া ফেলা প্রায় অসম্ভব। মুসলমান যুবকেরা যদি হিন্দু কুমারীদের পাণিগ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত মনে করে, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন-পথে নিদারুণ বাধা পড়িবে। হিন্দু পিতামাতার মনে যদি এ বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমান যুবকগণকে তাঁহাদের বাড়ীতে অবাধে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আমার মতে হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণের পক্ষে এই গণ্ডীটুকু মানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

হিন্দু-মুসলমান যুবকেরা পরস্পরের সমাজে বিবাহ করিলে তাহাদের পক্ষে স্ব-স্ব ধর্ম্মে একনিষ্ট থাকা একান্ত অসম্ভব হইবে। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের মুলতত্ত্ব এই যে, তাহাদিগকে স্ব-স্ব ধর্ম্মে একনিষ্ঠ থাকিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এ যাবৎ যে জাতি-বিদ্বেষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দবান্ হইতে পারেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন জিনিসটা কি? এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? ইহার উত্তর অতি সহজ। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন বলিতে আমরা উভয় সম্প্রদায়ের একই উদ্দেশ্য একই,

লক্ষ্য ও একই দুঃখ বুঝি। আমরা যদি পরস্পরের দুঃখ সমানভাবে অনুভব করি, উভয়ে উভয়ের প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন করি এবং একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য পরস্পরে সহানুভূতিসম্পন্ন হই, তাহা হইলে একতা আসিবেই আসিবে। আমাদের লক্ষ্য ত এখন এক। কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই ইচ্ছা করেন যে, আমাদের জন্মভূমি গৌরবশালিনী হউক—আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করি। আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের দুঃখ অনেক বিষয়ে এক। খেলাফৎ-সমস্যা সম্বন্ধে মুসলমানগণ অধুনা গভীর বেদনা বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত। হিন্দুগণ মুসলমানদের এই দাবী আন্তরিকভাবে সমর্থন করিলে সহজেই তাঁহাদের সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারিবেন। এখন খেলাফৎ-সমস্যার সমাধানে উভয় পক্ষ একতাবদ্ধ হইলে যে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইবে, তাহা একত্র পানাহারের সৌহার্দ্দ অপেক্ষা অনেক প্রবল।

পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব বর্জ্জন করা সকল জাতির পক্ষে সকল সময়ে কর্ত্তব্য। হিন্দুরা যদি মুসলমানের রীতি-নীতি বা পূজা-পদ্ধতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব বর্জ্জন না করে এবং মুসলমানেরা যদি হিন্দুর প্রতিমা-পূজা বা গো-সেবা দেখিয়া অধীর হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই শান্তির ছায়ায় বসবাস করিতে পারিব না। কোন কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বর্জ্জন করিলেই যে তাহা সমর্থন করিতে হইবে, এরূপ নহে। মদ-মাংস খাওয়া বা ধূমপান করা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু তা বলিয়া যে সকল হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান মদ-মাংস খান বা ধূমপান করেন, তাঁহাদের প্রতি আমি বিদ্বিষ্ট নহি। আশা করি তাঁহারাও আমার প্রতি, ঐ সকল জিনিস পছন্দ না করার জন্য বিদ্বিষ্ট হইবেন না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের একমাত্র হেতু এই যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের ঘাড়ে নিজের মতটা জোরপূর্ব্বক চালাইয়া দিতে চাহেন।

অস্ত্রবল

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে এক প্রবন্ধ নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রকাশ করেন,—

এ যুগের সকলেই আসুর শক্তির উপাসক ; সুতরাং কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, আসুর শক্তি শেষে জয় লাভ করিবে না। এই কারণে আমি এমন অনেক বেনামী চিঠি পাই, যাহাতে লেখকগণ আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, অসহযোগ আন্দোলন এখন অনুগ্রভাবে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলেও জনসাধারণ যদি শেষে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মাতে, তখন যেন আমি বাধা না দিই। আবার কেহ কেহ মনে মনে অনুমান করিয়া লয়েন যে, আমি গোপনে বল প্রকাশের অয়োজন নিশ্চয়ই করিতেছি। তাঁহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, বাহুবল প্রকাশের সে শুভ মুহূর্ত্ত কবে আসিবে? তাঁহারা একথাও নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, গোপনে হউক বা প্রকাশ্যে হউক, উগ্রমূর্ত্তি না ধরিলে ইংরাজ আমাদের কথায় কখনই কর্ণপাত করিবেন না। শুনিয়াছি আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ভাবেন আমি অতি বদ্ লোক—মনের কথা কিছুতেই ভাঙ্গিয়া বলি না ; বস্তুতঃ আমিও নাকি তাঁহাদের মত বল প্রয়োগেরই পক্ষপাতী !

অধিকাংশ লোকের অভিমত যখন এইরূপ, অথচ ইহাঁদিগকে লইয়াই আমাকে যখন কাজ করিতে হইবে, তখন অনুগ্রতা (non-violence) সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সাধারণের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ অসহযোগ-আন্দোলনের সাফল্য জনসাধারণের অনুগ্রতার উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি বিশ্বাস করি, কাপুরুষতা ও বল প্রকাশ—এ দু'য়ের মধ্যে বল প্রকাশই বরণীয়। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন সাংঘাতিকরূপে প্রহৃত হই, সেই সময়ে সে যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বল প্রয়োগের দ্বারা আমাকে রক্ষার চেষ্টা করা সমীচীন হইত, না আমাকে মরণের কোলে ফেলিয়া পলাইয়া গেলে সে ভাল করিত? আমি বলিয়াছিলাম, তখন আমাকে রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ করাই তাহার কর্ত্তব্য হইত। এই জন্যই আমি বুয়র যুদ্ধে, তথাকথিত জুলুবিদ্রোহে এবং সেদিনকার মহাসমরে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। এই জন্যই যাহারা বলপ্রয়োগ-নীতিতে আস্থাবান, তাহাদের পক্ষে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করার আমি পক্ষপাতী। ভারতবাসী কাপুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত নিজেদের অপমান দেখিবে, ইহাপেক্ষা ইজ্জত রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা বরং ভাল।

তথাপি আমার বিশ্বাস, আসুর বল প্রয়োগ অপেক্ষা অনুগ্রতা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। দণ্ডদান অপেক্ষা, ক্ষমাই বীরত্বের পরিচায়ক। ক্ষমা বীরের ভূষণ। শাস্তিদানের ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও যদি ক্ষমা করা যায়, তবেই উহার গৌরব। নচেৎ যে নিজে অসহায়, তাহার ক্ষমা নিরর্থক। মার্জ্জার যখন মুষিকের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, তখন মুষিকের সেই অবস্থা কি ক্ষমার দ্যোতক? এই কারণে যাঁহারা জেনারেল ডায়ার ও তাঁহার সহকারিগণকে দণ্ডিত করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের মনোভাব আমি অনুমোদন করি। সামর্থ্য থাকিলে তাঁহারা ডায়ারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, ভারতবর্ষ একান্ত অসহায়। নিজেকেও আমি অসহায় বলিয়া বোধ করি না। তবে আমার ও ভারতের

শক্তিকে আমি উহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করিতে চাই।

আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। শক্তি শরীরের জিনিস নয়। অদম্য ইচ্ছাই শক্তির উৎস। শারীরিক সামর্থে একজন জুলু একজন ইংরাজ অপেক্ষা অনেক অধিক বলশালী। কিন্তু একটী ইংরাজ বালককে দেখিলেই সে পলায়ন করে; কারণ ইংরাজ বালকের পিস্তলকে অথবা তাহার হইয়া যাহারা পিস্তল ব্যবহার করিবে, তাহাদিগকে সে ডরায়। প্রকাণ্ড জোয়ান হইয়াও সে মৃত্যুভয়ে কম্পিত। ভারতে আমরা ইহা এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারি যে, ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর পক্ষে একলক্ষ ইংরাজের ভয়ে ভীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ক্ষমার কথা মনে হইলেই নিজেদের শক্তির কথা হৃদয়ে জাগিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ক্ষমা করিলে প্রাণে এমনই মহাশক্তির বিশাল তরঙ্গ উঠিবে যে, ভারতের ভক্তিনত শিরে অপমানের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া ডায়ার বা ফ্রাঙ্ক জন্‌সনের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আমরা প্রতিশোধ দিতে পারিতেছি না, বা ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না বলিয়া আপনাদিগকে পদদলিত মনে করিতেছি। কিন্তু একথা আমি মুক্তকণ্ঠে কহিব যে,দণ্ডদানের অধিকার আজ ছাড়িয়া দিলে আমাদের লাভ অধিক হইবে। আমাদের সম্মুখে ইহাপেক্ষা উচ্চতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে—বিশ্ববাসীকে আমরা শ্রেষ্ঠতর মন্ত্রে দীক্ষা দিব।

আমাকে কেহ উৎকট কল্পনাপ্রিয় লোক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আদর্শবাদী হইলেও পার্থিব বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। অহিংসা-ধর্ম্ম কেবল ঋষি-তপস্বীর জন্য নহে। সাধারণ লোকের পক্ষেও উহা গ্রহণীয়। পশুর আত্মা নিদ্রিত, কাজেই তাহারা পশুবলের বিধান ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু মানুষের পদগৌরব উচ্চতর বিধান মানিতে চায়—আত্মার শক্তি মানিতে তাহারা বাধ্য।

এই জন্যই আমি ভারতবাসীর সম্মুখে এদেশের প্রাচীনতম বিধান—আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছি। কারণ, সত্যগ্রহ এবং উহা হইতে উৎপন্ন অসহযোগ (Non-co-operation) ও শিষ্ট-অবাধ্যতা (Civil Disobedience)—এ সকলই আত্ম-নিগ্রহের নামান্তর মাত্র। ভারতের যে সকল ঋষি এই অনুগ্রতামূলক বিধান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিউটন অপেক্ষা অধিক প্রতিভাবান্—ওয়েলিংটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর। অস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়াও তাঁহারা পশুবলের বিফলতা দর্শনে বিশ্ববাসীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, আসুরিক শক্তির দ্বারা মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না· অহিংসাই তাহার পথ।

অনুগ্র ব্যক্তিগণ সব জানিয়া-শুনিয়াই সহ্য করেন। তাঁহারা যে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অত্যাচারীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহা নহে; বরং তাঁহারা অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদেব সমগ্র আত্মাকে নিয়োগ করেন। এই বিধানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করিলে একজন লোকেই আপন সম্মান, ধর্ম্ম ও আত্মার রক্ষা বিধানের জন্য অন্যায়াচারী সাম্রাজ্যের সমগ্র বিরাট শক্তিকেও অগ্রাহ্য করিতে পারে। তাহার ফলে সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, অথবা উহা নূতন ধরণে গড়িয়া উঠে।

ভারতবাসী দুর্ব্বল বলিয়া আমি তাহাদিগকে অনুগ্রতা অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। তাহারা যে শক্তিমান ইহা অনুভব করিয়া সংযম অভ্যাস করুক। ভারতবাসী শক্তিমান কিনা, ইহা বুঝিবার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। ভারত বুঝুক যে, তাহার আত্মা ধ্বংস হইবার নহে। পৃথিবীর সমগ্র পশুবল একত্র হইয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে গেলেও ভারতের আত্মা জয়যুক্ত হইবে। সামান্য নররূপী রামচন্দ্র

যে বানরদলের সহায়ে সাগর-পরিখা বেষ্টিত লঙ্কার প্রবল প্রতাপান্বিত অধীশ্বর দর্পী দশাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি? ইহা কি আধ্যাত্মিক বলে পশুশক্তিকে জয় করা নয়? রাজনীতি-ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বলের সাফল্য ভারতবাসী সম্যক বুঝিবার পূর্ব্বেই আমি কার্য্যারম্ভ করিয়াছি; কারণ এ সংসারের গতি-প্রকৃতি আমি জানি। ইংরাজের মেসিন কামান, উড়ো জাহাজ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি দেখিয়া ভারতবাসী আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় ও দুর্ব্বল মনে করে। সেই দুর্ব্বলতা-বশতঃই তাহারা অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। যে ভাবেই এই নীতি অবলম্বিত হউক না কেন, ফল কিন্তু একই হইবে। অধিকাংশ লোক যদি ইহা মানিয়া চলে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করিবে।

আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌বাদ ও আমাদের অসহযোগ-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাঁহারা পশুবলের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকেও আমি এই অনুগ্র অসহযোগ-নীতি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। দুর্ব্বলের অস্ত্র বলিয়া ইহা ব্যর্থ হইবে না; তবে যদি লোকে ইহাতে উপযুক্তভাবে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে ইহা ব্যর্থ হইতে পারে। সেই সময়েই বিপদ গুরুতর। উচ্চপ্রাণ লোকেরা তখন জাতীয় অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত বল প্রকাশ করিবে। যদি তাহা করে, তবে আমার বিশ্বাস, তাহারা দেশের মুক্তি বিধানে সমর্থ হইবে না—নিজেরাও ধ্বংসের পথে যাইবে। অস্ত্রবলের সাহায্যে হয়ত ভারতবাসী সাময়িক জয়লাভ করিতেও পারে; কিন্তু তখন ভারতবর্ষকে আমার হৃদয়ের গৌরব বলিয়া মনে করিতে পারিব না। ভারতবর্ষ আমার সর্ব্বস্ব—আমার প্রাণ। আমার স্থির বিশ্বাস, জগতে নূতন সত্য প্রচারের জন্যই ভারতের অস্তিত্ব—অন্ধভাবে ইউরোপের অনুকরণ করা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ভারত যদি কখনও অস্ত্রবলের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই আমার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। সেজন্য আমি

প্রস্তুত। ভৌগলিক গণ্ডীর দ্বারা আমার ধর্ম্ম পরিবেষ্টিত নহে। অহিংসা-ধর্ম্মের বলে ভারতমাতার সেবা করিবার অন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমার মতে ইহাই হিন্দুত্বের মূলতত্ত্ব।

যাঁহারা আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাকে পশুবলের উপাসক ভাবিয়া বৃথা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্রতী না হন। আমি গোপনতা পাপজনক বলিয়া ঘৃণা করি। তাঁহারা অনুগ্র অসহযোগ-নীতি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। দেখিতে পাইবেন, আমার মনে-মুখে এক—আমি কোন কথা গোপন করি নাই।

অনুগ্র অসহযোগ

(Non-violent Non-co-operation.)

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্রতটে বিশাল জনমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ এই,—

অসহযোগ সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথাই শুনিয়াছেন; কিন্তু অসহযোগ কি? এবং কেনই বা আমরা সকলকে এই নীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছি? এই 'কেন'র উত্তর আমি এখানে দিব। অধুনা দেশের সম্মুখে দুইটী সমস্যা উপস্থিত। তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম সমস্যা—খেলাফৎ। খেলাফৎ-সমস্যা লইয়া ভারতীয় মুসলমানগণ তীব্র মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বহু বিচার-বিবেচনার পর ইংরাজ জাতির নামে যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা আজ ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। সেই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে

বৃটিশ জাতি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট কাজ আদায় করিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু পরে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। ফলে, ইসলাম মহাধর্ম্ম আজ বিপন্ন। মুসলমানগণ সঙ্কল্প করিয়াছেন (আমার ধারণা তাঁহাদের সঙ্কল্প ন্যায়সঙ্গত) যে, যতদিন বৃটিশের প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থাকিবে ততদিন তাঁহারা বৃটিশজাতির সম্পর্কে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস অটল রাখিতে পারিবেন না। যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানকে একথা বলা হয় যে, বৃটিশজাতির প্রতি ভক্তি ও আপন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আনুরক্তি এ দু'য়ের মধ্যে কোনটি তিনি বাছিয়া লইবেন, তাহা হইলে তাহা বাছিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবে না ; বস্তুতঃ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাঁহাদের সঙ্কল্প উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। মুসলমানগণ আজ অকপটভাবে, স্পষ্ট ভাষায়, নিজেদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশজাতি ও বৃটিশ রাজমন্ত্রিগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন না করেন—তাঁহারা যদি ভারতের সাতকোটী মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে অনিচ্ছুক হন—তাহা হইলে তাঁহারা যেন ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীর রাজভক্তি প্রত্যাশা না করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতের অ-মুসলমান অধিবাসিগণ স্বদেশবাসী মুসলমানদের প্রতি প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য পালন করিবেন কি না? যদি করেন, এই সেই মহা সুযোগ। শত বৎসরের মধ্যেও এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর আসিবে না। এতদিন ধরিয়া হিন্দুরা যে মুসলমানগণকে 'ভাই' বলিয়া আসিতেছেন, তাহার সত্যতা প্রতিপাদনের—মুসলমানের প্রতি তাঁহাদের সদিচ্ছা, সৌহার্দ্দ ও সহযোগিতা প্রদর্শনের—ইহাই ত শুভ অবসর। হিন্দুদের মনে যদি এ ধারণা থাকে যে, ইংরাজের সহিত সম্বন্ধের বহুপূর্ব্বে মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত তাঁহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমি বলি, আপনারা যদি

মুসলমানদের দাবী ন্যায়সঙ্গত মনে করেন—যদি বুঝিয়া থাকেন যে, ইহার পশ্চাতে প্রকৃত ধর্ম্মানুভূতি রহিয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানগণকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করিয়া আপনারা পারেন না। যতদিন তাঁহাদের এই দাবী ন্যায়সঙ্গত রহিবে, যতদিন মুসলমানগণ ভারতের অকল্যাণকর কোন পন্থাবলম্বন না করিয়া ন্যায্যভাবে নিজেদের আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টা করিবেন, ততদিন আপনারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। ভারতীয় মুসলমানগণ উল্লিখিত সর্ত্তে হিন্দুর সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমানগণ যখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিন্দুর সাহায্য গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই এবং ইহাও বুঝিয়াছেন যে, জগতের সম্মুখে তাঁহাদের দাবী ও অবলম্বিত উপায় ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন, তখনই তাঁহারা হিন্দুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এখন হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিসমূহের সম্মুখে বলুন যে, ভারত দুর্ব্বল হইলেও আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে অপারগ নহে। ধর্ম্মের জন্য—আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য—কেমন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তাহা ভারতবাসী জানে।

খেলাফৎ-সমস্যা সংক্ষেপে এই। ইহার উপর আবার পঞ্জাবের ব্যাপার আছে। পঞ্জাবের ব্যাপারে ভারতের মর্ম্মস্থলে যেরূপ ভীষণ শেল বিঁধিয়াছে সেরূপ আঘাত গত একশত বর্ষের মধ্যে ভারতবাসী আর পায় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের কথা আমি বাদ দিতেছি না। সে সময়ে ভারতবাসী যত ক্লেশই সহ্য করিয়া থাকুক না কেন, রাউলাট আইন পাশ হওয়ার সময়ে এবং তাহার পরে ভারতবাসীর অদৃষ্টে যেরূপ লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ। পঞ্জাব-অনাচারের সুবিচার ইংরাজ জাতির নিকট হইতে আদায় করিতে হইলে তজ্জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে

হইবে। পার্লামেণ্টের কমন্স সভা, লর্ড সভা, ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও ভারতের বড়লাট— ইহাঁরা সকলেই জানেন যে, খেলাফৎ ও পঞ্জাবের ঘটনা সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনোভাব কিরূপ। কিন্তু পার্লামেণ্টের আলোচনায় এবং বড়লাট ও ভারত-সচিবের কার্য্যকলাপে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া সুবিচার করিতে প্রস্তুত নহেন। দেশের নেতৃগণ এই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করুন। আমরা যদি আপনাদিগকে এদেশের বৃটিশ-শাসক সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে না পারি —যদি তাঁহাদের নিকট সম্মান আদায় করিতে না পারি—তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব বা সৌহার্দ্দ পোষণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই জন্যই আমি এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অসহযোগ-নীতি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছি।

শুনিতেছি, এই অসহযোগ-নীতি নাকি আইন-বিরুদ্ধ! আমি দৃঢ়তার সহিত ইহা অস্বীকার করিতেছি। বরং আমার মতে, অসহযোগ-নীতি সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত। মানব মাত্রেরই ইহাতে জন্মগত অধিকার আছে এবং ইহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রধান ভক্ত বলিয়াছেন যে, বৃটিশ-রাজনীতি অনুসারে বিদ্রোহও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়—যদি তাহা সাফল্য লাভ করে। এই উক্তির সমর্থনে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বিদ্রোহ সফল হউক বা বিফল হউক, সাধারণতঃ বিদ্রোহ বলিলে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ বাহুবলে জোর করিয়া ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করা—আমি বৈধ বলিয়া দাবী করি না। পক্ষান্তরে আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, শারীরিক বল ইউরোপে

যে সাফল্যই লাভ করুক না কেন, ভারতের পক্ষে উহার কোন সার্থকতা নাই। আমার সোদরোপম সুহৃৎ সওকৎ আলি বাহুবলের পক্ষপাতী। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যদি অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি সাহস ও বিজ্ঞতা সহকারে যুদ্ধে নামিতেন। কিন্তু তিনিও প্রকৃত যোদ্ধার মত বুঝিয়াছেন যে, ভারতের পক্ষে বাহুবলের পথ উন্মুক্ত নহে। তাই তিনি আমার সহিত সম্মিলিত হইয়া আমার বিনীত সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, যতদিন আমি তাঁহার সহিত থাকিব—যতদিন তিনি আমার এই নীতির উপর বিশ্বাস না হারাইবেন—ততদিন তিনি কোন শ্বেতাঙ্গের বা কোন মানুষের উপর বলপ্রয়োগের কল্পনা মাত্রও মনে স্থান দিবেন না। আমি আজ আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন।

এখন সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণকে আমি ইহা পালন করিতে অনুরোধ করি। আমি বলিতে পারি যে, বৃটিশ ভারতে সওকৎ আলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা আমাদের দলে কেহ নাই। যদি কখনও অস্ত্র-ধারণের সময় আইসে. তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন, তিনি উন্মুক্ত অসি করে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আর আমি হিন্দুস্থানের অরণ্যে আত্মগোপন করিয়াছি। যেদিন ভারতবাসী অস্ত্র-নীতি অবলম্বন করিবে, সেই দিন ভারতবাসীরূপে আমার জীবন-লীলা সমাপ্ত হইবে। কারণ আমার বিশ্বাস, এ জগতে ভারতের একটা বিশেষ কিছু করিবার আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যুগযুগান্তের ভূয়োদর্শনের ফলে এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পাশব-বলের উপর মানবের ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পরন্তু আত্মোৎসর্গ -যজ্ঞ ও কোরবাণিই উহার প্রকৃষ্ট ভিত্তি। আমি এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াছি; যতদিন

বাঁচিব, এই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকিব। এই জন্যই আপনাদিগকে বলিতেছি যে, বন্ধুবর সওকৎ আলি বাহুবলের উপর আস্থাবান হইয়া অনুগ্রতাকে দুর্ব্বলের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিলেও, আমার বিশ্বাস, অনুগ্রতা বলবানেরই অস্ত্র। যে ব্যক্তি নিরস্ত্র অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য শত্রুর সম্মুখে বুক পাতিয়া দিতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ বীর। অতএব আমি শিক্ষিত স্বদেশীয়গণকে বলিতে চাই যে, অসহযোগ-নীতি যতদিন উগ্রতা-বর্জ্জিত রহিবে, ততদিন উহা আইন-বিরুদ্ধ হইবে না।

আমি যদি বৃটিশ গভরমেণ্টকে বলি,—'তোমাদের গোলামি করিব না' তাহা হইলে আমার উক্তি কি অবৈধ হইবে? আমাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় যদি গভরমেণ্টের প্রদত্ত যাবতীয় উপাধি সসম্মানে ফিরাইয়া দেন, তবে কি তাহা আইন-গর্হিত হইবে? পিতামাতা যদি পুত্রগণকে সরকারী বা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লয়েন, তবে কি সে কাজ বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হইবে? আজ যদি কোন ব্যবহারাজীব বলেন,—'যতদিন তোমাদের আইন আমাকে উন্নত না করিয়া অবনতির পথে ঠেলিয়া দিবে, ততদিন আমি তাহার সমর্থন করিব না' তাহা হইলে কি তাঁহার পক্ষে কিছু অন্যায় করা হইবে? গভরমেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী বা জজ যদি একথা বলেন,—'যে গভরমেণ্ট দেশের লোকমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ, আমি তাহার অধীনে কার্য্য করিব না' তাহা হইলে কি তাহা অবৈধ হইবে? আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বা সৈনিকপুরুষ বুঝিতে পারেন যে, গভরমেণ্ট প্রকৃতই তাঁহার দেশবাসীর স্বার্থহানি করিতেছেন এবং ইহা বুঝিয়া যদি তিনি সরকারী কর্ম্মে ইস্তফা দেন, তবে কি তাহা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে? আজ যদি আমি কৃষাণদের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলি,—'তোমরা গভরমেণ্টকে যে কর দাও

তাহা তোমাদের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় না, পরন্তু তোমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার জন্যই খরচ করা হয়, অতএব আর কর দিও না' তাহা হইলে কি তাহা আইন-বিরুদ্ধ হইবে ?

আমার বিশ্বাস, এ সকল কাজ আইন-বিগর্হিত নহে। অধিক কি, এই সকল কাজের প্রত্যেকটীই আমি নিজে অনুষ্ঠান করিয়াছি ; কিন্তু কেহ কোন দিন বলে নাই যে, ইহা আইন-বিরুদ্ধ। কয়রা জেলায় সাত লক্ষ কৃষাণের মধ্যে আমি এই সকল কাজ করিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। সে ব্যাপারে সমস্ত ভারত আমাকে সমর্থন করিয়াছে। তখন কাহারও মনে এ প্রশ্ন জাগে নাই যে, ইহা অবৈধ। আমি বলিতেছি, অসহযোগের মধ্যে অবৈধতার চিহ্নমাত্র নাই। বরং আমি বলিতে চাই যে, যে জাতি এই সুমহান্ নিয়মতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সংস্রবে থাকিয়াও ভারতবাসীকে যদি ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশে কেঁচোর মত বুকে হাঁটিতে হয়, তবে তাহা অবৈধ। ভারতবাসীকে যদি এ অপমান নীরবে পরিপাক করিতে হয়, তবে তাহা বে-আইনি বলিয়া উল্লেখ করিব। ভারতের সাত কোটী মুসলমান যদি তাহাদের ধর্ম্মের গ্লানি অম্লান বদনে সহ্য করে, তবে তাহাকেও অবৈধ বলিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। যে গভরমেণ্ট পঞ্জাবের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করা বা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা, ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অবৈধ। আমি আমার দেশবাসিগণকে বলিতেছি,—'যে পর্য্যন্ত আপনাদের আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিবে—যে পর্য্যন্ত আপনারা নিজেকে পুরুষ-পরম্পরাগত সনাতন রীতিনীতির উত্তরাধিকারী ও রক্ষক বলিয়া পরিচিত করিবেন—সে পর্য্যন্ত এই অসহযোগ-নীতি অবলম্বন না করাই আপনাদের পক্ষে অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমাদের গভরমেণ্টের ন্যায় যে গভরমেণ্ট

বিধি-বিগর্হিত কাজ করেন, তাহার সহযোগিতা করা আপনাদের পক্ষে অবৈধ।

আমি ইংরাজ-বিদ্বেষী নহি—বৃটিশ-বিদ্বেষীও নহি। কোন গভরমেণ্টেরই আমি বিরোধী নহি। আমি অসত্যের—ভণ্ডামির—অবিচারের বিরোধী। গভরমেণ্ট যতদিন অবিচারের পক্ষপাতী থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা আমাকে ঘোর শত্রু মনে করিতে পারেন। ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অমৃতসর কংগ্রেসে আমি কাহারও কাহারও নিকট নতজানু হইয়া গভরমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে, বৃটিশ মন্ত্রিগণ স্বভাবতঃ জ্ঞানী; সুতরাং তাঁহারা মুসলমানদের ধর্ম্মানুভূতি ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না এবং পঞ্জাব-অনাচারের সুবিচার করিবেন। এই জন্যই তখন বলিয়াছিলাম,—'আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া গভরমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করি।' সে সময়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, সম্রাটের ঘোষণা-বাণী দ্বারা গভরমেণ্ট আমাদের মিত্রতা-প্রার্থী হইয়াছেন। বৃটিশ-মন্ত্রিগণের আচরণে আমার সে বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন শুধু ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আমি এখানে আসি নাই; পরন্তু এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী গভরমেণ্ট যাহাতে পঙ্গু হইয়া পড়ে, সেইরূপ সুদৃঢ় অসহযোগ-নীতি অবলম্বনের জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই মহাব্রত লইয়া আজ আমি এখানে দণ্ডায়মান। যে পর্য্যন্ত না আমরা ন্যায়বিচার আদায় করিতে পারিব—যে পর্য্যন্ত না আমাদের আত্মসম্মান ফিরিয়া পাইব—সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের শাস্ত্র বলেন—এবং আমিও ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া (কিছুমাত্র মতদ্বৈধের আশঙ্কা না করিয়া) অকুণ্ঠিত চিত্তে কহিতেছি যে, বিচার ও অবিচার—

অবিচারী ও বিচার-প্রিয়—সত্য ও অসত্য—ইহাদের মধ্যে পরস্পরে সহযোগিতা থাকিতেই পারে না। যতদিন গভরমেণ্ট আপনাদের সম্মান রক্ষা করিবেন, ততদিন সহযোগিতা করা আপনাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যখন গভরমেণ্ট আপনাদের সম্মান অপহরণ করিবেন, তখন অসহযোগই অবলম্বনীয়। ইহাই অসহযোগ-নীতি।

কংগ্রেসে অসহযোগ

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গান্ধী অনুগ্র অসহযোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুচিন্তিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন,—

"যেহেতু খেলাফৎ-সমস্যা সম্বন্ধে ভারত গভরমেণ্ট ও বিলাত গভরমেণ্ট, উভয়েই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী মুসলমানগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাও তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়াছেন, অতএব মুসলমান ভ্রাতাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপদ মোচনে সর্ব্ববিধ ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সাহায্য করা মুসলমানেতর প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

"এবং যেহেতু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত গভরমেণ্ট ও বিলাত গভরমেণ্ট, উভয়েই পঞ্জাবের নিরপরাধ প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছেন অথবা ঐ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন; যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী নিরীহ প্রজার প্রতি বর্ব্বরোচিত ও অসৈনিকোচিত ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদের দণ্ড বিধানে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; সরকারী কর্ম্মচারিগণের

কৃত অপরাধসমূহের জন্য যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী বলিয়া এবং আপনার শাসনাধীনে ন্যস্ত প্রজামণ্ডলীর কষ্টে যিনি সহানুভূতিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, সেই স্যার মাইকেল ও'ডায়ারকে উল্লিখিত উভয় গভরমেণ্ট অব্যাহতি দিয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয় কমন্স সভায়, বিশেষতঃ লর্ড সভায়, পঞ্জাব ব্যাপারের আলোচনার সময় ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি আদৌ লক্ষিত হয় নাই, পরন্তু ঐ দুই সভার সদস্যগণ পঞ্জাবের অনাচার ও ভীতিমূলক শাসন-পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন; সম্প্রতি বড়লাট যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও খেলাফৎ ও পঞ্জাব-ব্যাপার সম্বন্ধে অনুশোচনার লেশমাত্র নাই—অতএব এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, উল্লিখিত দুইটী অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে ভারতবাসী কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। জাতীয় সম্মান রক্ষার ও ভবিষ্যতে ঈদৃশ অন্যায়ের পুনঃ সংঘটন নিবারণের একমাত্র অমোঘ উপায় হইতেছে—স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, যতদিন না স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অনুগ্র অসহযোগ নীতির সমর্থন করা ও তদনুসারে শনৈঃ শনৈঃ কাজ করা ব্যতীত ভারতবাসীর আর অন্য উপায় নাই।

"যাঁহারা এতদিন জনসাধারণের প্রতিনিধির কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই এবিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। এবং যেহেতু গভরমেণ্ট প্রজাদিগকে উপাধি ও পদমর্য্যাদা দিয়া, বিদ্যালয়গুলিকে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে চালাইয়া এবং আইন-আদালত ও ব্যবস্থাপক সভার মারফতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকেন, অতএব কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন যে,—

(ক) সরকারী উপাধি ও অবৈতনিক পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহে গভরমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যের পদ পদত্যাগ করিতে হইবে।

(খ) গভরমেণ্টের বা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্মানার্থ লেভি, দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হইবে না।

(গ) গভরমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত বা গভরমেণ্টের সাহায্য-পুষ্ট স্কুল-কলেজ হইতে ক্রমশঃ ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লইতে হইবে এবং এই শ্রেণীর স্কুল-কলেজের স্থানে প্রত্যেক প্রদেশেই ন্যাশানাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ঘ) ব্যবহারাজীবগণকে ক্রমে ক্রমে ইংরাজের আইন আদালত ত্যাগ করিতে এবং মামলা-মোকদ্দমার আপোষ নিষ্পত্তির জন্য নিজেদের সালিসী-আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ঙ) সৈনিকের কাজে হউক, কেরাণীর কাজে হউক, অথবা মজুরের কাজেই হউক, কোন ভারতবাসী মেসোপটেমিয়ায় যাইবে না।

যাঁহারা নূতন কাউন্সিলের সদস্য-পদপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহারা নাম প্রত্যাহার করিবেন। কংগ্রেসের এই উপদেশ না শুনিয়া যদি কেহ নূতন কাউন্সিলের সদস্য-পদপ্রার্থী হন, কেহ তাঁহাকে ভোট দিবেন না।

(ছ) বিদেশী জিনিস বর্জ্জন করিতে হইবে।

"যে আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা না শিখিলে কোন জাতিই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সেই আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত এই অসহযোগ-নীতির উদ্ভব। ইহার প্রথম অবস্থায় ভারতের প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ, বালক—সকলকেই ইহা শিখিবার উপযোগী সুবিধা দিতে হইবে। অতএব কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন, জামা-কাপড়ে 'স্বদেশী'-নীতি বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। এদেশে এখন যে সকল দেশী মহাজনের কাপড়ের কল আছে, তাহাতে সারা ভারতের প্রয়োজনানুরূপ কাপড় তৈয়ারী হয় না এবং শীঘ্র হইবেও না। অতএব এই কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন যে, আবার বাড়ী বাড়ী যাহাতে

চরকায় প্রচুর সূতা কাটা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উৎসাহ না পাইয়া যে লক্ষ লক্ষ তাঁতী জাতিবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে আবার বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত করিতে হইবে।"*

এই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

প্রাগুক্ত প্রস্তাবটী যে কিরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমি জানি। ইহাও জানি যে, এই প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইলে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এযাবৎ যে পন্থা অনুসৃত হইতেছিল তাহা উল্টাইয়া যাইবে।

আলোচ্য প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে নেতৃগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও ইহা আজ নূতন উত্থাপিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে বহু সভায় ইহা আলোচিত ও সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে। গত ১লা আগষ্ট হইতে মুসলমান ভ্রাতাগণ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই অসহযোগের অঙ্গ। এই দুইটী না থাকিলে সহযোগিতা-বর্জ্জনের আশা বৃথা। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, সকলে যদি এই অসহযোগ-নীতি অনুসারে কাজ করে তাহা হইলে নিশ্চিতই এক বৎসরের মধ্যে আপনারা 'স্বরাজ' লাভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এই আলোচ্য প্রস্তাবটী শুধু এই সভায় পাশ করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। ইহা প্রত্যহ একটু একটু করিয়া কাজে পরিণত করিতে হইবে। এ ছাড়া আর একটা উপায় ছিল। তাহা—তরবারি ধারণ। কিন্তু ভারতের ত তারবারি নাই; তা'যদি থাকিত তাহা হইলে, আমি বেশ জানি, ভারতবর্ষ কখনও সহযোগিতা-বর্জ্জনের এই নীতিকথা শুনিতে আসিত

* এই প্রস্তাবের পক্ষে ১৮২৬ জন ও বিপক্ষে ৮৮৪ জন ভোট দিলে ইহা কংগ্রেসে সানন্দে পরিগৃহীত হয়।

না। আমি একটা কথা আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, যদি কখনও আপনারা বলপুর্ব্বক অনিচ্ছুকের নিকট হইতে ন্যায়বিচার আদায় করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে এই প্রস্তাবে বর্ণিত আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন হইবেই। শৃঙ্খলাহীন সৈন্যদল যে কখনও যুদ্ধ জয় করিয়াছে, ইহা আমি শুনি নাই। পক্ষান্তরে আমি জানি এবং আপনারাও অবগত আছেন যে, যাহারা শেষ পর্য্যন্ত একস্থানে দাঁড়াইয়া মরিতে পারে এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকেরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকে। আমাদিগকে যদি বৃটিশ গভরমেণ্টের সহিত, ইংরাজ জাতির সহিত, অথবা ইউরোপের সমবেত রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিতেই হইবে। আমি আমার দেশের সেইরূপ অবস্থাই দেখিতে চাই। সত্য-সত্যই আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি—বুদ্ধিমত্তা হিসাবে আজই আমরা স্বরাজ পাইবার উপযুক্ত; কিন্তু জাতির জন্য আত্মত্যাগ করিতে বা নিয়মানুবর্ত্তী হইতে আমরা শিখি নাই। দেশ-বাসী জনসাধারণ যদি জাতির কল্যাণ-মন্দিরে সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি স্বরাজ আসিবেই আসিবে।

অস্পৃশ্যতা-পাপ

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর নাগপুরে 'পতিত জাতির সম্মিলনে' শ্রীযুক্ত গান্ধী সভাপতিরূপে এই মর্ম্মে বলেন,—

ভারতে হিন্দুয়ানির নামে স্পর্শদোষের দোহাই দিয়া ঘোর পাপাচার চলিতেছে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান যতদিন না হয়, ততদিন

ভারতবাসী কোনরূপ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের উপযুক্ত হইবে না। আমি হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন ও ভারতবাসীর আচার-পদ্ধতি নিবিষ্টভাবে অনুবর্ত্তন করি এবং সনাতন হিন্দুর অনুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলি। ফলে বিবেক-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রকৃত আনুষ্ঠানিক (orthodox) হিন্দু, স্পর্শদোষ না মানিয়াও নিজের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারেন। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পরস্পরে বৈবাহিক আদান-প্রদান বা একত্রে পান-ভোজন, হিন্দুত্বের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুযায়ী নিষিদ্ধ হইলেও, কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করা পাপজনক; অথচ এই পাপ হিন্দুসমাজে অবাধে চলিয়াছে। পরলোকগত মনীষী গোখলে বলিতেন যে, হিন্দুর স্বদেশে জাতভাইদের ঘৃণা করিয়া যে দারুণ পাপ অর্জ্জন করে, তাহারা প্রতিফল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য উপনিবেশে সুদে-আসলে উশুল হয়। আমি ভারতের নিগৃহীত ও নিগ্রহকারী—এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা এ যাবৎ অনুষ্ঠিত অস্পৃশ্যতা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই আত্মশুদ্ধিমূলক মহান্দোলনে—এই আত্মোন্নতির চেষ্টায়—অগ্রসর হউন; নচেৎ পরিত্রাণ নাই।

ডাক্তারি চিকিৎসা

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে টিবিব কলেজের দ্বারোদ্মোচন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী, অবৈধ যাদুবিদ্যার সংক্ষিপ্তসার মাত্র। আমার বিশ্বাস, দেশে হাঁসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই সভ্যতা বৃদ্ধির

নিদর্শন নহে। বরং ইহাতে অবনতিই সূচিত হয়। দেশে পিঁজরা-পোলের সংখ্যা বাড়িলে যেমন বুঝা যায় যে, স্থানীয় লোকেরা স্ব স্ব গৃহপালিত পশ্বাদির হিতসাধনে তেমন তৎপর নহে, ইহাও সেইরূপ। অতএব আমি আশা করি, এই কলেজ রোগ-প্রতিকার অপেক্ষা রোগ-প্রতিষেধে অধিকতর অবহিত হইবে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কাজে লাগান অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইলেও, উহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলনায় বহুগুণ মহত্তর।

আমি বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীকে অবৈধ যাদুবিদ্যা বলিয়া মনে করি; কারণ ইহা মানুষকে দেহের উপর অযথা কদর দেখাইতে এবং দেহস্থ আত্মাকে উপেক্ষা করিতে প্রলোভিত করে। আমি এই কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক বিধানসমূহ অনুসন্ধান করুন; তাহা হইলে তাঁহারা দৈহিক রোগ-প্রতিকারেও অদ্ভুত ফল পাইবেন। বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালী একান্ত ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তগতচিত্তে নামাজ করে বা গায়ত্রী জপে, তাহার রোগ কখনও না হইবারই কথা। মন পবিত্র থাকিলে দেহ পবিত্র থাকিবেই। আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, ধর্ম্ম-জীবনের মোটামুটি নিয়মগুলি পালন করিলে দেহ ও মন দুইই সুস্থ থাকে। আশাকরি এই কলেজের চেষ্টায় চিকিৎসকেরা দেহ ও মনের পুনর্মিলনে সচেষ্ট হইবেন।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান মতে রোগ-নিরূপণকালে মানব দেহের শ্রেষ্ঠতম উপাদানের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না; কাজেই কার্য্যক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত অক্ষমতা ধরা পড়ে না। এতদনুসারে লোকের দেহ রোগমুক্ত করিতে গিয়া সৃষ্টি-রহস্যের দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। মানুষ ইতর জীবের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়াছে।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই নিপীড়নের প্রধান অস্ত্র। শারীর-বিদ্যা শিক্ষার্থ জীবন্ত প্রাণীর শরীর ব্যবচ্ছেদ করা, সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর পাপ। মানুষ এখন এই নিদারুণ পাপে লিপ্ত। ভগবানের সৃষ্ট নিরীহ প্রাণিগণের উপর উৎপীড়ন করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মানুষের মরণ বরং শ্রেয়। এ জগতে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি যদি আমরা সদয় ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমাদের নিত্য-উপাসনা কালে ভগবানের নিকট দয়া প্রার্থনা করা নিরর্থক। এই কলেজটী ভারতের জনৈক খ্যাতনামা চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; অতএব ইহার ছাত্র ও শিক্ষকগণ যেন স্মরণ রাখেন যে, আমাদের শক্তি যতই সমুন্নত হউক না কেন, তাহা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গভীর গবেষণা স্পৃহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আমি এই উদ্যমের বিরোধী নহি। তবে উহা যে পথে চলিয়াছে, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। উহার উদ্দেশ্য, মানবের পার্থিব উন্নতিমূলক নিয়ম-বিধানের উদ্ভাবন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ঈদৃশ সত্য আবিষ্কারের জন্য যে অদ্ভুত উদ্যম, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেন তাহা সত্য-সত্যই প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয়, এ দেশের হেকিম বা বৈদ্যগণের মধ্যে ঐরূপ তীব্র উদ্ভাবন-স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা বিনা বিচারে মামুলি বাঁধাগৎ মানিয়া চলেন। নূতন উদ্ভাবনের চেষ্টা তাঁহাদের নাই। কাজেই এদেশী চিকিৎসা-পদ্ধতি বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। হেকিমী ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা আধুনিক গবেষণার সহিত সম্পর্কহীন হইয়া অনেকটা সুনাম হারাইয়াছেন। আশাকরি এই কলেজের চেষ্টায় তাঁহাদের সে পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া আসিবে।

সুখের বিষয় এই কলেজের পাশ্চাত্য শাখার ডাক্তারি শিক্ষারও

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ডাক্তারি, হেকিমী ও আয়ুর্ব্বেদীয়—এই ত্রিবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্বয় বিধান করিয়া প্রত্যেক পদ্ধতির দোষাংশ নিরাকৃত হইবে, এরূপ আশা কি অসঙ্গত? ভরসা করি, এই কলেজ কোনরূপ হাতুড়েগিরির—তাহা প্রাচ্য হউক বা পাশ্চাত্যই হউক—প্রশ্রয় দিবে না; প্রকৃত গুণের আদর করিবে এবং ছাত্রগণকে এই শিক্ষা দিবে যে, মোটা রকম ফি আদায় করা অপেক্ষা রোগীর কষ্ট নিবারণ করা মহত্তর।

বৃটিশ-শাসন বনাম মোগল-শাসন

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ উড়িষ্যা—কটকে এক সার্ব্বজনিক সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী ছাত্রগণকে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ফলে, সভাস্থলে যে আলোচনা হয়, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

প্রশ্ন।—অ-সহযোগ আন্দোলন যদি বিফল হয়, তাহা হইলে আমরা কি করিব?

গান্ধী।—যদিই বা এই আন্দোলন বিফল হয়, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, আপনারা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিলেই আপনাদের কর্ত্তব্য সাধিত হইবে।

প্রশ্ন।—আজ যদি আমি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে সামন্ত রাজ্যে আমার পিতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। অতএব পিতার অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলা কি আমার কর্ত্তব্য?

গান্ধী।—শ্রীরামচন্দ্র শুধু কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই চৌদ্দ বৎসরের জন্য হাসিমুখে বনে গিয়াছিলেন। পিতা দশরথের উৎকণ্ঠা তাঁহাকে

কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে, পুত্রের আচরণের জন্য কোন সামন্ত-রাজ কিরূপে তাহার পিতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। যদিই বা ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পুত্রকে সে বিপদের আশঙ্কা শিরে লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। সামন্ত-রাজ্যে এরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় স্বরাজ-লাভ।

প্রশ্ন।—ডাক্তারি-শিক্ষার্থী ছাত্রগণ কি করিবে?

গান্ধী।—এ সময়ে আমরা ভারত-মাতার স্বাস্থ্য বিধানের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিতেছি। এদেশের ত্রিশ কোটী দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অধিবাসী ঔষধ চাহে।

প্রশ্ন।—ইংরাজী শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে একতা দেখা দিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে অস্পৃশ্যতারূপ কু-সংস্কার তিরোহিত হইবে। অতএব ইহাকে কি নিছক্ মন্দ বলা যায়? তিলক, রামমোহন ও আপনি—আপনারা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নহেন?

গান্ধী। একশ্রেণীর লোকের অভিমত ঐরূপ বটে; ফলে এই প্রশ্ন আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাকে জয় করিতে পারিলে—ইংরাজদের সম্বন্ধে এবং আমাদের স্বদেশবাসিগণের সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে—তবে আমরা স্বরাজ-সমরে জয়ী হইব। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি নিছক্ মন্দ। ইহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমি সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করিতেছি। এপর্য্যন্ত যে সকল উপকার আমরা পাইয়াছি, তাহা এ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত না থাকিলেও পাইতাম। মনে করিবেন না যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির গুণে

আমরা কিছু লাভবান্ হইয়াছি। ইংরাজ যদি এদেশে না আসিতেন, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সমান পাদক্ষেপে অগ্রসর হইত। ভারতে মোগল-শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে এদেশের অনেক লোক কেবল ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ইংরাজী শিখিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে; ফলে, ইংরাজী-সাহিত্যের মূল্য বাদ দিয়া আমরা বিচার করিতে পারি না। বন্ধুবর এই প্রসঙ্গে তিলক, রামমোহন ও আমার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। আমার কথা ছাড়িয়া দিন—আমি অতি নগণ্য।

ইংরাজী শিক্ষার ছোঁয়াচ্ (Contagion) যদি না লাগিত, তাহা হইলে তিলক ও রামমোহন আরও বড় হইতেন। (করতালি) আপনাদের ফাঁকা করতালি আমি চাহি না। আপনারা স্ব-স্ব বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি দ্বারা ইহা অনুমোদন করুন। ইংরাজী-শিক্ষার প্রতি অসঙ্গত অনুরাগ প্রদর্শনের আমি বিরোধী। ইংরাজী ভাষাকে আমি ঘৃণা করি না। বর্ত্তমান গভরমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমি ইংরাজী ভাষাকে দূর করিয়া দিতে চাহি না। তবে আমার কথা এই যে, ভারতের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরাজী অধ্যয়ন করুন।

চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও নানকের তুলনায় রামমোহন ও তিলক (আমার কথা ছাড়িয়া দিন) অতি ক্ষুদ্র। দেশবাসীর উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব ছিল না। প্রথমোক্ত বিরাট পুরুষগণের সম্মুখে তিলক ও রাম-মোহন বামন মাত্র! একা শঙ্কর যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজী-শিক্ষিত সমস্ত লোক মিলিয়া তাহা করিতে পারেন না। আমি আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি। গুরুগোবিন্দ কি ইংরাজী শিখিবার ফল? ইংরাজী-শিক্ষিত এমন একজন ভারতীয়ও আছেন কি, যিনি পরাক্রমে ও আত্মত্যাগে

অদ্বিতীয়, শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, নানকের সহিত তুলনীয়? রাম-মোহন কি দলীপ সিংহের * মত আত্মত্যাগী ধর্ম্মবীর একটীও গঠন করিতে পারিয়াছেন? অবশ্য তিলক ও রামমোহনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমধিক। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, তাঁহারা যদি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত না হইয়া দেশের প্রকৃতিসুলভ শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে চৈতন্যের ন্যায় আরও মহত্তর কাজ করিতে পারিতেন। এ জাতিকে যদি গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজীর সাহায্যে হইবে না। আমি নিজে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা না জানার দরুণ যে এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছি, তাহা জানি। আপনারা বাহ্যাড়ম্বরে না ভুলিয়া শিক্ষার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করুন—ইহাই আমার অনুরোধ। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে পুরুষত্ব-হীন করিয়াছে—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। যে ভাবে এই শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাতে আমরা কাপুরুষ হইয়া পড়ি। আমরা স্বাধীনতার অরুণ-কিরণে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে চাই; কিন্তু এই দাসত্ব-বর্দ্ধক শিক্ষা-পদ্ধতিই আমাদের জাতিকে পৌরুষহীন করিয়াছে। বৃটিশ-শাসনের পূর্ব্বে আমরা এমন ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করিতাম না। মোগলের অধীনে স্বরাজ এক প্রকার আমাদের হাতেই ছিল। আকবরের সময়ে প্রতাপসিংহের অভ্যুদয় ও আওরঙ্গজেবের আমলে শিবাজীর অভ্যুত্থান সম্ভবপর হইয়াছিল। দেড়শত বৎসরের বৃটিশ-শাসনে একটা প্রতাপ বা একটী শিবাজী জন্মিতে পারিয়াছেন কি? এদেশে অনেক সামন্ত-রাজ ত আছেন; তাঁহারা সকলেই যে পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট নতজানু—যেন ক্রীতদাস। যুবকেরা যখন সামন্তরাজ-গণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন তাঁহাদের প্রতি আমার

* ইনি নান্‌কানা-সাহেব মন্দিরের হত্যাকাণ্ডে আত্মোৎসর্গ করেন।

সহানুভূতি প্রধাবিত হয়। তাঁহারা উভয়দিক হইতেই নিপীড়িত। প্রাগুক্ত ব্যবহারের জন্য আমি সামন্ত-রাজগণকে দোষ না দিয়া বিজেতা বৃটিশ-রাজকেই দোষী মনে করি; কারণ ইহার মূলে আছে সেই মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখার ভাব। অতএব আপনারা এই বিকট শিক্ষা-পদ্ধতি বর্জ্জন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। এজন্য যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, সেও ভাল। ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ।

এদেশের শাসন-ব্যাপারে আমরা কর্ত্তৃত্ব চাই। আজ যদি ইংরাজেরা এদেশ হইতে চলিয়া যান, তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করিব না। তাঁহারা ভৃত্যের মত—সমকক্ষের মত—সুহৃদের মত আমাদিগকে সাহায্য করুন; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্যের বলে আমাদেরই উপর প্রভুত্ব করিবেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। তাঁহারা এদেশ শাসনের জন্য উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, জল-বাহিনী ও স্থল-বাহিনী নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সাহায্য পাইবেন না। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আজীবন গভরমেণ্টের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিয়া বুঝিয়াছি, ইহা অচল। আপনাদের প্রদেশের বর্ত্তমান গভর্ণর ভারতবাসী হইয়াও সুরাপানের সমর্থন করিতেছেন! ইহাপেক্ষা হেয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

জাতীয় পতাকা

ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত তৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে এই মর্ম্মে লিখেন,—

পৃথিবীতে সকল জাতিরই জাতীয় পতাকা প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদের জাতীয় পতাকার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। অবশ্য ইহা এক প্রকার প্রতিমা-পূজা বটে, কিন্তু ইহা নষ্ট করাও পাপ; কারণ পতাকা জাতীয় আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। বৃটিশের জাতীয় পতাকা 'ইউনিয়ন্ জ্যাক্' দেখিলে প্রত্যেক ইংরাজের হৃদয় যে অপূর্ব্ব আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহার শক্তি অপরিমেয়। মার্কিনের তারকা খচিত ও রেখাশ্রেণী সমন্বিত জাতীয় পতাকা তদ্দেশবাসীর চক্ষে বহু মূল্যবান্। তারকা ও অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য মুসলমানগণ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন।

ভারতবাসী আমরা—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শি, এবং অন্যান্য যাহারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া জানে—আমাদের সকলের জন্য এমন একটী সাধারণ পতাকা প্রয়োজন, যাহা লইয়া আমরা বাঁচিতে বা মরিতে পারি।

মসলিপটম্ ন্যাশানাল কলেজের মিঃ পি. ভেঙ্কায়া কয়েক বৎসর যাবৎ জাতীয় পতাকা বিষয়ক একখানি পুস্তিকা সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের জাতীয় পতাকার বর্ণনা এবং ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার পরিকল্পনা আলোচিত হইয়াছে। গত চারি বৎসর

ধরিয়া মিঃ ভেঙ্কায়া কংগ্রেসের বৈঠকে জাতীয় পতাকার নক্সা যেরূপ উৎসাহ সহকারে পেশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমি তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারি না; কিন্তু তাঁহার পরিকল্পিত পতাকা দেখিয়া আমি কখনও আগ্রহান্বিত হই নাই। কারণ উহার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাহা আমাদের জাতির হৃদয় ঠিক স্পর্শ করে। সে জিনিস-টুকু নির্দ্দেশ করিলেন—জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক। তখনই আমার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হইল। জলন্ধর নিবাসী লালা হংসরাজ একদিন চরকার সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের স্বরাজ-পতাকা চরকা-চিহ্নিত হওয়া উচিত। আমি এই প্রস্তাবের মৌলিকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহার পর বেজোয়াদা কনফারেন্সের সময় আমি মিঃ ভেঙ্কায়াকে বলি যে, একখানি পতাকায় লাল (হিন্দুর রঙ) ও সবুজ (মুসলমানের রঙ) জমিনের উপর চরকার চিত্র অঙ্কিত করিলে কিরূপ দেখায়, তাহার পরিকল্পনা যেন তিনি আমাকে প্রদান করেন। তিনি সবিশেষ উৎসাহের সহিত তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐরূপ একখানি পতাকা প্রস্তুত করিয়া আমাকে দিলেন। যে সময়ে উহা পাইলাম, সে সময়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটীর বৈঠকে পতাকাটী প্রদর্শন করিবার কাল সেইমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ভালই হইয়াছিল। পরে আরও চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, আমাদের জাতীয় পতাকার জমিনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্যও স্থান রাখা দরকার। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বাদ দিয়া হইবে না; প্রত্যুত ভারতবর্ষ যাহাদের মাতৃভূমি সে সমস্ত ধর্ম্মা-বলম্বীর সম্মিলনেই উহার সার্থকতা। হিন্দু ও মুসলমান যদি পরস্পরের ধর্ম্মমত বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন, তবে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মমতও উদারতার সহিত সহ্য করিতে বাধ্য।

হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন ফলে উহাদের বা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের আশঙ্কা আদৌ নাই। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের জাতীয় পতাকার জমিন শাদা, সবুজ ও লাল এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইবে। শাদা অংশটী অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য। সংখ্যায় যাঁহারা কম তাঁহারাই প্রথমে স্থান পাইবেন, তাহার পর মুসলমানদের সবুজ রঙ, সর্ব্বশেষে হিন্দুদের লাল রঙ। উদ্দেশ্য এই যে, শক্তিশালী-দল দুর্ব্বল দলকে সতত রক্ষা করিবেন। তা'ছাড়া শাদা রঙে শান্তি ও পবিত্রতা নির্দ্দেশ করে। আমাদের জাতীয় পতাকায় কেবল শান্তি ও পবিত্রতা সূচিত হইবে; তা'ছাড়া আর কিছুই নহে। সংখ্যায় অল্প হউক বা অধিক হউক, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সমান অধিকার, ইহা বুঝাইবার জন্য পতাকার তিন অংশ সমান ভাগে বিভক্ত হইবে।

জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ কেবল চরকা লইয়াই বাঁচিতে বা মরিতে পারে। এদেশের প্রত্যেক নারী সাক্ষ্য দিবেন যে, চরকার চলন বন্ধ হওয়া অবধি ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতের নারীগণ ও জনসাধারণ চরকার আহ্বানে যেরূপ জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কখনও জাগে নাই। জনসাধারণ বুঝিয়াছে যে, ইহাতেই জীবন রক্ষা হইবে। স্ত্রীলোকেরা জানিয়াছে যে, চরকার বলে তাহাদের সতীত্ব বজায় থাকিবে। যে সব বিধবার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চরকা পাইয়া যেন তাঁহারা বহুদিনের বিস্মৃত বন্ধুকে পাইয়াছেন। এদেশে চরকা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে লক্ষ লক্ষ অভুক্ত লোকের অন্ন জুটিবে। ১৯০০ মাইল দীর্ঘ ১৫০০ মাইল বিস্তৃত এই যে সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি, ইহার অধিবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর

বাড়িয়াই চলিয়াছে। এদেশে কল-কারখানা বসাইয়া কৃষক সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য দূর করার আশা বৃথা। ভারতবর্ষ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ নহে—ইহা একটী মহাদেশ। ইংলণ্ডের মত ইহাকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা চলিবে না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যে এদেশ হইতে ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহার পথ সুদৃঢ় হস্তে রুদ্ধ করিতেই হইবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ প্রত্যহ যে সময়টা বৃথায় বিনা কাজে কাটাইয়া দেয়, সেই সময়টায় যদি তাহারা ঘরে ঘরে কাপাসের সূতা কাটে এবং বস্ত্র বয়ন করে, তবেই মুক্তির একমাত্র আশা। অতএব ভারতবাসীর নিকট চরকা জল-বায়ুর মত অপরিহার্য্য।

আর এক কথা, মুসলমানেরাও হিন্দুর মত চরকার নামে শপথ গ্রহণ করে। বস্তুত মুসলমানেরাই এখন হিন্দুদের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহে চরকা চালাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহার কারণ এই যে, মুসলমান নারীগণ পর্দ্দানবীশ; তাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া স্বামীর রোজগারের উপর দৈনিক আরও কয়েকটী পয়সা সংসারে সাহায্য করিতে পারিতেছেন। অতএব আমাদের জাতীয় জীবনে চরকার প্রবর্ত্তন একান্ত স্বাভাবিক এবং অতীব প্রয়োজনীয়। চরকার মারফতে আমরা সারা পৃথিবীকে জানাইব যে, আর আমরা অশন-বসনে পরমুখাপেক্ষী রহিব না। যাঁহারা আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবিলম্বে স্ব-স্ব গৃহে চরকা প্রবর্ত্তন করুন এবং উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একখানি জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করুন।

বলা বাহুল্য আমাদের জাতীয় পতাকা খদ্দর কাপড়ে নির্ম্মিত হইবে, কারণ মোটা কাপড়ের দ্বারাই আমরা বিদেশী-বস্ত্রের হাত হইতে মুক্ত হইব। এদেশের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের কর্ত্তারা যদি আমার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে আমি প্রস্তাব করি যে, তাঁহারা

(যেন স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক পতাকার (যেমন খেলাফৎ পতাকা প্রভৃতি বামদিকের উপর কোণে এক একটী ক্ষুদ্র জাতীয় পতাকা আঁকিয়া দেন। আমাদের জাতীয় পতাকার আয়তন এরূপ হইবে যে, তাহাতে যেন একটি পূর্ণ-পরিসরের চরকা আঁকা চলে।

ভারত-প্রবাসী ইংরাজের প্রতি—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারত-প্রবাসী প্রত্যেক ইংরাজেকে উদ্দেশ করিয়া যে খোলা চিঠি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

প্রিয় বন্ধু,

এই দ্বিতীয় বার আমি আপনাকে আমার মনের কথা জানাইতেছি। আমি জানি, আপনাদের মধ্যে অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু যদি আপনি আমার সাধুতায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমার দুইটা কাজ একটু স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবেন, ইহাই অনুরোধ।

আপনি যদি আমার সাধুতায় বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আমি আমার সাধুতার প্রমাণ দিতে অপারগ। ইংরাজ এদেশে যে শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাকে ঘৃণা করিলেও, ইংরাজকে ঘৃণা করার প্রয়োজন নাই—একথা যখন আমি বলি তখন আমার কোন কোন ভারতীয় বন্ধু উহা ভ্রান্তির প্রহেলিকা বলিয়া মনে করেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি যে, ভাইকে ঘৃণা না করিয়াও ভাইয়ের কুকর্ম্মকে ঘৃণা করা সম্ভব। যিশু খৃষ্ট স্ক্রাইব ও ফারিসীদের ক্রূরতার নিন্দা করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন না। তিনি

মানবজাতিকে ভালবাসিবার ও তাহার অন্তরস্থ পাপকে ঘৃণা করিবার কথা যে কেবল তাঁহার নিজের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; উহা কার্য্যে পরিগণিত করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বস্তুত এ নীতি শুধু যিশু খৃষ্টের একার নহে—পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই এই শিক্ষা দেখিতে পাই।

আমার ধারণা, আমি মানব-চরিত্রের বিশেষত্ব যথাযথভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং আমার নিজের দোষ-গুণেরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে পারি। অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি যে, মানুষ যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, তাহাপেক্ষা সে নিজে শ্রেষ্ঠ। আপনারা (ইংরাজেরা) সমষ্টিভাবে যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ব্যক্তিগতভাবে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি বেশ বুঝি। ১০ই এপ্রিলের ভীষণ দিনে অমৃতসরের সেই জনতার মধ্যে আমার যে সব স্বদেশবাসী ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই জনতার তুলনার ভাল লোক। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহারা প্রত্যেকেই সেখানকার নিরীহ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারদিগকে হত্যা করিতে অসম্মত হইতেন; কিন্তু জনতায় মিশিয়া অনেকেই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ঠিক এই কারণেই প্রত্যেক ইংরাজ যখন স্বপদে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তখন তাঁহার মূর্ত্তি যেরূপ, ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার মূর্ত্তি তাহা অপেক্ষা ভিন্নরূপ। সেইরূপ ভারত-প্রবাসী ইংরাজ ও বিলাতের ইংরাজ স্বতন্ত্র মানুষ। ভারত-প্রবাসী ইংরাজ যে শাসন-পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই শাসন-পদ্ধতি এত জঘন্য যে তাহা ভাষায় বর্ণন করা যায় না। আমি এই সব লক্ষ্য করি বলিয়াই, আমার পক্ষে আপনাদিগকে মন্দ মনে না করিয়া—প্রত্যেক ইংরাজের উপর অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ না করিয়া—আপনাদের প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা সম্ভব। আপনারাও যেমন কর্ম্ম-পদ্ধতির

দাস, অথবা তেমনই কর্ম্ম-পদ্ধতির দাস। সেই জন্য আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা আমাকে ঐ ভাবেই দেখুন; অর্থাৎ আমার লেখাতে যাহা প্রকাশ পায় নাই এমন কোন অসৎ উদ্দেশ্য আমার উপর আরোপ করিবেন না। যে শাসন-ব্যবস্থার ফলে মুষ্টিমেয় ইংরাজের নিকট ভারত আজ পদানত এবং যাহার ফলে আপনারা ভারতের সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান কেল্লা ও কামানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া—তবে আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছেন, সেই ব্যবস্থার সংস্কার বা সংহার করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আমার এই স্পষ্ট কথায় আপনারা আমার মনের ভাব সমুদয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা কি ভারত-প্রবাসী ইংরাজ, কি ভারতবাসী, উভয়েরই অবনতি সূচনা করিতেছে। আমাদের এই উভয় সম্প্রদায়েরই জীবন-যাত্রা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয় দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, ইহা মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচায়ক। যে শাসন-ব্যবস্থা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহা সয়তানী না হইয়া যায় না। আপনারা এদেশে দশজনের একজন হইয়া থাকুন—কিন্তু বিদেশী শোষকরূপে থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। একজন ইংরাজের জীবনের মূল্য এক হাজার ভারতবাসীর জীবনের সমান, এই মত ঘোর নৈরাশ্যের দ্যোতক; অথচ এই কথাই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই বলিয়াছিলেন।

যে শাসন-ব্যবস্থা আপনাদিগকে ও আমাদিগকে—উভয় সম্প্রদায়কেই এই হীনাবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, অনেক সময়ে আমার ইচ্ছা হয়, তাহার ধ্বংস সাধনে আমি আপনাদিগকেও আমার সহিত যোগদান করিতে আহ্বান করি। কিন্তু আবার মনে হয় এখনও আপনাদিগকে আহ্বান করিবার সময় আসে নাই; কারণ আমরা যে ঐ কার্য্যে দৃঢ়-

সঙ্কল্প—আমরা যে প্রয়োজনানুরূপ আত্মোৎসর্গ ও আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারি,—ইহার প্রমাণ এখনও নিজেরাই দিই নাই।

তথাপি আমি বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন ব্যাপারে ও মাদক-বর্জ্জন আন্দোলনে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের উপর জোর করিয়াই ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড় চালান হইয়াছে এবং ভারতের বিশ্ব-বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্পকে ইচ্ছা করিয়া নিয়মিতভাবে বিনষ্ট করা হইয়াছে। ফলে, ভারত এখন কেবল লাঙ্কাশায়ারের কৃপার উপর নির্ভরশীল নহে; পরন্তু জাপান, ফ্রান্স ও মার্কিনেরও কৃপা-ভিখারী। ভারতের পক্ষে এই অবস্থা কিরূপ শোচনীয় একবার আপনারা ভাবিয়া দেখুন। কাপড়ের জন্য প্রতি বৎসর আমরা ভারত হইতে অল্পাধিক যাট কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইতেছি। আমাদের দেশে যে তূলা জন্মে তাহা আমাদের কাপড় প্রস্তুতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এই তূলা বিদেশে পাঠাইয়া তথা হইতে কাপড় বুনাইয়া, তাহা আবার জাহাজ-ভাড়া দিয়া আনা কি বাতুলতা নহে? ভারতকে এরূপ অসহায় অবস্থায় পাতিত করা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে?

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমুদয় কাপড়ই প্রস্তুত করিতাম। আমাদের দেশের নারীরা কুটীরে বসিয়া অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর সূতা কাটিতেন; এবং এই উপায়ে তাঁহাদের ভর্ত্তার উপার্জ্জনের উপর আরও কিছু অর্থ যোগাইয়া দিতেন। পল্লীগ্রামের তাঁতীরা সেই সূত দ্বারা কাপড় বুনিত। ভারতের মত কৃষিপ্রধান বিরাট দেশে জাতীয় ধনরক্ষার পক্ষে ইহাই ছিল অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। আমাদের অবসর সময়কে কাজে লাগাইবার পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত। আজ আমাদের দেশের নারীরা সে হস্ত-কৌশল হারাইয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোক অকর্ম্মা

হইয়া বসিয়া থাকাতে দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক তন্তুবায় ঝাড়ুদারের কাজ করিতেছে—অনেকে ভাড়াটিয়া সৈনিকের বৃত্তি ধরিয়াছে। শিল্পকুশল তন্তুবায় জাতির অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গিয়াছে—বাকী অর্দ্ধেক লোক সূক্ষ্ম হস্ত-নির্ম্মিত সূতার অভাবে বিদেশী সূতার কাপড় বুনিতেছে।

বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনে ভারতের স্বার্থ কি, তাহা বোধ হয়, আপনি এইবার বুঝিতে পারিতেছেন। কাহাকেও শাস্তি দিবার জন্য ইহা পরিকল্পিত হয় নাই। আজ যদি গভরমেণ্ট খেলাফৎ ও পঞ্চনদের অন্যায়ের প্রতিকার করেন এবং ভারতকে এখনই স্বরাজ দিতে সম্মত হন, তাহা হইলেও এই বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলন নিশ্চয়ই চলিবে। স্বরাজের অর্থ অন্ততঃ এই যে, যে সকল শিল্প ভারতবাসীর আর্থিক অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে প্রাণ স্বরূপ তাহা রক্ষা করিবার এবং যে সকল বিদেশী-পণ্য আমদানি করিলে ভারতের সেই আর্থিক অস্তিত্বের হানি হয় তাহার আমদানি রদ্ করিবার ক্ষমতা লাভ। কৃষিকার্য্য ও হাতে সূতা কাটার ব্যবস্থা—জাতি-শরীরের দুইটা ফুস্-ফুস্। উহা যাহাতে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এ বিষয়ে আর অপেক্ষা করার সময় নাই। এখন কৃষির সহযোগী আর একটী বৃত্তির অভাবে সমস্ত জাতি অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। এ সময়ে আর বিদেশী পণ্যোৎপাদনকারী ও এদেশী আমদানিকারক দিগের স্বার্থ দেখিবার অবসর নাই।

ইহা সমস্ত বিদেশী-পণ্য বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন, একথা মনে করিয়া আপনারা ভ্রমে পতিত হইবেন না। ভারত আন্তর্জাতিক বাহিজ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে না। বস্ত্র ব্যতীত আর যে সব জিনিস ভারতের বাহিরে ভাল রকম প্রস্তুত হয়, তাহা বিদেশীর নিকট

হইতে লওয়া সুবিধাজনক বুঝিলেই ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। কোন জিনিসই জোর করিয়া ভারতকে লওয়ান যাইতে পারে না। যদিও আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে ইচ্ছা করি না, তথাপি আশা করি যে, অদূর ভবিষ্যতেই ভারত ইংলণ্ডের সমান অবস্থাপন্ন হইয়া তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে। তখন উভয় দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিচার করিবার সময় আসিবে। আপাতত আমি বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য চাহিতেছি।

সুরা-বর্জ্জনের আন্দোলনও ঐরূপ তুল্য-প্রয়োজনীয়। মদের দোকান-গুলি সমাজের উপর এক অসহনীয় অভিসম্পাতের মত চাপিয়া বসিয়াছে। এ বিষয়ে দেশের জনসাধারণ এখন যেরূপ সজাগ হইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। আমি স্বীকার করি, এবিষয়ে ভারতীয় মন্ত্রীরা আপনাদের অপেক্ষা অধিক সহায়তা করিতে পারেন। কিন্তু আপনারা এ বিষয়ে আপনাদের মনের কথা খোলসা ভাবে বলেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। শাসন-ব্যবস্থা যেরূপই হউক না কেন, আমি যতদূর বুঝিতেছি, দেশশুদ্ধ লোক মদ্য বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিবার জন্য সরকারের নিকট জেদ্ করিবে। আপনারা আপনাদের প্রভাব এই ক্রম-বর্দ্ধমান জাতীয় আন্দোলনের অনুকূলে নিয়োগ করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু—

এম, কে, গান্ধী।

পত্নীর প্রতি—

'এড্‌ভোকেট অব্‌ ইণ্ডিয়া'পত্রে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—

আমার সহধর্ম্মিণী সেদিন রাত্রে আমাকে বলিলেন, খদ্দর কাপড় পরিয়া রন্ধনের কাজ করিতে তাঁহার অসুবিধা হয়। মতামত সম্বন্ধে আমরা উভয়ে স্বাধীন। তথাপি আমি আমার সুর একটুও নরম করিলাম না; আমি তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরেই বলিলাম যে, আমরা এখন উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছি। এ বয়সে খদ্দর পরিয়া তিনি যদি রন্ধনাদি করিতে না পারেন, তাহা হইলে উলঙ্গ হইয়া অথবা কেবল একখানা গামছা মাত্র পরিয়া সে কার্য্য করিতে পারেন। তথাপি অপবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার রন্ধনশালায় যে তিনি প্রবেশ করিবেন, ইহা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না! আমি আমার সহধর্ম্মিণীকে যে কথা বলিয়াছি, আমার ভগ্নীদিগকেও সেইরূপ উপদেশ দিতে চাই। আপনারা [শ্রোতৃমণ্ডলী] আমার ন্যায় হৃদয় কঠিন করুন। ভারতবর্ষ এখন বিলাসের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের মুনি-ঋষিরা বলিতেন,—ভারতবর্ষ আমাদের পবিত্র কর্ম্মভূমি। যদি আপনারাও সেইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে সেই অনুযায়ী চলিতে হইবে। সে প্রথা আর কিছুই নয়—আপনাদিগকে কেবল স্বদেশী কাপড় পরিতে হইবে।

নারী কি ভোগের সামগ্রী ?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,—

কটক হইতে শ্রীমতী সরলা দেবী নাম্নী এক মহিলা আমাকে লিখিয়াছেন,—"আপনি কি স্বীকার করেন না যে, এদেশে স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ব্যবহার অস্পৃশ্যতা-দোষের মতই একটা মারাত্মক ব্যাধি? আমি যে সকল 'ন্যাশানালিষ্ট' যুবকের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের ব্যবহারই পশুর মত। ভারতে কয়জন অসহযোগী স্ত্রীজাতিকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে না করে? স্ত্রীলোকের প্রতি এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন না হইলে আত্মশুদ্ধি কি সম্ভব?"

শ্রীমতী সরলা দেবীর কথায় আমি একমত হইতে পারিলাম না। স্ত্রী-জাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার অস্পৃশ্যতা-দোষের মত মারাত্মক নহে। অসহযোগিগণ স্ত্রীলোককে কেবল ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন না? সরলা দেবীর কথা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। আতিশয্য দোষে বাক্যের গুরুত্ব নষ্ট হয়। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহ যে, স্বরাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদিগকে স্ত্রীলোকের প্রতি—স্ত্রীজাতির সতীত্বের প্রতি—বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও অধিক শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। নৈতিক বিষয়ে সহযোগী ও অসহযোগীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা একটীমাত্র স্ত্রীলোককেও ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করিব, ততদিন আমাদিগকে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেই হইবে। আমার মতে বরং সমগ্র মনুষ্য জাতি নিপাত যাউক, তথাপি যেন আমরা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী জাতিকে

ভোগের বস্তু বলিয়া মনে না করি। এ সমস্যা শুধু ভারতের সমস্যা নহে—ইহা সমগ্র মানব-জগতের সমস্যা। এই জন্তই আমি একালের ইন্দ্রিয়ভোগ-কলুষিত কৃত্রিম জীবনের বিরোধী। সেকালের সেই সরল সুপবিত্র আচরণ, জীবনে পুনঃপ্রবর্ত্তন না করিলে মানুষ ক্রমশঃ পশুর অধম হইয়া যাইবে।

আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী এবং বাল্য-বিবাহ ঘৃণা করি। একটী বাল-বিধবা দেখিলেও আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠে এবং কোন সন্ত-বিপত্নীক ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে আমার শরীর ক্রোধে কম্পান্বিত হয়। পিতামাতা যে মেয়েদিগকে অশিক্ষিত করিয়া রাখে এবং কোন ধনবান্ যুবকের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলেই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে, ইহা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হয়। এ সব সত্ত্বেও আমি নারী-সমস্যার দুরূহতা উপলব্ধি করি। স্ত্রীলোকের অধিকার পুরুষের সমান থাকা দরকার।

এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদেরও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যেন আপনাদিগকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে বিরত হন। প্রতীকার পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হাতেই অধিক। পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে হইলে স্ত্রীলোকেরা যেন পুরুষের মন হরণের জন্ত—এমন কি স্বামীর মন হরণের জন্তও—সাজ-সজ্জা না করেন। আমি কখনও কল্পনা করিতে পারি না যে, সীতাদেবী তাঁহার দৈহিক সৌষ্ঠবের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিতে এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিতেন

বকরিদে হিন্দু-মুসলমান

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বকরিদের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে এক সারবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

সকলেই জানেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা ব্যতীত এ জাতির কোন উন্নতিই হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য বন্ধন এখনও শিথিল রহিয়াছে; এখনও পরস্পরের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগরুক। এদেশের নেতৃগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে বিশ্বাস ও সাহায্য না থাকিলে ভারত কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যদিও এবিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে অধুনা অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তথাপি ইহাকে স্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। এখনও সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ স্বরাজের আবশ্যকতা হিন্দুদের মত তেমন তীব্রভাবে অনুভব করেন না। সাধারণ সভা-সমিতিতেও তাঁহারা হিন্দুদের মত তত অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হন না। এ ভাব জোর করিয়া আনা চলে না। তবে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্রেকের চেষ্টা বেশীদিন হয় নাই, তথাপি ইহা অলৌকিক ব্যাপার যে, এক বৎসর পূর্ব্বে যে মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের কার্য্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা আজ হাজারে হাজারে কংগ্রেসের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। ইহা একটা পরম লাভ।

এখনও কিন্তু অনেক কাজ বাকী। তাহা হিন্দুদিগকেই বিশেষভাবে করিতে হইবে। তাঁহারা যেখানে মুসলমান ভ্রাতাগণকে উদাসীন

দেখিবেন, সেখানে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইবেন। হিন্দুদের তরফ হইতে প্রায়ই এই অনুযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দেন না, বা স্বরাজ-ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করেন না। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—'মুসলমানদের ডাকা হইয়াছে কি?' প্রত্যেক জেলায় হিন্দুগণ মুসলমান প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রকৃত সাম্য কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে কেহ কাহাকেও অনুগৃহীত বা অনুগ্রহকারী বলিয়া মনে করিতে পারে না। মুসলমানেরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অথবা কোন কোন স্থানে সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া যেন নিজে-দের হীন মনে না করেন। যদি শিক্ষার অল্পতা থাকে ত শিক্ষালাভ করিয়া তাহা পূরণ করুন। আর সংখ্যার অল্পতা অনেক সময়ে বাধাজনক না হইয়া বরং সুবিধাজনকই হয়। আসল কথা চরিত্রবলই সর্ব্বত্র জয়লাভ করে।

যাহা হউক এখন আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বক্‌রিদ। ঐ সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিবার জন্ত যে চেষ্টা চলিবে, তাহা ব্যর্থ করিবার উপায় কি? বিহারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অধুনা অনেকটা সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দুর্ভাবনা কাটে নাই। কোন কোন জেদী ও অসহিষ্ণু হিন্দু গায়ের জোরে নিজেদের কোট বজায় রাখিতে উৎসুক। ইহারাই দুষ্টলোকের হাতে ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া পড়ে। অবশ্য গোরক্ষা প্রত্যেক হিন্দুর অতি পবিত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া আমাদের মাথা সময়ে সময়ে এমনই বিগ্‌ড়াইয়া যায় যে, আমরা ভাল করা দুরে থাক নিজেদের অজ্ঞাতসারে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া ফেলি।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ অধুনা হিন্দু প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্ত গোরক্ষা বিষয়ে যে বহুল চেষ্টা করিতেছেন, তাহার যথোচিত প্রশংসা না করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। গোরক্ষা বিষয়ে আমরা যতই বেশী জেদ্‌ করিব, ততই তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আমরা বহুবর্ষ যাবৎ গোহত্যা কাণ্ড সহ্য করিয়া আসিতেছি। কোন কোন স্থানে ইহার বিরুদ্ধে উচ্চ-বাচ্য করি নাই—কোথাও কোথাও বা ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি কোন ফলই হয় নাই। অথচ মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত সংযম প্রবৃত্তি উদ্রেকের চেষ্টা কখনও করি নাই। বরাবরই ধরিয়া লইয়াছি যে, সে চেষ্টা বৃথা।

আজ আমরা বিপদের দিনে মুসলমান ভ্রাতাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; কিন্তু এই অকপট বন্ধুত্বের বিনিময়ে কিছু লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া যেন আমরা ইহার ভাল দিক্‌টা নষ্ট করিয়া না দিই। চুক্তির দ্বারা বন্ধুতা স্থাপিত হয় না। আসল বন্ধুত্ব প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। পরের উপকার করা একটা কর্ত্তব্য—এ কর্ত্তব্য ঋণের ন্যায় শোধনীয়। কর্ত্তব্য পালন না করা পাপ। মুসলমান ভ্রাতাগণ গোরক্ষা করুন বা না করুন, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য আমাদিগকে পূরণ করিতেই হইবে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিচার ভার তাঁহাদের হাতে দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইব। আমাদের বন্ধুত্বের বিনিময়ে তাঁহাদের কি করা উচিত বা অনুচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিতে আমরা সাহস করি না। তাহা যদি করি, তাহা হইলে সে সাহায্য যেন ভাড়াটিয়া বলিয়া মনে হইবে, এবং মুসলমানগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেও তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া চলিবে না। অতএব আশা করি বক্‌রিদের দিনে মুসলমানগণ যাহাই করুন না কেন,

বিহারের তথা ভারতের হিন্দুগণ তাহা ধৈর্য্যবলে সহ্য করিবেন। মুসলমানগণ যাহা ইচ্ছা করুন—আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। মনে রাখিতে হইবে যে, হাকিম আজমল খাঁ অমৃতসরে একঘণ্টায় যাহা করিয়াছেন, হিন্দুগণ বহু বৎসরের চেষ্টা দ্বারাও তাহা করিতে পারিতেন না। গত বৎসর বকৃরিদের দিনে মিঃ চোটানি ও মিঃ ক্ষত্রি যতগুলি গাভী রক্ষা করিয়াছিলেন, তত গাভী বোম্বায়ের কোটী-পতিরা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও রক্ষা করিতে পারিতেন না। মুসলমানদের উপর যত অধিক পীড়াপীড়ি করিবেন, ততই অধিক গোহত্যা হইবে। এ বিষয়ে বরং তাঁহাদের নিজেদের উদারতা ও কর্ত্তব্যবোধের উপর নির্ভর করাই ভাল, তাহা হইলেই গোজাতির অধিক উপকার করা হইবে।

মুসলমানদের সহিত ঝগড়া করা বা মুসলমানকে হত্যা করা গোরক্ষার উপায় নহে। গোরক্ষার উপায়—গরুর বিষয় উল্লেখ মাত্র না করিয়া খেলাফতের কার্য্যে আত্ম-বলি দান করা। গোরক্ষা আত্মশুদ্ধির উপায়। ইহা একপ্রকার তপস্যা বা আত্ম-নির্ব্বেদ। যখন আমরা স্বেচ্ছায় কোন কষ্ট সহ্য করি এবং তাহার জন্য কোন পুরস্কারের আশা না রাখি, তখন সে বেদনার ক্রন্দন ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছে—তখন তিনি সাড়া দেন। আমি ইহা জোরপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, গো-রক্ষার জন্য মানুষকে হত্যা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন এই যে, প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য—গোরক্ষার জন্য—নিজেকে বলি দিবেন। এখন কথা এই যে, কয়জন হিন্দু মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্বের বিনিময়ে, লাভালাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, মুসলমানদের জন্য—মুসলমান ধর্ম্মের জন্য—প্রাণ দিতে প্রস্তুত? হিন্দুগণ যদি প্রকৃত ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে

তাঁহারা যে শুধু চির কালের জন্য মুসলমানের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিবেন তাহা নহে, পরন্তু চিরকালের জন্য মুসলমানের হাত হইতে গোরক্ষা করিতেও সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি-গণের দোহাই দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা কিছু করিতে পারিবেন না। এ যাবৎ যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান-জনসাধারণ হিন্দু-প্রতিবেশীদের মনোভাবের প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া গোহত্যা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তনের ভার ইহাঁরা লইতে পারিবেন না। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ এক মুহূর্ত্তে তাহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া করুণার্দ্র করিতে পারেন। যথেষ্ট কষ্ট সহনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, সে ডাক বৃথায় যায় না; তাহা ভগবানের সিংহাসনকেও টলাইতে পারে।

মুসলমান বন্ধুগণকে আমি একটী কথা বলি। তাঁহারা যেন অশি-ক্ষিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ধর্ম্মোন্মত্ত হিন্দু-জনসাধারণের কার্য্যে ক্রোধান্বিত না হন। ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও যিনি সংযত হইয়া চলেন, তিনিই যুদ্ধে জয়মাল্য লাভ করেন। মুসলমান ভাইদের আমি জানাইতে চাই যে, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুগণ কোন লাভজনক প্রতিদানের আশায় তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন নাই। হিন্দুগণ জানেন যে, খেলাফতের দাবী ন্যায়সঙ্গত, আর সেই ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের জন্য মুসলমানদের সাহায্য করার নাম—ভারতের সেবা; কারণ হিন্দু মুসলমান সহোদর ভাই—তাহারা একই ভারত-মাতার সন্তান।

আপনি কি মাহাত্মা ?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২৭শে অক্টোবর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধী জনৈক পত্র-লেখকের প্রেরিত কয়েকটী কঠোর প্রশ্নের উত্তর এই মর্ম্মে প্রদান করেন,—

১। আপনি কি বাস্তবিকই মাহাত্মা ?

—আমি নিজেকে মহাত্মা বলিয়া বোধ করি না; তবে জানি যে, ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে আমি দীনতম।

২। আপনি যদি মহাত্মা হন, তাহা হইলে মহাত্মা শব্দের সংজ্ঞা বলিয়া দিবেন কি ?

—আমি কোন মাহাত্মার সহিত পরিচিত নহি; সুতরাং মহাত্মার সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না।

৩। আপনি যদি মহাত্মা না হন, তাহা হইলে আপনার অনুচরগণকে কখনও জানাইয়াছেন কি, যে আপনি মহাত্মা নন্ ?

—আমি সে কথা যত বেশী বলি, শব্দটী আমার প্রতি তত বেশী প্রযুক্ত হয়।

৪। আপনার মত আত্মিক-বল (Soul-force) লাভ করা কি অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব ?

—সাধারণ লোকের আত্মিক-বল যথেষ্ট। এক সময়ে একদল ফরাসী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানান্বেষণে বাহির হইয়া যথাকালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধান পাইবেন আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাহা পাইলেন না।

অবশেষে সহসা এক পারিয়া * পরিবারে তাঁহারা জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন।

৫। আপনি বলেন, কল-কারখানাই বর্ত্তমান সভ্যতার কালস্বরূপ। তাই যদি হয়, আপনি রেলে অথবা মোটরে যাতায়াত করেন কেন?

—এ সংসারে এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যাহা আমরা এড়াইয়া চলিলেও সহসা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে পারি না। আমি এই যে পাঞ্চভৌতিক খোল্‌টার মধ্যে আবদ্ধ আছি, ইহাই যত অনিষ্টের মূল। কিন্তু ইহা জানিয়া-শুনিয়া আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে—প্রশ্রয়ও দিতে হইতেছে; এ কথা আমার প্রশ্নকর্ত্তা বন্ধু জানেন। বিগত যুদ্ধে যে সুব্যবস্থিত হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,তাহার জন্য এই কল-কারখানার যুগই যে দায়ী, তদ্বিষয়ে প্রশ্নকর্ত্তার কি কোন গুরুতর সন্দেহ আছে? বিষ-বাষ্প বা ঐরূপ অন্যান্য জঘন্য সামগ্রী আবিষ্কারের দ্বারা আমরা এক চুলও উন্নতি লাভ করি নাই।

৬। ইহা কি সত্য যে, আপনি পূর্ব্বে রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু এখন স্পেশাল ট্রেণে বা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন?

—পত্র-লেখক ঠিক সংবাদই পাইয়াছেন। 'মহাত্মা' পদবীই স্পেশাল ট্রেণের জন্য দায়ী এবং এই পাঞ্চভৌতিক দেহটাই আমার দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধঃপতনের হেতু।

৭। কাউন্ট টলষ্টয়ের সহিত আপনার সম্পর্ক কিরূপ?

—গুণমুগ্ধ ভক্তের ন্যায়। এ জীবনে আমি তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী।

---

* মান্দ্রাজের পতিত জাতি বিশেষ।

৮। আপনি স্বরাজের কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন না কেন? অন্ততঃ আপনার মতাবলম্বিগণের নিকট উহা নির্দ্দেশ করা কি আপনি কর্ত্তব্য মনে করেন না?

—প্রথমতঃ স্বরাজের সঠিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পত্র-লেখক যদি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র ফাইল খুঁজিয়া দেখেন, তাহা হইলে উহার কার্য্যোপযোগী সংজ্ঞা পাইবেন। তা'ছাড়া আর একটী সংজ্ঞা এখানে দিতেছি:—অপরের মতামত বা কার্য্যানুষ্ঠানের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজেও সেইরূপ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লাভ করার নাম স্বরাজ। অতএব স্বরাজ অর্থে ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর ভারতবাসীর নির্ব্যূঢ় কর্ত্তৃত্ব বুঝায়। উহাতে বিদেশের কোন লোক হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এবং আমরাও বৈদেশিক ব্যাপারে হাত দিব না।

৯। স্বরাজ লাভ ঘটিলে আপনার অবস্থা কি হইবে?

—আমি তখন সুদীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিব এবং সে অবকাশ সম্ভবতঃ আমার পক্ষে গৌরবেরই হইবে।

১০। স্বরাজ অর্জ্জিত হইলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বার্থ কিরূপে রক্ষিত হইবে?

—তজ্জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না; কারণ তখন ভারতীয়মাত্রেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম জন্মিবে। ফলে, তাঁহারা পরস্পরে বিশ্বাসবান্ হইবেন।

১১। আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ৩১শে অক্টোবর তারিখে, অথবা অন্য যে কোন দিন আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন সেই দিনে, গভরমেণ্ট পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন?

—গভরমেণ্ট একটী কার্য্য-প্রণালীর প্রতীক মাত্র। ভারতের হিন্দু,

মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদি সকলে যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৩১শে অক্টোবরের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান গভরমেণ্ট বিলুপ্ত হইতে পারে। আমি এখনও আশা করি, তাঁহারা এ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইহার ধ্বংস সাধন করিবেন। তবে যে সকল ইংরাজ ভারতের বিশ্বস্ত সেবকরূপে এদেশে অবস্থান করিতে চান, তাঁহাদের একজনকেও চলিয়া যাইতে হইবে না।

১২। আপনি কি মনে করেন না যে, গভরমেণ্ট দুর্ব্বলতাবশতঃ আপনার মত প্রচার দমন করিতে পারিতেছেন না?

—নিশ্চয়ই মনে করি। গভরমেণ্ট দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

১৩। ভগবান না করুন আপনার পুত্র যদি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত না হইয়া নরহত্যার জন্য অভিযুক্ত হন, তাহা হইলেও কি আপনি আদালতে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা করিবেন না?

—আমার বিশ্বাস, আমি তাহা না করিয়াই পারিব। বস্তুতঃ আমি অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছি। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বেষের ফলে অন্ধ্র-দেশে আমার এক বন্ধুর বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মামলা দাঁড় করান হইয়াছে। আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছি যে, তাবৎ বহুমূল্য সম্পত্তিও যদি তাঁহাকে হারাইতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি যেন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন না করেন।

১৪। ধরুন, যদি কোন লোক আপনার পুত্রকে ঠকাইয়া কিছু টাকা লইয়া গা-ঢাকা দেয়, তাহা হইলে আপনার পুত্রের কি করা কর্ত্তব্য?

—আমার পুত্র যদি প্রকৃত অসহযোগী হয়, তাহা হইলে চোরকে টাকা ছাড়িয়া দিবে। নয় মাস পুর্ব্বে মৌলানা সওকৎ আলির ছয় শত টাকা চুরি যায়। কে উহা লইয়াছিল তিনি জানিতেন; তথাপি তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই।

১৫। আপনার প্রবর্ত্তিত সত্যগ্রহের ফল পঞ্জাবে কিরূপ হইয়াছিল?

—স্যার মাইকেল ও'ডায়ার সত্যগ্রহের বার্ত্তা পঞ্জাবে পৌছিতে দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহাতে কতক পঞ্জাবী উত্তেজিত হয়—কয়েক জন উন্মত্ত হইয়া উঠে। স্যার মাইকেল ও'ডায়ার তাহাদের অপেক্ষা অধিক উন্মত্ত হন এবং তাঁহার সহকারীদের দ্বারা বহু নিরপরাধ লোককে হত্যা করান। কিন্তু সত্যগ্রহ এমনই শক্তিশালী মহৌষধ যে, পঞ্জাব আজ ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশের ন্যায় উৎসাহশীল। তত্রত্য অধিবাসিগণের স্বভাবসুলভ চপলতা সত্ত্বেও পঞ্জাব যে আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছে, তাহা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণীয়।

১৬। আপনি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন যে, অসহযোগ আন্দোলন অনুগ্র থাকিতে পারে?

—নিশ্চয়ই পারে। সিন্ধু, কর্ণাটক ও পূর্ব্ববঙ্গে গ্রেপ্তার উপলক্ষে জনসাধারণ যে অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৭। হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা এবং হিন্দুদের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন করার ফল ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের উপর কিরূপ?

—উহাতে হিন্দুদের ধৈর্য্যের কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন মুসলমানই মোপলাদের উন্মত্ততা সমর্থন করেন না।

১৮। মালাবারে হিন্দু-মুসলমানের একতা-ভঙ্গের প্রকৃত কারণ কি?

—সেখানে যে আজ নূতন একতা-ভঙ্গ ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। মোপলারা কোন কালেই হিন্দুদিগকে নিজের ভাইর মত মনে করে নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পঞ্জাব-হাঙ্গামার মত বর্ত্তমান হাঙ্গামার হেতু এই

যে, যে সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ উহার গতিরোধ করেন সে সময়ে হাঙ্গামাকারীদের নিকট অসহযোগের বার্ত্তা অতি অসম্পূর্ণভাবেই পৌঁছিয়াছিল। মোপলারা কোন কালেই মালাবারের হিন্দুদের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিল না। তাহারা এই ঘটনার পূর্ব্বেও হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। ইসলাম সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা অতি সঙ্কীর্ণ। গভর্মেণ্ট তাহাদিগকে ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন এবং হিন্দু-মুসলমানেরা তাহাদিগকে এ যাবৎ অবহেলা করিয়াছেন। তাহাদের প্রকৃতি উগ্র, তাহারা সাহসী, কিন্তু অজ্ঞ। ফলে, খেলাফতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অতিশয় নিষ্ঠুর বর্ব্বরোচিত অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে। মোপলাদের আচরণ দেখিয়া সেই হিসাবে ইসলাম অথবা ভারতের অবশিষ্টাংশের মুসলমানদিগকে বিচার করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।

১৯। আপনি পঞ্জাব-অত্যাচারের সহিত খেলাফৎকে জুড়িয়া দিলেন কেন, বলিতে পারেন কি?

—পঞ্জাব-অত্যাচারের পূর্ব্বে খেলাফৎ-অত্যাচারের জন্ম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সমর-কন্‌ফারেন্সে আমি উহাকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করি। (বড়লাটের নিকট লিখিত আমার খোলা-চিঠি দেখুন।) পঞ্জাবের অত্যাচার কোন বিশিষ্ট আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরে অসহযোগের কল্পনা করা হয়। পরে যখন দেখা গেল যে, খেলাফতের ন্যায় পঞ্জাবের জন্যও তীব্র প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তখন উহা খেলাফতের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়।

২০। খেলাফতের জন্য অন্যান্য মুসলমান-রাজ্যের অধিবাসিগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; অথচ ভারতের মুসলমানগণ ঐজন্য এতটা উতলা কেন, বলিতে পারেন কি?

—খেলাফৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মুসলমানগণ আদৌ উদ্বিগ্ন নহেন, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার মতে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় মুসলমানেরাই অধিকতর ধর্ম্মপ্রাণ।

২১। মুসলমান তীর্থস্থানসমূহ রক্ষা করিতে অপারগ হওয়ার পরেও কি তুর্কীর সুলতান আর খলিফা বলিয়া বিবেচিত হইবার দাবী করিতে পারেন ?

—হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যদি উত্তর দেওয়া সঙ্গত হয় ত বলি,—খেলাফতের উপর তুর্কীর দাবী এই যে, তাঁহারা বহুবর্ষ যাবৎ প্রভূত পরাক্রমে উহা রক্ষা করিয়াছেন। সুলতান এখন উহা রক্ষা করিতে অপারগ হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তুর্কীরা অপারগ হয় নাই। খেলাফত-আন্দোলন কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হয় নাই—একটী আদর্শই উহার কেন্দ্র। সেই আদর্শ একাধারে ঐহিক, পরমার্থিক ও রাজনৈতিক। তুর্কীরা যদি খেলাফৎ রক্ষায় অপারগ হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ যদি নিজেদের অভিমতগত এবং কার্য্যগত সহানুভূতির শক্তি লইয়া তাহাদের পার্শ্বে না দাঁড়ায়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই এমন প্রভূত ক্ষতি হইবে যে, তাহা আর কিছুতেই পূরণ করা যাইবে না। এরূপ ঘটনা পৃথিবীর পক্ষে ঘোর বিপত্তির কারণ হইবে; কারণ আমার বিশ্বাস, খৃষ্টধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইস্‌লামেরও এ জগতে একটা নিজস্ব স্থান আছে। এই বিপদকালে তুর্কীকে সাহায্য করা বীরোচিত কর্ত্তব্য।

২২। বাজারে ভাল জিনিস সস্তায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাই ক্রয় করা উচিত—অর্থনীতির এই বিধান কি ভুল ?

—একালের অর্থনীতি-বিশারদগণ যে সকল নিয়ম, নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম। আমরা সর্ব্বদাই যে এরূপ নীচ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হই, তাহা নহে। ইংরাজেরা নিজেদের কয়লা-খনিতে ইটালির সুলভ-মজুর নিয়োগ না করিয়া অধিক বেতনে ইংরাজ-মজুরদিগকে কাজ দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে সুলভ-মজুর আমদানির প্রয়াস পাইলে বিপ্লব ঘটিবে। অল্প বেতনে বিশ্বাসী লোক এখন পাইতেছি বলিয়া অধিক বেতনের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করা পাপ। যে অর্থনীতিতে মানবের নৈতিকবৃত্তি ও সুকুমার মনোবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা ঠিক মোমের পুতুলের মত—দেখিতে জীবিতের ন্যায়, কিন্তু তাহার প্রাণ নাই। যখনই সঙ্কটকাল আসিয়াছে, তখনই এরূপ নবকল্পিত বিধান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে জাতি বা যে ব্যক্তি এ বিধানের আশ্রয় লইবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। যে মুসলমান আপন ধর্ম্মানুসারে প্রস্তুত খাদ্যের জন্য অধিক মূল্য প্রদান করেন, অথবা যে হিন্দু আচার-অনুযায়ী পবিত্র না হইলে খাদ্য গ্রহণে অসম্মত হন, তাঁহাদের ত্যাগ-স্বীকারে একটা মহিমা আছে। ইংলণ্ড ও জাপানের সুলভ বস্ত্র ক্রয় করিয়া আমাদের ক্ষতিই হইয়াছে। আমাদের প্রতিবেশীরা নিজের কুটীরে যে বস্ত্র উৎপাদন করে, তাহা ক্রয় করিতে যে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, ইহা আমরা যে দিন বুঝিব, সেই দিন হইতেই আমাদের নবজীবন আরম্ভ হইবে।

২৩। পিকেটিং* কি অনুগ্র?

—অধিকাংশ স্থলেই ইহাতে বলপ্রয়োগ করা হয় না। পিকেটিঙে বলপ্রয়োগ করা অতি সহজ; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্ব্বত্রই অসীম আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছে।

---

* নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পাহারা।

২৪। এ সময়ে এদেশের বহু লোকই অর্দ্ধ-নগ্ন; সুতরাং তাহারা আগামী শীতের চিন্তায় কম্পমান। আপনি যে এখন বস্ত্ররাশি পোড়াইয়া ফেলিতেছেন, ইহার সার্থকতা কি?

—সার্থকতা অবশ্যই আছে। আমরা যেমন স্বগৃহে নির্ম্মিত খাদ্য গ্রহণ করি, সেইরূপ স্বগৃহে নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করাও ভারতীয় জীবনের মৌলিক নিয়ম। এই নিয়মের অবমাননাই ভারতবাসীর অর্দ্ধ-নগ্নতার হেতু, ইহা আমি জানি। পরিত্যক্ত বিদেশী-বস্ত্র যদি তাহাদিগকে পরিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের যাতনা দীর্ঘস্থায়ী হইবে। কিন্তু এই বস্ত্র-দহনজনিত তাপ আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিবে এবং এদেশে বিদেশী-বস্ত্রের শেষ টুকরাটুকু দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যদি এই বহ্ন্যুৎসব বজায় রাখিতে পারি, তাহা হইলে সে তাপ চিরকাল অক্ষুন্ন থাকিবে এবং উত্তরোত্তর প্রতি শীতেই আমরা এ জাতিকে অধিকতর তেজস্বী দেখিব।

মৃত্যু-ভয়

১৯২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'নবজীবন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটী ভাষায় এই মর্ম্মে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,—

আমি 'স্বরাজে'র নানা প্রকার সংজ্ঞা সংগ্রহ করিতেছি। তাহার মধ্যে একটী এই,—মৃত্যু-ভয় জয় করার নামই 'স্বরাজ'। যে জাতি মরণের ভয়ে ভীত, সে কখনও 'স্বরাজ' লাভ করিতে পারে না। যদিই বা কোন প্রকারে লাভ করে, তাহা রক্ষা করিতে পারে না।

ইংরাজেরা প্রাণ হাতের মুঠায় করিয়া চলে। আরব ও পাঠানেরা মৃত্যুকে সামান্য পীড়া অপেক্ষা গুরুতর মনে করে না। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তাহারা চোখের জল ফেলে না। বুয়র রমণীদের এ ভয় আদৌ নাই। বুয়র যুদ্ধে হাজার হাজার বুয়র রমণী পতিহীনা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। পতি-পুত্রের মরণে তাহাদের কিছু আসে যায় নাই—দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহাই যথেষ্ট। দেশ স্বাধীনতা হারাইলে স্বামী লইয়া লাভ কি? সন্তানকে দাসরূপে লালন-পালন করা অপেক্ষা তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া তাহার অমর-স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। বুয়র রমণীগণ এই ভাবে মনকে দৃঢ় করিয়া নিজেদের প্রিয়তম পতিপুত্রগণকে সানন্দে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিয়াছিল।

উপরে যাহাদের কথা বলিলাম, তাহারা অপরকে মারে এবং নিজেরাও মরে। কিন্তু যাহারা কাহাকেও মারিতে চাহে না—অথচ নিজেরা মরিতে প্রস্তুত হয়, তাহারা জগতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাহারাই পৃথিবীর ভূষণ।

ইংরাজ ও জর্ম্মণেরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে এবং হতও হইয়াছে। ফলে তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষের জ্বালা বাড়িয়াছে—অশান্তির অন্ত নাই। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। তাহাদের প্রতারণা-প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে—প্রত্যেকেই অপরকে ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চায়।

আমরা কিন্তু যে নির্ভীকতার সাধনা করিতেছি, তাহা আরও মহৎ—আরও পবিত্র। সুতরাং আমরা অত্যল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক জয়লাভের আশা করি।

স্বরাজ পাইবার পূর্ব্বেই আমাদের অনেককে মৃত্যুভয় বিরহিত হইতে

হইবে; নতুবা আমরা স্বরাজ পাইব না। 'এ পর্য্যন্ত এ সাধনায় তরুণ বয়স্ক বালকেরাই প্রাণ দিয়াছে। আলিগড়ে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও বয়স একুশ বর্ষের অধিক নহে। কেহ তাহাদের পরিচয়ও জানিত না। গভরমেণ্ট যদি আজ গুলি চালাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আশাকরি নেতাদের মধ্যে কয়েকজন আত্মাহুতি-দানের সুযোগ পাইবেন।

বালক, যুবক বা বৃদ্ধের মৃত্যুতে আমরা এত বিচলিত হই কেন? এই পৃথিবীতে প্রতি মূহূর্ত্তেই কত জন্মিতেছে কত মরিতেছে। কাহারও জন্মে হর্ষ প্রকাশ করা বা মৃত্যুতে বিলাপ করা যে নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র, ইহা আমাদের অনুভব করা উচিত। আত্মার অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাসবান্, তাঁহারা জানেন যে আত্মা অবিনাশী। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, কে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন? মৃত বা জীবিত সকলেরই আত্মা এক। জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন লীলা অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। ইহাতে উৎফুল্ল বা অভিভূত হইবার কিছুই নাই। আমরা যদি শুধু নিজের দেশটীকেই আপন পরিবার বলিয়া মনে করি, এবং এদেশে যতলোক জন্মিতেছে তাহারা যেন আমাদের পরিবারভুক্ত এইরূপ ধারণা করি, তাহা হইলে তাহাদের সকলের জন্য কি জন্মোৎসব করা সম্ভব হয়? পক্ষান্তরে এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে যদি আমরা কাঁদি, তাহা হইলে আমাদের চোখের জল কখনও শুকাইবে না। এইরূপ বিচার দ্বারা মৃত্যুভয় জয় করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ বলিয়া খ্যাত; এ প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিতে আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি না। তথাপি মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে আমরা যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ি, এমন আর কোন

জাতিই হয় না। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে আবার হিন্দুরাই বোধহয় মৃত্যুকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হয়। সংসারে একটীমাত্র নবশিশু জন্মিলে আমরা আনন্দে এতই আত্মহারা হই যে, তাহা দেখিয়া হাসি পায়। পক্ষান্তরে একটীমাত্র লোকের মৃত্যুতেই আমাদের বিলাপের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় যে, প্রতিবেশিগণ বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য হন। স্বরাজ পাইতে হইলে এবং তাহা পাইয়া সগৌরবে রক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে এই বিসদৃশ আতঙ্ক সর্ব্বদা পরিহার করিতে হইবে।

মৃত্যু-ভয় বিরহিত ব্যক্তির পক্ষে কারাবাসের ভয় কত তুচ্ছ! এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরাজ পাইতে যদি আমাদের বিলম্ব ঘটে, তবে তাহার হেতু এই,—অবিচলিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতে বা তদপেক্ষা অল্পতর অসুবিধা সহ্য করিতে না পারা।

উত্তোরোত্তর যত অধিক সংখ্যক নিরপরাধ লোক মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে, ততই তাহাদের আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে অপর সকলের মুক্তির পথ সহজ হইয়া আসিবে এবং কষ্টের মাত্রা ততই কম হইবে। যে কোন কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারিলেই তাহা অক্ষয় আনন্দে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিপদ দেখিয়া দূরে পলাইতে চায়, তাহাকে প্রকৃত বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই অসীম কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এবং বিপদ আসিলে সে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি সর্ব্ব-প্রকার ঘটনাকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকেন, তাঁহাকে কোন কষ্টই অভিভূত করিতে পারে না—তাঁহার প্রফুল্লতাই সর্ব্বদুঃখনাশক মহৌষধি।

এই বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরও সম্মুখীন হইতে হইবে। এই জন্যই এ বিষয়ের অবতারণা। পূর্ব্ব

হইতে প্রস্তুত থাকিলে অনেক সময়ে বিপদ এড়াইতে পারা যায়। আমাদের বেলাও সেরূপ ঘটিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'স্বদেশী'-সাধনাই মনকে এইভাবে প্রস্তুত করিবার এক উপায়। 'স্বদেশী'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে গভরমেণ্ট বা অপর কেহ আমাদিগকে আর কোনরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করিবেন না।

বীর পুরুষেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এই অহিংস-সমরে গোঁয়ার-গোবিন্দের স্থান নাই। আমরা কোন নীতি-বিগর্হিত কাজ করিয়া জেলে যাইতে বা মরিতে চাহি না। বর্ত্তমান গভরমেণ্টের দমন-নীতিমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদিগকে ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করিতে হইবে।

রক্তপাত কি অনিবার্য্য?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে এক অনুবন্ধ প্রকাশ করেন,—

জনৈক পত্রপ্রেরক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"আপনি কি ইহা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন না যে, বিনা রক্তপাতে স্বরাজলাভ অসম্ভব? বর্ত্তমানের এই নিরুপদ্রব আন্দোলন কি পরিণামে রক্তারক্তি ও রাজদ্রোহের জন্য সকলকে সম্মিলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার একটা কালোচিত উপায় মাত্র নয়?"

এ প্রশ্নটা খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, কেহ কেহ বর্ত্তমান আন্দোলনের অকপটতা সম্বন্ধে, এখনও

সন্দিহান। বর্ত্তমানের নিরুপদ্রবতা যদি ভবিষ্যৎ অশান্তির আয়োজন মাত্র হইত, তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহা প্রকাশ্যে না বলার কোন হেতুই নাই। আমি যখন গভরমেণ্টের আইনবিরুদ্ধ অনেক কাজই এযাবৎ করিয়াছি, তখন একথা বলিতে আর বাধা কি যে, বর্ত্তমান আন্দোলন বল প্রকাশের উদ্যোগ মাত্র ?

বস্তুতঃ আমিই যে কেবল নিরুপদ্রব-রাজদ্রোহ সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে করি তাহা নহে; আমার মত আরও অনেকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, বিনা রক্তপাতেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে।

আলি-ভ্রাতৃদ্বয় মুখে যাহা বলেন, মনে তাহা বিশ্বাস করেন, এবং মনে যাহা বিশ্বাস করেন মুখেও ঠিক তাহাই বলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অবস্থা বিশেষে বাহুবলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহারাও মনে করেন যে, ভারতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বল প্রয়োগের সমর্থন করা যায় না।

আমাদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলার ভাব বদ্ধমূল হইলে ত্রিশকোটী ভারতবাসী এদেশের একলক্ষ ইংরাজের প্রতি বলপ্রয়োগ করা কাপুরুষতার ও অগৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিবে। আমাদের মধ্যে যে এখনও নিষ্ফল রোষ-বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে তাহার হেতু এই যে আমরা প্রতিপক্ষের প্রবঞ্চনা ও ভয়-প্রদর্শনের সম্মুখীন হইয়া সু-সংবদ্ধ ভাবে চিন্তা করিতে পারি না—আমাদের হৃদয়ে স্থৈর্য্য নাই—ঔদার্য্যেরও একান্ত অভাব। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, নিরুপদ্রব-নীতি অবলম্বন করিয়াই আমরা সিদ্ধ-মনোরথ হইব; এবং বাহুবল প্রয়োগ করিলে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। এই জন্যই বলিয়াছি যে, ভারতবাসী বাহুবলের পক্ষপাতী হইলে আমি হিমালয়ে আশ্রয় লইব।

স্বাধীনতা

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধী স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই মর্ম্মে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,—

কংগ্রেসের বিগত বৈঠকে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করাইবার জন্য মৌলানা হজরত মোহানি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। তাহার পর মোসলেম-লিগের বৈঠকে ঐ প্রস্তাব যাহাতে পরিগৃহীত হয়, তজ্জন্য তিনি উহার প্রেসিডেণ্টরূপেও কম চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। মৌলানা সাহেবের মন্তব্য কি, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। তিনি বৃটিশের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চান—এমন কি বৃটিশের সমান অধিকার-ভোগী সরিকরূপেও কোন সম্বন্ধ রাখিতে তিনি নারাজ। তাঁহার মতে খেলাফৎ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলেও, বৃটিশের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত নহে। অবশ্য এরূপ জেদ্ করা কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলে খেলাফৎ-সমস্যার সমাধান হইবেই না। এক্ষেত্রে আমরা শুধু মতবাদ (theory) লইয়া আলোচনা করিতেছি। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলে খেলাফৎ-সমস্যার সমাধান হওয়া যদি অসম্ভব হয়, অর্থাৎ বৃটিশ জনসাধারণ যদি ইসলাম-জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বরাবরই বিরূপ থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য জেদ্ করা ছাড়া আর উপায় কি? বৃটিশ জনসাধারণকে যদি ইসলাম-জগতের প্রতি সখ্যতানুকূল করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে ভারতবাসী যে বৃটিশের পক্ষভুক্ত হইয়া ইসলামের অনিষ্ট সাধনে নৈতিক সমর্থন করিবে, ইহা হইতে পারে না। তাহাপেক্ষা বৃটিশের সংস্রব ত্যাগ করাই ভাল।

কিন্তু যদি ইসলামের প্রতি গ্রেট বৃটেনের বর্ত্তমান ভাব পরিবর্ত্তিত হয় (আমি জানি ভারতবাসী শক্তিসম্পন্ন হইলে বৃটেনের এভাব বদ্‌লাইবে ; তাহা হইলে আমাদের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য জেদ্‌ করা ধর্ম্মতঃ অন্যায় হইবে। কারণ তাহাতে আমাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও অস্থির-চিত্ততা প্রমাণিত হইবে। খেলাফৎ-সমস্যার সমাধান সত্ত্বেও যদি আমরা বৃটিশের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভগবানকে অস্বীকার করা হইবে। অর্থাৎ তখন আমাদিগকে ইহা মনে করিয়া লইতে হইবে যে, বৃটিশ জনসাধারণ যেন মানুষের অন্তরস্থ ভগবানের ডাকেও সাড়া দিতে অপারগ। ভগবদ্‌-বিশ্বাসী হিন্দু, কি মুসলমান কেহই এভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না।

ইংরাজদিগকে আমাদের ঘোর শত্রু মনে করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব এদেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা, আমরা যদি তাঁহাদিগকে সকল জাতির সমবায়ে গঠিত নবীন প্রজাতন্ত্রের সরিক্‌ ও সুহৃদ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে তাহা শ্রেষ্ঠতম গৌরবের বিষয় হইবে।

এখন দেখা যাউক, বৃটিশ-সম্পর্ক বজায় রাখিয়া ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বলিলে কি বুঝায়। অবশ্য ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবে, এরূপ অর্থও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। অতএব বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে বিনামূল্যে স্বরাজ দান করিবেন, এরূপ নহে। পরন্তু ভারতবাসীর সম্পূর্ণ আত্ম-বিকাশ ঘোষণার নাম স্বরাজ। এ ঘোষণা অবশ্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের আইন-বলে পাকা হইবে, কিন্তু তাহা পার্লামেণ্টের পক্ষে ভারতের জনসাধারণের অদম্য বাসনা ভদ্রভাবে মঞ্জুর করা ছাড়া আর কিছুই নহে। দক্ষিণ আফ্রিকার

ইউনিয়ন্ গভরমেণ্টের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে সময়ে ইউনিয়ন্ গভরমেণ্ট যে সকল প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, তাহার এক বর্ণও কমন্স সভা রদ্-বদল করিতে পারেন নাই। আমাদের দাবী মঞ্জুর করার অর্থ এই যে, বৃটেনের সহিত আমাদের একটা সন্ধি স্থাপিত হইবে।

এরূপ স্বরাজ আমরা এ বৎসর নাও পাইতে পারি—হয়ত আমাদের জীবন-কালেও আসিতে না পারে। কিন্তু আমি যে স্বরাজ চাই, তাহা ইহাপেক্ষা একচুলও কম নহে। মিট্‌মাটের সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের জনসাধারণের দাবী মঞ্জুর করিবেন। কিন্তু সে দাবী আমলা-তন্ত্রের মুখে প্রকাশিত দাবী নহে; দেশের জনসাধারণ যে দাবী জানাই-বেন, তাহাই পূরণ করিতে হইবে।

পৃথিবীতে কোন জাতি অপর জাতিকে বিনামূল্যে স্বরাজ দিতে পারে না। এ অমূল্য রত্ন জাতির হৃদয়ের শোণিত-ধারা ঢালিয়া ক্রয় করিতে হয়। আমরা যদি উহার জন্য উচিত মূল্যেরও অধিক দাম দিই, তাহা হইলে আর জাতিবিশেষের দান বলিয়া উহা গণ্য হইবে না। বড়লাট * বলিয়াছেন যে, স্বরাজ হয় অস্ত্রবলে অর্জ্জিত হইতে পারে, নয়ত তাহা পার্লামেণ্টের দানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বড়লাটের এ উক্তি অভ্রান্ত নহে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ আমাদের আত্মনিগ্রহের নৈতিক প্রভাবে সাড়া দিতে অসমর্থ, এই ধারণা শ্রোতৃগণের মনে উৎপাদন করিয়া বড়লাট তাঁহার দেশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি যদি শ্রোতৃবৃন্দকে এইরূপ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক না কেন, পার্লামেণ্ট যেদিন

---

* লর্ড রেডিং

ইচ্ছা করিবেন সেই দিনই এদেশকে স্বরাজ দিবেন, তাহা হইলে তিনি শ্রোতৃগণকে বোকা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বলিতে হইবে। বস্তুতঃ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলে—অপরিমিত আত্মনিগ্রহ ভোগ করিলে—তবে আমরা তাহার ফল স্বরূপ স্বরাজ লাভ করিব।

বড়লাট বাহাদুর অস্ত্রবলের পরিবর্ত্তে অন্য কোন শক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে অভ্যস্ত নহেন। সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় বিচার-বিতর্কের জোরে আমরা একদিন বৃটিশ পার্লামেণ্টকে স্বরাজ দানের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া দিতে পারিব। বড়লাট শীঘ্রই জানিবেন যে, অস্ত্রবল অপেক্ষাও মহত্তর শক্তি আমাদের হাতে আছে; তাহার নাম—শিষ্ট-অবাধ্যতা (Civil Disobedience) উত্তরোত্তর আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, স্বাধিকার লাভের পূর্ব্বে ভারতবাসীকে শিষ্ট-অবাধ্যতার নামে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতেই হইবে। এখনও আমরা স্বাধিকার লাভের উপযুক্ত হই নাই। এখনও হিন্দু, মুসলমান পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব বর্ত্তমান। হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা এখনও উচ্চ-বর্ণের স্পর্শ-পুলক অনুভব করে নাই। পার্শিগণ ও দেশীয় খৃষ্টানেরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বরাজ লাভ হইলে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। আমরা এখনও নিজেদের রচিত আইন-কানুন মানিতে অভ্যস্ত হই নাই এবং তাহার উপযোগিতাও উপলব্ধি করি নাই। আমাদের গৃহে গৃহে চরকা এখনও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। খদ্দর-বাস এখনও আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। মোট-কথা, আমরা এখনও আত্ম-রক্ষার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

এখনও এক শ্রেণীর লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, বল প্রয়োগ ব্যতীত স্বরাজ লাভের আশা বৃথা। সুখের বিষয়, এই

মতবাদীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু তাঁহাদিগকেও উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা বলেন যে, অনুগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রতাকেও প্রশ্রয় দিতে হইবে অর্থাৎ শেষে উগ্রমূর্ত্তি ধারণের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে এখন অনুগ্রতা অবলম্বন করাই ভাল। এই মতের লোকেরা বুঝেন না যে, তাঁহারা বিশ্বের দরবারে প্রবঞ্চনার জন্য দায়ী। বস্তুতঃ আমাদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, আমাদের শেষ-সঙ্কল্প সত্বর লাভের জন্য অনুগ্রতা-নীতিই ফলোপধায়ক হইবে, ইহা আমরা সত্য-সত্যই বিশ্বাস করি। যে মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে কাহারও মনে এই ধারণা জন্মিবে যে, অনুগ্রতা-বলে বা বল প্রয়োগ না করিয়া স্বরাজ লাভ সম্ভব নহে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি প্রতিজ্ঞা নাকচ্ করিতে বাধ্য। মনে-প্রাণে বিশ্বাসবান্ হইয়া অনুগ্রতা-নীতি পালন করিতে হইবে। এই নীতি উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী কি না তাহার পরীক্ষা এখন চলিতেছে। এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ যে কেবল নিজেরাই অনুগ্র রহিবেন বা ঐ নীতিতে বিশ্বাসবান্ থাকিবেন তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহারা অপরকেও অনুগ্রতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি দিবেন এবং যাহারা উগ্রতা অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিন্দা করিবেন। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমাদের চরম লক্ষ্য এখনও পূর্ণ না হইবার হেতু এই যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের মূলমন্ত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ অনুগ্রতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই ; এমন কি চিন্তায় ও সঙ্কল্পে অনুগ্র হইতে চেষ্টাও করেন নাই।

মহাত্মা গান্ধীর

হস্তাক্ষর

Bombay
25th Dec '21

My dear friend,

I congratulate
you on your letter
to the Union.

Yours sincerely
M K Gandhi

শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশ এম্‌-এ মহাশয়ের সৌজন্যে সংগৃহীত

মহাত্মার

জন্ম-পত্রিকা

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী "বঙ্গবাসী" পত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্ম-পত্রিকা এইরূপ প্রকাশিত হয়,—

শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১২৭৬ সালের ১৭ই আশ্বিন (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর) শনিবার প্রাতঃ ৩ দণ্ড ১২ পল সময়ে পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী, নবাংশকুণ্ডলী, গ্রহস্ফুট এবং ভৃগু-সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইল,—

লং—৬।৬।৫।১	বৃ—০।২৮।৪২।১৩
র—৫।১৬।৩৯।১০	শু—৬।২৪।৩০।১
চ—৪।০।২০।৫	শ—৭।২০।১৯।৮
ম—৬।২৬।৪৪।১২	রা—৩।১২।১৫।২২
বু—৬।১০।২৭।৪০	কে—৯।১২।১৫।২০

জন্মকুণ্ডলী

	বৃ	
রা		কে
চ ১০ র ১২	লং শু বু ম	শ

নবাংশকুণ্ডলী

[illegible]	চ কে	
		বু শ
	রা	বৃ

ভৃগুরুবাচ।

বৈশ্যবংশে সমদ্ভুতো দেশে বৈ গুর্জ্জরান্বিতে ·
পিতা পিতামহশ্চাথ চান্যৈশ্চ পূর্ব্বজৈরপি ॥
রাজমানী যশস্বী চ রাজমন্ত্রি-সুতশ্চ সঃ।
কীর্ত্তিমাংশ্চ গুণজ্ঞো বৈ সমুদ্রপরিখাবধি ॥
স্বদেশেঽপি পঠেদ্‌বিদ্যাং ম্লেচ্ছদেশেঽপি সংপঠেৎ।
নির্ব্বাহং রাজতশ্চাপি ধর্ম্মমার্গেঽপি বৈ দৃঢ়ঃ ॥
বিপত্তৌ চ ভবেদ্‌ধীরো নৈব ধর্ম্মং ত্যজেৎ কদা।
পরোপকারকুশলো দেশভক্তিপরায়ণঃ ॥
ধর্ম্মেশোঽপি স্থিতো দেহে দারেশোঽপি কুজস্তনৌ
স্বক্ষেত্রী তৎসমীপস্থো দারাপ্তিঃ সা সধর্ম্মিণী ॥
পতিব্রতা সুশীলা চ পুত্রপৌত্রসুখপ্রদা।
ন্যূনতাত্র ভবেদেকো বাল্যে তস্য পিতুঃ ক্ষয়ঃ ॥

ভ্রাতৃস্থানপতির্জীবঃ স্বস্থানং পূর্ণদৃষ্টিতঃ।
পশ্যতি পূর্ব্বপুণ্যেন পিতৃবদ্‌ভ্রাতৃরক্ষকঃ॥
নৈবানুজসুখং তস্য ভ্রাতরৌ সম্মুখেঽস্তগৌ।
পিতৃতশ্চাধিকং সৌখ্যং মাতৃপক্ষাদ্‌ভবিষ্যতি॥
সাপি তস্য সুখং পূর্ণং নৈব দৃষ্ট্বা পুরা গতা।
নৈব কোষে ধনে বৃদ্ধিঃ পুত্রপক্ষাদ্ধনং সুখম্‌॥
সহস্রং ধনলাভঃ স্যাত্তথাপি ন, ধনং স্থিরম্‌।
লক্ষণাঞ্চ ব্যয়শ্চাপি কার্য্যে বিঘ্নস্তদাপি ন॥
রাজযোগস্তু বৈ পূর্ণো রসবাণ (৫৬) সমে কিল।
তাবৎ কষ্টানি দীর্ঘাণি পরদুঃখেন দুঃখিতঃ॥
রাজাপি মানদস্তস্য কিং পুনঃ ক্ষুদ্রমানবাঃ।
নীচবর্গাংশ্চ বৈ চাথ ভ্রাতৃবদ্‌গণয়েৎ সদা॥
নেত্রবেদ (৪২) সমারভ্য বাণবাণ (৫৫) সমান্তরে।
নানাক্লেশানুভূতিশ্চ কারাগারে স্থিতিস্তথা॥
স্বর্গতুল্যসুখং শান্তিঃ শত্রবো মিত্রবৎ পুনঃ।
দুঃখং সুখং সমং তাত প্রত্যুপকারায় সংস্মরেৎ॥
তনুকষ্টং চ বৈ জাতং রক্ষকাশ্চানুযায়িনঃ।
সহস্রাশ্চাথ জীবাশ্চ ভবেচ্চাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ॥

*　　*　　*

ভৃত্যযানধনং সৌখ্যং স্থানারামাদয়শ্চ বৈ।
তথান্যানি ত্যজেৎ পূর্ব্বং সাধনানি বিরক্তবৎ
গীতবাদিত্রনৃত্যাদি যুবারম্ভে হি সংত্যজেৎ।
ব্যবস্থায়াং সুদক্ষশ্চ জিহ্বাস্বাদনবর্জ্জিতঃ॥

কদা বালবিবাহেন কিঞ্চিৎ ক্লেশং সহেৎ পুরা।
স্বত এব নিবৃত্তশ্চ পত্নী যোগ্যা বশেন বৈ॥
পূর্ব্বজন্মমি সংবাধাদ্ যথা নাম্নি তথৈব সা (কস্তূরী)

* * *

বেদবাণ (৫৪) সমারভ্য তর্কবাণ (৫৬) সমান্তরে।
পুত্রপৌত্রসুখং দীর্ঘং রাজযোগান্মহৎ সুখম্॥
যৎ সুখং লভ্যতে তত্র গিরা নৈব প্রকাশ্যতে॥

ভৃগু বলিয়াছেন,—গুর্জ্জর (গুজরাট) দেশে বৈশ্যবংশে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর পিতা ও পিতামহ এবং অন্যান্য পূর্ব্বজগণ রাজসম্মানিত ও যশস্বী ছিলেন; ইহাঁর পিতাও একজন রাজমন্ত্রী। ইনি গুণজ্ঞ, সমুদ্র-পরিখা পর্য্যন্ত ইহাঁর কীর্ত্তি বিস্তৃত। ইনি নিজ দেশে বিশেষতঃ ম্লেচ্ছদেশেই বিদ্যাভ্যাস করিবেন। রাজা হইতেই ইহাঁর সমস্ত নির্ব্বাহ হইবে। ধর্ম্মপথেও ইহাঁর দৃঢ়তা থাকিবে। বিপদে ধীর হইবেন, কখনও ধর্ম্ম-ত্যাগ করিবেন না। ইনি পরোপকারনিরত এবং স্বদেশভক্ত হইবেন। জন্মকুণ্ডলীতে ইহাঁর তনুস্থানে নবমপতি বুধ, সপ্তমপতি মঙ্গল থাকায় এবং দারাপ্রদ শুক্র স্বক্ষেত্রগত হইয়া অবস্থান করায় ইনি অনুরূপা পত্নী প্রাপ্ত হইবেন। ইহাঁর পত্নী পতিব্রতা, সুশীলা এবং পুত্রপৌত্রান্বিতা হইয়া সুখপ্রদা হইবেন। এই জাতকের ইহাই একমাত্র ন্যূনতা যে, বাল্যকালে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটিবে। পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে জন্মকুণ্ডলীতে তৃতীয়পতি বৃহস্পতির সহোদরস্থান স্বক্ষেত্র হওয়ায় এবং সে স্থানে ঐ বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় ইনি পিতার ন্যায় ভ্রাতা হইতে রক্ষিত হই-বেন। কিন্তু ইনি কনিষ্ঠভ্রাতা হইতে কোনরূপ সুখলাভ করিবেন না। কেননা, তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরই তাঁহার সম্মুখেই মরিয়া যাইবে। পিতার দিক্ অপেক্ষাও মাতার দিক্ হইতেই ইনি অধিক সুখ লাভ

করিবেন; কিন্তু ইহাঁর সেই মাতাও ইহাঁর পূর্ণ সুখসময়ের পূর্ব্বেই পর-লোকে প্রয়াণ করিবেন। ইহাঁর কোষে কখনও ধনবৃদ্ধি হইবে না বা ইনি পুত্রধনেও সুখী হইতে পারিবেন না। সহস্র প্রকারে অজস্র ধনা-গমেও সঞ্চয় হইবে না। বহু প্রকারে ধনব্যয় হইলেও কোন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে না। ৫৬ বৎসর বয়সে পূর্ণ রাজযোগ ঘটিবে। সে সময় পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া সুদীর্ঘ কষ্টভোগ করিবেন। ক্ষুদ্র মানবগণের কথা কি, রাজাও তখন তাঁহার সম্মান করিবেন। সর্ব্বদা ইনি নীচ-গণকেও ভ্রাতার ন্যায় গণনা করিবেন। ৪২ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানারূপ ক্লেশ পাইবেন, এই সময় তাঁহার কারাবাস ঘটিবে। তিনি স্বর্গতুল্য সুখ শান্তি পাইবেন, শত্রুরাও তাঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিবে। হে তাত! পরের উপকারের জন্য তিনি নিজের সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিবেন। তিনি নানারূপ দৈহিক কষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। সহস্র সহস্র অনুগামী রক্ষক তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে। ভৃত্য, যান, ধন, সৌখ্য, স্থান, আরাম এবং অন্যান্য উপভোগ্য সুখসাধন সমূহ তিনি বিরক্তের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি তিনি যৌবনেই পরিত্যাগ করিবেন। তিনি ব্যবস্থায় সুদক্ষ, এবং জিহ্বালৌল্য-বর্জ্জিত হইবেন, প্রথম বয়সে তিনি বাল্য বিবাহ নিবন্ধন কিঞ্চিৎ ক্লেশ অনুভব করিবেন মাত্র। তারপর পত্নী যোগ্যা হইলেও তিনি তাহাতেও স্বতই আসক্তিহীন থাকিবেন। পূর্ব্ব-জন্মসম্বন্ধবশে তিনি কস্তূরী নাম্নী পত্নী পাইবেন। কস্তূরী সার্থকনাম্নী। পুত্র-পৌত্রজনিত প্রগাঢ় সুখভোগের পর ৫৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৬ বৎসরের মধ্যে তিনি রাজযোগ হইতে যে মহাসুখ লাভ করিবেন, বাক্য দ্বারা তাহার বর্ণনা হয় না।

মহাত্মার সম্বন্ধে

মতামত

১। কাউণ্ট টলষ্টয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত গান্ধী রুসিয়ার বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক পরলোকগত কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের নিকট হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ এই,—

আপনার লিখিত চিত্তাকর্ষক চিঠিখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভগবান ট্রান্সভালে আমাদের সমকর্ম্মী ভ্রাতৃবৃন্দের সহায় হউন। এখানেও সেই দুর্ব্বলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষ—নিরীহ প্রেমাস্পদের উপর অহঙ্কারীর অত্যাচার—উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ সামরিক বিভাগের কর্ম্মে অসম্মতি লইয়া ধর্ম্মের বিধান ও পার্থিব বিধান, এই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। এমন অসম্মতি আজকাল এখানে প্রায়ই ঘটিতেছে।

আমি আপনাকে ভাই বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি। এবং আপনার সহিত পরিচয় ঘটায় আনন্দ বোধ করিতেছি। আমরা পৃথিবীর এই প্রান্তে বসিয়া অনুভব করিতেছি যে, আপনি ট্রান্সভালে যাহা করিতেছেন, উহাই সার কর্ম্ম। এখন পৃথিবীতে যে সকল কাজ হইতেছে তাহার মধ্যে উহাই সর্ব্বোত্তম। উহাতে যে শুধু খৃষ্টান জাতিসমূহ যোগ দিবে তাহা নহে, পরন্তু সারা পৃথিবী যোগদান করিতে বাধ্য হইবে।

২। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

লণ্ডনের "ভেন্‌চারার" নামক মাসিক পত্রিকার মে (১৯২১) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর সম্বন্ধে কবি-সম্রাট রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের অভিমত এই মর্ম্মে প্রকাশিত হয়,—

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত অনেক বিষয়ে আমি একমত নহি। তথাপি তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি প্রগাঢ়—শ্রদ্ধা সমধিক। শ্রীযুক্ত গান্ধী কেবল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নহেন—সমগ্র জগতে আজ তিনি অদ্বিতীয় পুরুষ।

৩। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল

লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল শ্রীযুক্ত গান্ধীর সম্বন্ধে এইমর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজেকে জনসাধারণের লোক বলা ছাড়া উচ্চতর সম্মান দাবী করেন না। তাঁহার দেহের গঠন ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; চেহারা সাদা-সিধা ধরণের। দেশীয়গণের মত তিনি নিতান্ত অনাড়ম্বরে জীবন যাপন করেন। তাঁহার আহার অতি সামান্য; তাহাও নাকি তিনি স্বহস্তে রন্ধন করেন। পোষাক-পরিচ্ছদ—স্বগৃহ নির্ম্মিত সামান্য খদ্দর। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র অতি নির্ম্মল। তিনি যে কথা-বার্ত্তা কহেন, তাহার মধ্যে মার-প্যাঁচ আদৌ নাই। তাঁহার আচার-ব্যবহার অতি ভদ্র—কোন কিছুর ভাণ তাঁহার মধ্যে নাই। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিতও তিনি গোপনে বন্ধুভাবে আলাপ করিয়া থাকেন এবং স্পষ্টভাষায় তাঁহাদের নিকট নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রকাশ্যে তিনি শত্রু-মিত্রের মতামতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই, নিজের বক্তব্য অকপটভাবে খুলিয়া বলেন। তিনি যে কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য

কিছু বলেন, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে কখনও স্থান পাইতে পারে না। তাঁহার সহিত তর্ক করাও অসম্ভব; কারণ তিনি নিজের বিবেক-বাণী অনুযায়ী কার্য্য করেন। বিবেক যাহা বলে, তাহা তাঁহার নিকট অভ্রান্ত। তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বলে ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে 'মহাত্মা' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি জাতি-বর্ণের অতীত।

৪। মহামতি গোখলে

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই টাউনহলে আহূত সভায় পরলোকগত মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন,—

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সংস্রবে যিনি একবার আসিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, কি অপূর্ব্ব সত্বায় তাঁহার জীবন পূর্ণ! পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহারা দেশের ও দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহারা যে উপাদানে গঠিত শ্রীযুক্ত গান্ধীও সেই উপাদানে গঠিত। শুধু তাহাই নহে—ইনি তাঁহাদেরও উপর। ইহাঁর মধ্যে এমনই ঐশ্বরিক শক্তি আছে যে, সাধারণ লোকে ইহার সংস্পর্শে আসিলেই সাহসী ও আত্মোৎসর্গকারী হইয়া উঠে। সম্প্রতি ট্রান্সভালে নিরুপদ্রব প্রতি-রোধের যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, তাহাতে ২৭০০ ভারতবাসী শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য অম্লান বদনে কঠোর কারাদণ্ড সহ্য করিয়াছিল। সে সব লোক কাহারা, জানেন কি? কয়েকজন সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকী সকলেই অশিক্ষিত অমার্জ্জিত-বুদ্ধি ফেরিওয়ালা ও দরিদ্র শ্রমজীবী। তাহারা কোনদিন স্বদেশের কথা কহিতে বা ভাবিতে জানিত না। ইহারাই শ্রীযুক্ত গান্ধীর সংস্রবে আসিয়া স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য জেলের কষ্ট

হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছিল—কেহ কেহ বা একাধিকবার জেলে গিয়াছিল। এই সংঘর্ষে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—গৃহহীন,আশ্রয়হীন হইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধীর সংস্রবে আসিয়া তাহারা সে সকল ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করিতে শিখিয়াছে। তিনি নিজেও কম ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। ব্যারিষ্টারিতে তিনি বার্ষিক ৭৫ হইতে ৯০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন ব্যবহারাজীবের পক্ষে এ আয় বড় সামান্য নহে। কিন্তু তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত দারিদ্রের ন্যায় সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্বেতাঙ্গগণের সহিত এতবড় সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াও তিনি হৃদয়ের একপ্রান্তে এতটুকুও শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ পোষণ করেন না। ট্রান্সভালে পর্য্যটন কালে আমি ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি যে, সেখানকার শ্বেতাঙ্গগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত গান্ধী আসিয়াছেন, একথা জানিতে পারিলে শ্বেতাঙ্গ-অগ্রণিগণ তাঁহার কর-মর্দ্দন করিবার জন্য চারিদিকে সাগ্রহে ঘেরিয়া দাঁড়ান। ইহার অর্থ এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহারা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও প্রকৃত মানুষ হিসাবে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

৪। মাদ্রাজের লর্ড বিশপ

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজের লর্ড বিশপ তত্রত্য ওয়াই-এম-সি-এ ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—

শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাহারা কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহাদের তুলনায় আমার চক্ষে, শ্রীযুক্ত গান্ধীই ক্রুশ-বিদ্ধ পরিত্রাতার যোগ্যতর প্রতিনিধি; কারণ

তিনি ন্যায় ও কৃপা লাভের নিমিত্ত ধৈর্য্যবলে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন।

৬। লর্ড এম্‌থিল

রেভারেণ্ড ডোক্ শ্রীযুক্ত গান্ধীর যে জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড এম্‌থিল বলিয়াছেন,—

এদেশের (বিলাতের) অনেক লোক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে হুজুগে আন্দোলনকারী বলিয়া নিন্দা করেন। ইহাঁদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন লোকও আছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছেন—দেশের লোককে মাতাইয়া অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইবে। মানুষটীকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে প্রকৃত ব্যাপারটীও ভাল করিয়া বুঝিবার সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ নির্ভীক ভাবে যুঝিতেছেন ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন, তাহা এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই যেন সফল হয়; ইহার অধিক কামনা আমার আর কিছুই নাই।

৭। ভারত-সচীব মিঃ মণ্টেগু

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে ভারত-সচীব মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতীয় বজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

ভারতীয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধীর মহত্ব ও প্রতিষ্ঠা সমধিক। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—চরিত্র সুবিমল। দেশ-সেবায় তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের তুলনা নাই। ভারত গভরমেণ্ট তাঁহাকে লইয়া যেরূপ

বিব্রত হইয়াছেন, অপর কাহাকেও লইয়া সেরূপ হন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধীর বন্ধুবর্গের মধ্যে আমিও অন্যতম। তাঁহার অপরাপর বন্ধুবর্গের ন্যায় আমিও তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহার হস্তে যে বিপুল ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা যেন তিনি দায়িত্ব বুঝিয়া প্রয়োগ করেন। তিনি সময়ে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের কার্য্য-কলাপের উপর তাঁহার কোন হাত নাই; অথচ তাহারা তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হয়।

৮। মিঃ পোলাক্

ভারত-হিতৈষী মিঃ এইচ্, এস, এল, পোলাক্ বলেন,—

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সরলতা অসীম। তিনি টলষ্টয় ও রাস্কিনের ভক্ত; কঠোর তপস্বীর মত সামান্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করেন; উন্মুক্ত আকাশ তলে মাটির উপর মোটা চট্ পাতিয়া নিদ্রা যান। বেশ-ভূষার পরিপাট্য তাঁহার আদৌ নাই। তিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। ব্যবহারাজীবের কার্য্য সাধুতাসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি উহা বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কোন বিধি-নিষেধের দাস নহেন; বিবেক যাহা বলে তিনি তাহাই পালন করেন। তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—সব সমান। দানে তিনি মুক্তহস্ত। তাঁহার ধর্ম্মভাব এমনই প্রবল যে, কেহ তাঁহার সম্মুখে মন্দ কাজ করিতে সাহসী হয় না। তিনি মিথ্যা সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু মিথ্যাবাদীকে ভালবাসার ভাবে তিরস্কার করেন। বস্তুতঃ ভালবাসাই তাঁহার একমাত্র অস্ত্র। তিনি মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। যদিও তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত অনুসরণ করেন না, তথাপি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষভাবে

লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট সকলই ভগবান। এই বিশ্বাসে সকল কর্ত্তব্য তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এ যুগে ভারতবর্ষে এমন সাধক—এমন স্বদেশভক্ত—এমন রাজনীতিক আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

৯। কর্ণেল ওয়েজ্‌উড্‌

লণ্ডনের 'নেশন' পত্রে পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য কর্ণেল ওয়েজ্‌উড্‌ লিখিয়াছেন,—

ভারত এখন ঋষি বা মহাত্মা গান্ধীর পদতলে লুটাইতেছে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও প্রকাশ্যে ক্বচিৎ ভিন্নমত পোষণ করেন। সম্পত্তিশালী লোকেরা তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। গভরমেণ্ট—যে কোন গভরমেণ্ট—তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন না; কারণ তিনি সকল গভরমেণ্টের মূল ধরিয়া নাড়া দিতেছেন। কাজেই ভারত গভরমেণ্ট এখন বলিতেছেন,—'আচ্ছা দেখা যাক্, পরে কি হয়।'

১০। মিঃ বেন্‌, সি. স্পুর।

পার্লামেণ্টের শ্রমিক-দলের সদস্য মিঃ বেন, সি, স্পুর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত গান্ধীর কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বলেন,—

আজকাল পৃথিবীতে গান্ধীর যত অনুচর, এত বোধহয় আর কোন জীবিত ব্যক্তির নাই। কেবল যে অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নহে; উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে 'মহাত্মাজী' বলিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। এমন কি গভরমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে চরিত্রবান্ ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে লেনিন যেমন শক্তিশালী, সমুন্নত ও সুদৃঢ় জননায়ক রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রাচ্য

ভূখণ্ডে গান্ধীও সেইরূপ শক্তিশালী, সমুন্নত ও সুদৃঢ় জননায়করূপে দেখা দিয়াছেন। তবে তফাৎ এই যে, লেনিন পাশবিক বলের পূজক, আর গান্ধী আধ্যাত্মিক বলের উপাসক।

১১। রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ

ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ বলেন,—

মহাত্মা গান্ধী দরিদ্রের বন্ধু। তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ—সর্ব্বস্ব দরিদ্রের সেবায় সমর্পিত। তাই আজ দরিদ্র জনসাধারণ তাঁহাকে বন্ধুরূপে—রক্ষকরূপে আপনার জন বলিয়া স্বতই চিনিয়াছে। ওদিকে ধনী, মহাজন ও ভূস্বামিগণ ক্রমশঃ তাঁহাকে আপনাদের দল হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতেছেন।

তিনি নিজের কর্ম্ম-প্রভাবে (বাক্যের দ্বারা নহে) মানব-সমাজে আবার জ্বলন্ত ভগবদ্-বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ফলে ভারতের অন্তরাত্মা তাঁহার বাণী বুঝিয়াছে।

১২। মিঃ ওয়াট্‌সন (নিউ ইয়র্ক)

মার্কিণ রাজ্যের নিউ ইয়র্ক সহর হইতে মিঃ বি, ওয়াট্‌সন লিখিয়াছেন,—

গান্ধীর মত এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব এই পৃথিবী গ্রহে বহু বহু যুগ অন্তরে হইয়া থাকে। তা'ও আবার মানব-সমাজের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা আসেন না। এ কালের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন খৃষ্টানেরা যিশু খৃষ্টের সম্বন্ধে যেমন সখেদে বলিতে বাধ্য হন, ইহাঁর সম্বন্ধেও যেন ভবিষ্যতে তেমনই বলিতে না হয় যে, মানব-মণ্ডলী ইহাঁর শিক্ষা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ইনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত

এই পুস্তক সম্বন্ধে—

সংবাদ-পত্রের অভিমত।

"This a nice Bengali treatise on the life and teachings of M. K. Gandhi whose personality does require no iotroduction. The book under review is couched in a chaste flowing language and reflects great credit on its compiler, Babu Joges Ch. Mukerjee."

The A. B. Patrika—4th Nov. 1918.

"The auther has succeeded in his self-imposed task in delineating the noble character of his hero in simple but vigorous and chaste Bengali and holds up to his readers' eyes the example of a great soul working in favour of his countrys' good. The work itself is comparatively small as regards its volume, but so far as its merit is concerned it is worth its weight in gold."

The Telegraph—16th Nov. 1918.

"The skilful manner of presentation revets the interest of the reader throughout and the history of the struggle of the Indian settlers in South Africa led by Mr. Gandhi reads like a chapter of romance."

The Bengalee—17th Nov. 1918.

"শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এই মহাত্মার জীবন-কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর অতুলনীয় জীবন-কথা ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত; প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক যুবকের হস্তে এই পুস্তক আমরা দেখিতে চাই।"

ভারতবর্ষ—মাঘ, ১৩২৫।

মহাত্মা গান্ধী।

"ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে ছাড়া যায় না, একটার পর একটা ঘটনা রোমাঞ্চকর sensational উপন্যাসের মতন মনে হয়। এই জীবনী পাঠে মনে বল সঞ্চার হয়, ভীরু ব্যক্তি সাহস পায়, অন্যায় অবিচার অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার মহদ্দৃষ্টান্তে চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠে। এই পুণ্য :অবদান প্রত্যেক নরনারী আবাল বৃদ্ধ সকলের বারংবার পাঠ করিয়া অন্তরকে ঐ ভাবে ভাবিত করিয়া তোলা উচিত।"

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধীর অমিত তেজ, অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা এবং দৃঢ় ও অটল সত্যনিষ্ঠা কিরূপ তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা নীরব কর্ম্মবীর মহাপ্রাণ গান্ধীর জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আমরা একান্তই মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছি। এই পবিত্র জীবন-কাহিনী প্রত্যেক নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা উচিত।"

মানসী ও মর্ম্মবাণী —পৌষ, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধী এদেশের আদর্শ পুরুষ। এরূপ নিষ্কাম যোগী, নীরব দেশ-নায়ক এদেশে দ্বিতীয় আছে কিনা, জানি না। গ্রন্থকার এই মহাপুরুষের জীবনাদর্শ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। জীবিত কালে কাহারও জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে হয়, আমরা তাহা ভাল মনে করি না; কিন্তু এই সাধক সে নিয়মের অতীত। যখন কথার প্রচার এদেশে খুব হইতেছে এবং প্রকৃত চরিত্র এবং কাজ ডুবিয়া যাইতেছে, তখন এহেন আদর্শ লোকের সজীব কথা এদেশে নবযুগ আনয়ন করিতে পারে বলিয়া গান্ধীর জীবন-কাহিনী প্রচারের আমরা পক্ষপাতী।"

নব্য ভারত—মাঘ, ১৩২৫।

সংবাদ-পত্রের অভিমত।

"গ্রন্থের ভাষা পাকা হাতের লেখা ও প্রাঞ্জল। জীবন-চরিত রচনায় যে উপাদান ও শক্তি আবশ্যক, লেখকের তাহা যথেষ্ট আছে। এই স্বনামধন্য মহাত্মার জীবন-কাহিনী ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।"

অর্চ্চনা—ফাল্গুন, ১৩২৫।

"গ্রন্থখানি এমনই উপভোগ্য হইয়াছে যে, উপন্যাস ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। গ্রন্থের পাতায় পাতায় গান্ধীর অসাধারণ মহত্বের মহিমাময় ছবি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান্ধীর বহু বাণীও সংগৃহিত হইয়াছে। সেগুলির মূল্য মণি-মাণিক্যের চেয়েও বেশী। বাণীগুলি স্বতন্ত্র কার্ডে লিখিয়া ঘরে-দুয়ারে ছবির মত ঝুলাইয়া রাখিবার যোগ্য। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। বাঙ্গালার ছেলেরা এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা মুখস্ত করিয়া মজ্জাগত করিয়া ফেলুক। গান্ধীর গুণের সুবাসে তাহাদের নব মুকুলিত চিত্ত আমোদিত হোক, পরিপূর্ণ হোক—ইহার চেয়ে বড় কামনা এ যুগে বাঙ্গালীর আর থাকিতে পারে না। এই সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—নিঃস্বার্থ মনুষ্যত্বের ছবি আঁকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।"

ভারতী—চৈত্র, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধীর জীবনী হইতে বহু শিক্ষা লাভ করা যায়। এমন স্বদেশপ্রাণ, করুণহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ, নিঃস্বার্থ বন্ধুর কার্য্য ও জীবনী পাঠ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। পুস্তকের ভাব সুন্দর, ভাষা প্রাঞ্জল, ছাপাও পরিষ্কার।"

মোসলেম হিতৈষী—১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৫।

মহাত্মা গান্ধী।

"মহাত্মা গান্ধী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক অল্প পরিসরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগের পরিচয় দিয়াছেন। আশাকরি এ গ্রন্থ সমাদর লাভ করিবে।"

বসুমতী ৬ই পৌষ ৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধী এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁহার জীবন অপূর্ব্ব পুণ্যময়। যোগেশ বাবু আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বাঙ্গালীদের নিকট এই অদ্ভুত কর্ম্মীপুরুষের জীবনালেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে পাঠ করিবে সেই উদারহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও মহাসংযমী হইবার প্রলোভন এড়াইতে পারিবে না।"

সঞ্জীবনী—২রা মাঘ ১৩২৫।

"যোগেশবাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকের, যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা জন্মভূমির সেবা করিতে চাহেন, অথচ কি করিলে যে জন্মভূমির প্রকৃত সেবা করা হয় তাহা স্থির করিতে পারেন না, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"

হিতবাদী—২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ভাষার দীপ্তরাগে, বর্ণনার কলাকৌশলে গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে গান্ধীর অদ্ভুত চরিত্র-মহাত্মের ও দেশাত্মবোধের একখানি নিখুঁত চিত্র পূর্ণভাবে চিত্তপটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গ্রন্থকার গান্ধীর জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার কৃত কার্য্যাবলীর যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপি-নিপুণতার পরিচয় পদে পদে প্রতিভাত। পড়িতে পড়িতে উৎসাহে আগ্রহে সঙ্গে সঙ্গে আদর্শানুকরণের একটা প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে।"

বঙ্গবাসী—২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫